রাজা সীতারাম রায়

(অর্থাৎ রাজা সীতারাম রায় ও তৎসংস্পৃষ্ট
পূর্ব্ব, সম ও পরকালবর্ত্তী ভূস্বামী-
গণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।)

শ্রীযদুনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত ও
প্রকাশিত।

তৃতীয় সংস্করণ

কলিকাতা
২০ নং কাঁটাপুকুর লেন, বাগবাজার,
"বিশ্বকোষ-প্রেসে"
শ্রীরাখালচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১৩১৪ সাল।

মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা

উৎসর্গ

পরম ভক্তিভাজন

শ্রীযুক্ত বাবু বসন্তকুমার বসু,

উকীল মহাশয় শ্রীকরকমলেষু

মহাশয়, আপনার উদ্যম ও উদ্যোগে সীতারাম উৎসব। সীতারাম উৎসবে এই সীতারামের জন্ম। সীতারামের আদর আপনিই করিতেছেন। এ পুস্তক সীতারামও কৃতজ্ঞচিত্তে আপনার করে সমর্পণ করিলাম, ইতি।

নিঃ শ্রীযদুনাথ ভট্টাচার্য্য

প্রথম বারের বিজ্ঞাপন।

বর্ত্তমান বৎসরে মাগুরার কতিপয় সম্ভ্রান্ত উকিল বাবুর যত্নে মহম্মদপুরে সীতারামের উৎসব হইতেছে। আমার সমব্যবসায়ী বন্ধুগণ এই উপলক্ষে সীতারাম বিষয়ে একখানা পুস্তিকা প্রকাশ করিতে অভিলাষী হন। কয়েকজন সীতারাম লিখিতেও প্রবৃত্ত হন। আমি শোকতাপে নিতান্ত অধীর থাকায় আমাকে কেহ এ কার্য্যের ভার দেন নাই। অস্থিরচিত্তে কর্ম্মাবলম্বনই চিত্তের স্থিরতা সম্পাদনের প্রধান উপায়। আমি ক্রমে সীতারাম-বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া দেখি, সীতারাম একটী আদর্শ বীর-জীবন। আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই সীতারাম লিখিতে আরম্ভ করিলাম। শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রেবতী সরকার, গোবিন্দাচরণ ভট্টাচার্য্য, হীরালাল রায় মহাশয়গণ আমাকে উপকরণ দিতে লাগিলেন। কিংবদন্তী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সনন্দাদি অবলম্বনে ইতিহাস লেখা অতি কঠিন কার্য্য। আমি আড়াই মাস কাল প্রতিদিন দশঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া এই সীতারাম পাঠকসমক্ষে উপস্থিত করিতেছি; ইহা এত ব্যস্ততার সহিত লিখিত হইল যে, ইহার অনেক পরিচ্ছেদ দুইবারও পাঠ করিতে পারি নাই। মধুবাবু, বরদাবাবু ও আনন্দবাবুর প্রবন্ধ ইচ্ছামত ব্যবহার করিয়াছি। তাঁহাদের কোন অনুমতি লইতে পারি নাই। আশা করি, তাঁহারা আমার এই কার্য্যের জন্য ক্ষমা করিবেন।

উপসংহারে পাঠকগণের নিকট বিনীত নিবেদন এই যে, ব্যস্ততার সহিত চিত্তের চঞ্চল-সময়ে এই পুস্তক লিখিত হইল। ইহাতে অনেক ভ্রমপ্রমাদ থাকা সম্ভব। পাঠক মহোদয়! অনুগ্রহ করিয়া ভ্রমপ্রমাদ প্রদর্শন করিলে কৃতজ্ঞচিত্তে বারান্তরে সংশোধন করিব। আমার উপকরণদাতা বন্ধুগণেব নিকটও চিরকৃতজ্ঞ থাকিলাম। বলা বাহুল্য এই পুস্তকের আয়ের অধিকাংশ অর্থ সীতারাম-উৎসবে ব্যয়িত হইবে।

বাঙ্গালা পুস্তকের বীররস পরনিন্দা। সীতারাম ইতিহাসের বীররস নাটোর-রাজবংশের আদিপুরুষ রাজা রামজীবন ও দীঘাপতিয়ার রাজ-বংশের আদিপুরুষ দয়ারাম বাহাদুর মহাত্মাদিগের নিন্দা। আমার সীতারামে তাঁহাদিগের নিন্দারূপ বীররস নাই বলিয়া আমি চাটুকার বলিয়া ঘৃণিত হইব। উপায়ান্তর নাই, যাহা করিয়াছি তাহা বিশ্বাসমতে সত্যের অনুরোধেই করিয়াছি। ইতি—

পোঃ মাগুরা, যশোহর।
সন ১৩১১। তাং ১৭ই মাঘ

নিবেদক
শ্রীযদুনাথ শর্ম্মা

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন

সহৃদয় বঙ্গীয় পাঠকগণের অনুগ্রহে ৬ মাস মধ্যে প্রথম সংস্করণের সীতারামগুলি বিক্রীত হইয়াছে। নানা কারণে প্রায় ৮ মাস মধ্যে সীতারামের দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তক প্রকাশ করিতে পারি নাই। এবারও সীতারামের বিশেষ কিছু উন্নতি করিতে পারিলাম না। গুরুকুল-পঞ্জী ও কুলাচার্য্য পঞ্জিকায় সীতারামের বংশের কারিকাগুলি এবারে দিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আমার গৃহদাহে সে গুলি নষ্ট হইয়াছে। পুনরায় চেষ্টায়ও গুরুকুল-পঞ্জিকা কোথায় পাইতেছি না। ঘটক-কারিকাও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। ইতি—

পোঃ মাগুরা, যশোহর।
সন ১৩১৩। তাং ২রা জ্যৈষ্ঠ

নিবেদক
শ্রীযদুনাথ শর্ম্মা

তৃতীয়বারের বিজ্ঞাপন

এবারে ভাষাগত দোষ অনেক সংশোধন করিয়াছি। সীতারামের দূরদেশীয় জ্ঞাতিগণের নাম ও এবার সংগ্রহ করা হইয়াছে।

পোঃ মাগুরা যশোহর।
সন ১৩১৪। তাং ৫ই মাঘ

নিবেদক
শ্রীযদুনাথ শর্ম্মা

যে সকল পুস্তক হইতে সীতারামের প্রণয়ন-বিষয়ে সাহায্য লওয়া হইয়াছে

তাহার তালিকা।

১। সীতারামের গুরুকুলপঞ্জী (যশপুর গোস্বামিগৃহে প্রাপ্ত)

২। কুলাচার্য্যের কুল-পঞ্জিকা। (৺ঘনশ্যাম ঘটক প্রণীত)

৩। History of Bengal By Charles Stewart (*Bangabas Edition*)

৪। A Report on the district of Jessore,

By J. Westland, c, s

৫। A Report on the district of Jessor, &c

By Late Babu Ramsankar Sen,

Dy. Magistrate.

৬। সীতারামবিষয়ক দশটী প্রস্তাব (নব্যভারতে প্রকাশিত ও

শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন সরকার সঙ্কলিত

৭। বারভূঞার ইতিহাস (নব্যভারতে প্রকাশিত ও

শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দচন্দ্র রায় প্রণীত।

৮। সীতারাম-বিষয়ক প্রবন্ধ (হিন্দুপত্রিকায় প্রকাশিত ও

শ্রীযুক্ত বাবু বরদাকান্ত দেব কর্ত্তৃক প্রণীত।

৯। সীতারাম-বিষয়ক গল্প (মুদ্রিত হয় নাই)

৺প্রাণনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত

১০। সীতারামের ইতিহাস (অপ্রকাশিত ও অসম্পূর্ণ)

(৺রাইচরণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত)

১১। বঙ্গ-হিন্দুসূর্য্য-কাব্য (অপ্রকাশিত)

শ্রীযুক্ত বাবু মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত)

১২। সীতারাম প্রবন্ধ (কল্যাণী পত্রিকায় প্রকাশিত

শ্রীযুক্ত বাবু হীরালাল রায় লিখিত)

১৩। সীতারাম নাটক (অপ্রকাশিত

১৪। সীতারাম উপন্যাস (৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত)

☞ সীতারাম ইতিহাস-সংগ্রহের দ্বিতীয় উপায় :—

(১) নিষ্করের সনন্দ। (২) পাট্টাকবুলতি প্রভৃতি দলিল। (৩) মোকদ্দমা ঘটিত কাগজ পত্র। (৪) প্রাচীন কবিতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

প্রাচীন কাগজপত্রের যে সকল স্থান পড়া যায় না, সেই সকল স্থানে·········এইরূপ চিহ্ন দিয়াছি। আমার পক্ষে ফুটনোট দেওয়া কঠিন বলিয়া ফুটনোটের বিষয় ১, ২, ইত্যাদি চিহ্ন পরিচ্ছদ মধ্যে রাখিয়া সকল ফুটনোটের বিষয় পরিশিষ্টে দিয়াছি। দ্বিতীয় সংস্করণের ফুটনোট ২ নং পরিশিষ্টে দেওয়া হইয়াছে ও ফুটনোটের স্থানসমূহে (ক), (খ), (গ), ইত্যাদি চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে।

রাজা সীতারাম রায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

বঙ্গের ইতিহাস

অধুনা বঙ্গদেশে মসীজীবী ও কৃষিজীবী দুই সম্প্রদায় লোকের বাস। সম্প্রতি দেশীয় লোকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোনরূপ শিল্প ও বাণিজ্যের অনুষ্ঠান হইতেছে না। বঙ্গের ঈদৃশী হীনাবস্থা সন্দর্শনে অনেক ইতিহাস-পাঠকও বঙ্গের পূর্ব্ব-কীর্ত্তির কথা বিস্মৃত হয়েন। বঙ্গদেশের ইতিহাসের সহিত সীতারাম-জীবনের সংস্রব থাকায় এবং সংক্ষেপে বঙ্গের কীর্ত্তিমান্ সন্তান সীতারামের সঙ্গে বঙ্গের পূর্ব্বগৌরব পাঠকগণের স্মৃতিপথে উদিত করিবার মানসে আমরা এই পরিচ্ছেদে বঙ্গের ইতিহাস অতি সংক্ষেপে বিবৃত করিব।

মহাভারতে অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গ দেশের উল্লেখ আছে। বঙ্গদেশের দক্ষিণভাগে সামুদ্রিক ম্লেচ্ছগণ বাস করিত। তাই বঙ্গের দ্বিতীয় নাম মৎস্য দেশ। বর্ত্তমান সময়ে কোচবিহারাধিপতি-বংশবিবরণে জানা যায় যে তাঁহাদের বংশ দেবদেব ভুতভাবন মহাদেব হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে।

রামায়ণের রঘুবংশ সূর্য্য হইতে ও মহাভারতের কুরু-পাণ্ডবকুল চন্দ্র হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। প্রাচীন প্রায় যাবতীয় রাজবংশ কোন না কোন দেবতা হইতে উৎপন্ন বলিয়া থাকেন। সেইরূপ দশ অবতারের আদি অবতার মৎস্য হইতেও কয়েক রাজবংশ অবতীর্ণ হইয়াছিল। মৎস্য-রাজবংশ সর্ব্বপ্রথমে আমাদিগের দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন (ক), তাঁহাদিগের নামানুসারে আমাদিগের দেশের নাম মৎস্যদেশ হইয়াছে।

মৎস্যবংশীয় রাজগণ সমরকুশল, উদার ও রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহারা আর্য্য-অনার্য্যমিশ্রণে শ্বেত ও কৃষ্ণের ভেদ রহিত করিয়া দেশের প্রকৃত বলসঞ্চয় করিতে যত্নবান্ ছিলেন। তাঁহাদের রাজ্য সুদৃঢ় ছিল। তাঁহাদের সময়ে অনেক অনার্য্য সম্প্রদায় উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিয়া আর্য্য মধ্যে স্থানলাভ করিয়াছে। আমাদের দেশের অনেক লোকের বিশ্বাস, এ দেশের অধিবাসিগণ মৎস্য ভক্ষণ করেন বলিয়া এ দেশের নাম মৎস্য দেশ হইয়াছে। মৎস্যাধিপতি বিরাটের নাম কাহার অশ্রুত নাই। বর্ত্তমান সময়ে রঙ্গপুর জেলার গাইবাঁধা মহকুমা হইতে মেদিনীপুর জেলা পর্য্যন্ত যে তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল, তাহার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। গাইবাঁধা মহকুমার মধ্যে বিরাট ভবন ও তাঁহার উত্তর-গোগ্রহ প্রভৃতির চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। মেদিনীপুর জেলার মধ্যে গোগ্রহ নামক স্থানই বিরাটের দক্ষিণ-গোগ্রহের নিদর্শন বলা যায়। যৎকালে মগধরাজ জরাসন্ধ ও প্রাগ্জ্যোতিষ-পুরেশ্বর ভগদত্ত সমস্ত পূর্ব্ব ভারতবর্ষ স্ব স্ব করতলস্থ করিয়া কংসের সাহায্যে পশ্চিম ভারতেও হস্ত-প্রসারণ করিলেন, তাঁহাদের পক্ষপাত-পূর্ণ রাজনীতি, অত্যাচার, উৎপীড়ন, দেষদ্বেষিতা ও অনুদারতা প্রভৃতিতে সমস্ত ভারতবর্ষ যখন

উত্তেজিত হইয়া উঠিল, তখন দ্বারকাধিপতি নবধর্ম্মসংস্থাপয়িতা যদুকুল-তিলক শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণের সহায়তা লইয়া ভারতবর্ষকে সুদৃঢ় একতাসূত্রে বন্ধন করিতে প্রয়াসী হইলেন। তৎকালে ভারতীয় আর্য্যগণ একতার মানসে যে জাতীয় মহাসমিতির বা কংগ্রেসের অধিবেশন করিয়াছিলেন, তাহা মৎস্যাধিপতি বিরাটের সভাতেই বসিয়াছিল। সেই মহাসমিতি বিরাটসভায় করিবার উদ্দেশ্যেই কৃষ্ণসখা পাণ্ডবগণ উদার-নৈতিক সখার পরামর্শ অনুসারে বিরাট ও তদীয় রাজকুমার উত্তরকে গুণে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। সেই একতাসূত্রের দৃঢ়বন্ধনে বিরাটনন্দিনী উত্তরার সহিত অর্জ্জুন-নন্দন অভিমন্যুর শুভ-পরিণয়! মৎস্যরাজ-দৌহিত্র পরীক্ষিতই একচ্ছত্র ভারতের অধিপতি হইয়াছিলেন। বাঙ্গালী পাঠক হাসিয়া উড়াইবেন না,—কুরুক্ষেত্র-মহারণাঙ্গনে পাণ্ডব-পক্ষে যে সকল সৈন্যসামন্ত সমবেত হইয়াছিল ও যে সকল আয়ুধ সমরে ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশ আধুনিক সমরজ্ঞান-বর্জ্জিত মৎস্যদেশ হইতেই সংগৃহীত হইয়াছিল। বিরূপাক্ষ শিবের উপাসক বীর্য্যবান্ বাণ (খ) দিনাজপুরে রাজত্ব করিতেন। তদীয় কুমারী ঊষা যদুবংশীয় অনিরুদ্ধের প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া গোপনে তাঁহার গলে বরমাল্য অর্পণ করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে প্রবল যদুকুলের সহিত বাণের যে যুদ্ধ হয় এবং বিষ্ণু শিব-জ্বরের প্রাদুর্ভাবের পর যে সন্ধি হয়, তাহা বাণ ও বঙ্গের পক্ষে অশ্লাঘাজনক নহে।

বঙ্গের রাজা সিংহবাহুর উত্তরপুরুষগণ লঙ্কা-বিজয় করিয়া তাহার নাম সিংহল রাখিয়াছিলেন। সিংহবাহুর পৌত্র পাণ্ডুবাস দীর্ঘকাল সিংহলে রাজত্ব করিয়া সিংহলবাসীর চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। বৌদ্ধ-

ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবের পর পালবংশীয় মহীপালগণ বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক বঙ্গের বর্ণভেদপ্রথা বর্জ্জন করিয়া যে আর্য্য-অনার্য্যে অপূর্ব্বমিলন সংসাধন করিয়া দেশের প্রকৃত বলসঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাস-পাঠকগণের অবিদিত নাই। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষভাগে পণ্ডিত-প্রবর শঙ্করাচার্য্য হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়-মানসে যে হিন্দু-বৌদ্ধ-সমরের বীজবপন করেন, বঙ্গে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর হিন্দুরাজা আদিশূর সেই বীজে জলসেচন করিয়া অঙ্কুরিত করিতে সমর্থ হন। এই সময়ে ভারতীয় আর্য্যগণ হিন্দু নাম গ্রহণপূর্ব্বক ভারতীয় বৌদ্ধ হইতে জাপান দ্বীপের বৌদ্ধ পর্য্যন্ত পৃথিবীর তৎকালীন $\frac{১}{৪}$ অংশ লোকের সহিত যে ঘোর সমরানল প্রদীপ্ত করেন, এমতে আমরা বলিতে পারি, তাহার প্রথম অগ্নিস্ফুলিঙ্গে এই দীনহীন বঙ্গদেশই প্রজ্বলিত হইয়াছিল।

এই হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আবার জাতিভেদ প্রথা প্রতিষ্ঠিত হইল, একতা-মিলনের পথে কণ্টক পড়িল, তান্ত্রিক শক্তিমত ও পৌরাণিক বৈষ্ণবমতের সহিত বিরোধ বাঁধিল, একদিকে মধ্বাচার্য্য, বল্লভাচার্য্য, রামানন্দ, কবীর প্রভৃতি বৈষ্ণব-মত এবং অপরদিকে তান্ত্রিক-গুরুগণ পঞ্চমকার উপকরণে শক্তি-উপাসনা (গ) প্রবর্ত্তন করিলেন। এমতে বঙ্গে শত পার্থক্যের পয়োধি প্রবেশ করিল, তাহারই ফলে ১২০৩ খৃষ্টাব্দে পশুপতি-মন্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতায় এবং শিক্ষাভিমানী অশিক্ষিত ও ক্ষমতার অপব্যবহারকারী চাটুকার ব্রাহ্মণদলের অলীক দৈববাণীতে অষ্টাদশ জন সশস্ত্র মুসলমানসৈনিক-ভয়ে অশীতিবর্ষবয়স্ক, বৃদ্ধ নরপতি লাক্ষ্মণেয় নির্ব্বিবাদে স্বর্ণবঙ্গ মুসলমানকরে অর্পণ করিয়া অন্তঃ-পুরের দ্বার অবলম্বনে সপরিবারে পলায়নপর হইলেন। ১২০৩ খৃষ্টাব্দ

হইতে ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ পাঠানজাতীয় মুসলমানদিগের ভোগ্য হইয়া থাকিল। বঙ্গের পাঠান-শাসনকর্ত্তৃগণ কখন দিল্লীর অধীন হইয়া কখন বা স্বাধীনতা অবলম্বনপূর্ব্বক বঙ্গের শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেন। সম্রাট্ সের শাহার আমলে বঙ্গেশ্বর দিল্লীশ্বর হওয়ায়, বাঙ্গালা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দিল্লীশ্বরের অধীন থাকিল। পাঠানগণ যেরূপ সমরকুশল ও বীর ছিলেন, রাজ্যশাসন ও পালন এবং রাজস্বসংগ্রহ বিষয়ে তাঁহাদের তদ্রূপ গুণগ্রাম ছিল না। হিন্দুরা এই সময়ে রাজস্ব-সংক্রান্ত যাবতীয় উচ্চপদে নিযুক্ত হইতেন। হিন্দু জমিদার-শক্তির এ সময়ে কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। দিনাজপুরের বর্ত্তমান রাজবংশের আদিপুরুষ রাজা গণেশ বঙ্গের স্বাধীন রাজা ছিলেন। তদীয় পুত্র যদু কোন মুসলমান রমণীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহার পাণিপীড়ন করেন ও মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বনপূর্ব্বক স্বাধীনভাবে রাজ্য করিতে থাকেন। কথিত আছে, যদু হিন্দু থাকিতে, তোগলকবংশীয় সম্রাট্ মহম্মদ ও তদীয় সহচর মোগল-বীর তৈমুরলঙ্গকে পাণ্ডুয়ার কিঞ্চিৎ উত্তরপশ্চিমে ও নেপালের পাদদেশের যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন।[১]

বঙ্গীয় হিন্দুরাজকরে মোগল অনীকিনীর এসিয়া-বিজয়ী নেতা টাইমুরকেও পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াছিল। কাহার কাহার মতে ১ম দাসরাজ কুতুব পূর্ব্বে হিন্দু ছিলেন।[২] এই সময়ে হিন্দুর ক্ষমতা থাকায় এবং হিন্দু-জমিদার-শক্তি প্রবল থাকায় দেশীয় শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য কিছুই নষ্ট হয় নাই। চণ্ডীদাস ও জয়দেব এই সময়ে প্রাদুর্ভূত হন। মালদহ ও রাজমহলের নিকটবর্ত্তী গৌড়, তাণ্ডা ও পাণ্ডুয়াতেই পাঠান-শাসনকর্ত্তৃগণের রাজধানী ছিল।

অকবরের সেনাপতি রাজা মানসিংহ বঙ্গের জমিদারগণের বিদ্রোহ-নিবারণ, দাউদ ও কুতব্ খাঁকে যুদ্ধে পরাজয় এবং পূর্ব্ববঙ্গের বারভূঞার মধ্যে যশোহরাধিপতি প্রতাপাদিত্য, ভূষণার মুকুন্দ রায়, বিক্রমপুরের কেদার রায় প্রভৃতির নিধনসাধন করিয়া ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশ মোগলপদানত করিলেন। ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের প্রাচীন রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া তিনি ভাগীরথীর দক্ষিণ তীরে আকমহল বা আকবরাবাদ নামে রাজধানী সংস্থাপন করিলেন।[৩] ঐ নগর শাহ সুজার শাসনকর্তৃত্ব সময়ে রাজমহল নামে অভিহিত হইয়াছিল। ইস্‌লাম খাঁ বঙ্গের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলে পর্ত্তুগীজদিগের আক্রমণ হইতে দক্ষিণ ও পূর্ব্ববঙ্গ রক্ষা করিবার মানসে হিজিরা ১০৮৭ (১৬০৮ খৃঃ) জাহাঙ্গীরনগরে রাজধানী স্থাপন করেন। এই নগরের নাম পরে ঢাকা হইয়াছিল।[৩] ইস্‌লাম খাঁর পরে শাহ সুজা, ইব্রাহিম খাঁ, অরঙ্গজেবের পৌত্র আজিমওসন ও মুর্শিদ কুলী খাঁ, ক্রমান্বয়ে বাঙ্গালার নবাব হইয়াছিলেন। এই শাসনকর্ত্তৃচতুষ্টয়ের শাসনসময়েই সীতারামের অভ্যুত্থান ও পতন। মুর্শিদাবাদের প্রাচীন নাম মুকশুদাবাদ ছিল। ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদ্ কুলী খাঁ আপন নামানুসারে এই নগরের নাম মুর্শিদাবাদ রাখেন।[৪] এবং এই স্থানে টাকশাল ও রাজপ্রসাদাদি নির্ম্মাণ করিতে থাকেন।

অরঙ্গজেব গোঁড়া মুসলমান ও হিন্দুদিগের প্রতি বিশ্বাসশূন্য ছিলেন। সম্রাট্ অকবর যে যে গুণে ভারতীয় মোগল সম্রাজ্য সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপন করিয়াছিলেন, অরঙ্গজেব সেই সেই গুণের অভাবে মোগল-সাম্রাজ্য পতনোন্মুখ করিয়া তুলিলেন। তিনি ভেদরাজনীতি অবলম্বন, ও জিজিয়াকর (হিন্দুর মাথাগণিত কর) পুনঃ স্থাপন করিলেন;

মহারাষ্ট্রদেশীয় রণকুশল শিবাজীর সহিত নিয়ত সংগ্রামে রত থাকিলেন। পঞ্জাবে শিখগণ ক্ষমতাশালী হইতে আরম্ভ করিল। সকল হিন্দু-রাজন্যবর্গের মধ্যে বিদ্রোহবহ্নি প্রধূমিত হইতে লাগিল এবং যে মহারাষ্ট্রদিগকে সম্রাট্ বিদ্রূপ করিয়া পার্ব্বত্য ইন্দুর বলিতেন, তাহাদিগকে দমন করিতে, তাঁহাকে নাইগ্রার জলপ্রপাতের ন্যায় অর্থব্যয় করিতে হইল। বিশ্বাসশূন্য সম্রাট্ দিন দিন বেতনভুক্ সৈন্যের বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালা তাঁহার অর্থলালসা-পরিতৃপ্তির রাজকোষস্বরূপ হইল। বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা আজিম ওসান রাজস্ব-সংগ্রহে তত বিচক্ষণ ছিলেন না। বীরভূম অঞ্চলের রায় উপাধিধারী একটী রাঢ়ীশ্রেণীয় ব্রাহ্মণকুমার বাল্যে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া জাফর খাঁ নাম প্রাপ্ত হন। তিনি আরবি ও পারসিক ভাষায় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া অর্থনীতিশাস্ত্রে বিচক্ষণ হইয়া উঠেন। তিনি সম্রাটের শুভদৃষ্টিতে মুরশিদ্ কুলী খাঁ নাম প্রাপ্ত হইয়া আজিম ওসানের অধীনে বাঙ্গালার রাজস্বসচিব হইয়া আসেন। আজিম ওসানের সহিত তাঁহার মনান্তর ঘটে, কিন্তু তিনি নানকর, জলকর, বনকর ধার্য্য করিয়া রামের জমিদারী শ্যামকে ও শ্যামের জমিদারী রামকে দিয়া অর্থসংগ্রহ করত বাঙ্গালী প্রকৃতিপুঞ্জের ঘৃণাভাজন হইয়াও সম্রাটের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন।[৮] সম্রাট্ তাঁহাকে আজিম ওসানের নিকট হইতে দূরে মুর্শিদাবাদে নগর স্থাপন করিতে অনুমতি করেন। ১৭০৪ হইতে ১৭১৮ খৃঃ পর্য্যন্ত কুলী খাঁ মুর্শিদাবাদে বাঙ্গালার নবাব থাকেন। ১৭১৮ খৃঃ তিনি বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাবীপদ পান। ১৭২০ খৃঃ তিনি ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে রাজধানী উঠাইয়া লয়েন। তিনি

বঙ্গের রাজস্ব এককোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা হইতে এক কোটী পঞ্চাশ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি করেন।[৭] ১৭২৫ খৃঃ মুরশিদ্‌কুলী খাঁর মৃত্যু হয়।

অকবরের রাজস্বসচিব টোডরমল্ল বাঙ্গালা ৬৮২ পরগণায় ও ১৮ সরকারে বিভক্ত করেন। টোডরমল্লের রাজস্ব-সংক্রান্ত হিসাবের নাম ওয়াশীল তুমার জমা। তিনিও বাঙ্গালার কর প্রায় এগার লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ১৭৬৭ খৃঃ অঃ হিসাবে বাঙ্গালা ৩৪টী সরকারে ও ১৩৫০ পরগণায় বিভক্ত ছিল। কুলী খাঁর সময়ে বাঙ্গালা ১৬৬০ পরগণায়, ১৩ চাকলায় ও ৩৪ সরকারে (ঘ) বিভক্ত হয়। টোডরমল্ল বাঙ্গালার জমিদার-শক্তির হ্রাস করেন নাই, জমিদারগণ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থজাতীয় ছিলেন।

মোগলশাসন সময়েও বাঙ্গালায় সীতারাম ব্যতীত অনেকগুলি জমিদার স্বাধীন হিন্দুরাজ্য সংস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। মেদিনীপুরের অন্তর্গত চিতুয়ার রাজা শোভাসিংহ ও হেমন্তসিংহ, যশোহরের প্রতাপ আদিত্য, পশ্চিমবঙ্গের মুকুট রায়, সাঁতৈরের শত্রুজিৎ সিংহ ও সংগ্রামসিংহ স্বাধীন হিন্দুরাজ্য সংস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। মোগল-সাম্রাজ্যের অধীনেও কাননগো দর্পনারায়ণ প্রভৃতি অনেক হিন্দু উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত ছিলেন।

মোগলদিগের প্রথম সময়ে পর্ত্তুগীজগণ আরাকান ও বঙ্গদেশে আগমন করেন। শাহ সুজা নবাব হইবার কিছু পূর্ব্ব হইতে ফরাসী, ওলন্দাজ ও ইংরাজ ভাগীরথী ও হুগলী তীরে কুঠী নির্ম্মাণপূর্ব্বক বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। শাহ সুজার সময় হইতে উল্লিখিত ইউরোপীয় জাতিগণ কখন সম্রাট্ পক্ষে, কখন জমিদার পক্ষে, কখন বা

এতদুভয়ের প্রতিকূলে যুদ্ধ করিয়া এ দেশে কম অন্তর্বিপ্লব সংঘটন করেন নাই। পর্ত্তুগীজেরাই বলপূর্ব্বক দেশীয় লোককে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া এবং দেশ আক্রমণ ও লুণ্ঠনপূর্ব্বক দেশের সমধিক অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন।[১]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

-০-

প্রথম অংশ

সীতারামের রাজধানী রাজ্যের ভূবৃত্তান্ত ও অবস্থা

অধুনা যে স্থলে সুন্দর জেলা, সুদৃশ্য নগরী, উত্তম বিচারালয়ের উত্তম অট্টালিকাসমূহ, ডাকঘর, তাড়িতবার্ত্তাগৃহ, দেশী ও বিদেশীয় পণ্যদ্রব্য-পরিশোভিত পণ্যবীথিকা সকল বিরাজ করিতেছে, দ্বিশত বর্ষ পূর্ব্বে নিম্নবঙ্গে সেই স্থলে হয় তো শার্দ্দূল, বরাহ, গণ্ডার, মহিষ, ভল্লুক, বানর, মৃগ, শশক প্রভৃতি বন্যজন্তুসমাকীর্ণ বৃহদাকার বৃক্ষসমাকুল বল্লীবিতান-বিজড়িত নিবিড় অন্ধকারময় অরণ্য বিরাজিত ছিল। কলিকাতার পশ্চিম পার্শ্বস্থ হুগলি বা ভাগীরথীর পূর্ব্বে, নোয়াখালি জেলার পশ্চিমে, পদ্মা, মেঘনা প্রভৃতি নদীর দক্ষিণে এবং বঙ্গোপসাগরের উত্তরে যে প্রকাণ্ড ভূভাগ মানচিত্রে আমাদের নয়নগোচর হয়, তাহারই নাম নিম্নবঙ্গ। এই নিম্নবঙ্গ নদীমাতৃক দেশ। এই দেশ ভাগীরথী ও পদ্মা নদীর 'ব'দ্বীপ। বিজ্ঞানবিদ্‌গণের মতে এই দেশ সমুদ্রগর্ভ হইতে ক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে। এই দেশে নিয়তই পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে। এই দেশে কত নূতন নদী উৎপন্ন হইতেছে ও কত পুরাতন নদী শুষ্ক হইতেছে। এই দেশে

কত সুবৃহৎ বিল শুষ্ক হইয়া সমতল ধান্যক্ষেত্রে পরিণত হইতেছে। কত সুন্দর বৃক্ষ ও গুল্মলতাপূর্ণ বাদা পরিষ্কৃত হইয়া গ্রাম ও নগরে পরিণত হইতেছে।[১০] যে গোরাই নদ এই দেশের মধ্যস্থলে তাহার বিশাল বপুঃ বিস্তার করিয়া রহিয়াছে, যে নদ ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলবর্ত্মের লৌহনির্ম্মিত সেতুর লৌহনির্ম্মিত নিগড় চল্লিশ বৎসর গলে ধারণ করিয়াও গতায়ু হয় নাই, সেই নদ ১২০৩ হিজিরা সালের পূর্ব্বে দশ বা বার হস্ত প্রশস্ত একটী খালমাত্র ছিল।[১১] এই দেশে গত একশত বৎসরের মধ্যে চন্দনা, চৎরা, হামু, কুমার, ফটকি, বারেঙ্গা, বেগবতী, উত্তরকালীগঙ্গা, দক্ষিণকালীগঙ্গা, ছত্রাবতী, চেঙ্গাই, চিত্রা, ভৈরব, মুচিখালি, বারাসিয়া প্রভৃতি নদী শুষ্ক হইয়াছে। কপোতাক্ষী, ইছামতী, সরস্বতী, ভাগীরথী, জলঙ্গী, খড়িয়া, চূর্ণী প্রভৃতি নদী যায়-যায় হইয়া উঠিয়াছে। সুন্দরবন দক্ষিণে সরিয়া গিয়াছে। বৃহৎ বিল এক্ষণে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

উত্তরকালীগঙ্গা নদীতীরে ভূষণা, হরিহরনগর, মহম্মদপুর প্রভৃতি নগর ছিল। বর্ত্তমান ভারতের রাজধানী কলিকাতা যেমন কোন স্থান-বিশেষের নাম নহে, কতকগুলি স্থানের সাধারণ নাম, মহম্মদপুরও সেইরূপ কতকগুলি স্থানের সাধারণ নাম। বর্ত্তমান সময়ে মহম্মদপুরের পূর্ব্বে স্রোতস্বতী মধুমতী নদী। গোরাই নদের দক্ষিণাংশকেই মধুমতী বলে। সীতারামের সময়ে মহম্মদপুরের পূর্ব্বে এলেংখালি নামক একটী ক্ষুদ্র খাল ছিল। অদ্যাপি মহম্মদপুরের নিকট মধুমতীর খেওয়া ঘাটকে এলেংখালির ঘাট বলে। কালীগঙ্গা নদী মহম্মদপুরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত ছিল। ছত্রাবতী নামে আর একটী নদী মহম্মদপুরের উত্তর দিয়া কুল-কুল নাদে প্রবাহিত হইত। মহম্মদপুর নগর ও তাহার উপকণ্ঠ প্রায়

সাত মাইল দীর্ঘ ও তিন মাইল প্রস্থ ছিল। নৈহাটী, রায়পাশা, বাউই-জানি, ধুপড়িয়া, নারায়ণপুর, কোঠাবাড়ী, জাঙ্গালিয়া, ঘুগনাইল, ধুলজুড়ি, ধোঁয়াইল, কানাইনগর, গোপালপুর, গোকুলনগর, ঘুঙ্গইচ, রুইজানি, বীরপুর, হরেকৃষ্ণপুর, রামপুর, তেলিপুকুর, চিত্তবিশ্রাম-পুর, বঙ্গেশ্বর, সূর্য্যকুণ্ড, শ্যামনগর, আউলাড়া, জনার্দ্দনপুর, কানুটীয়া মহিষা, শ্যামগঞ্জ, চাঁপাতলা, যশপুর, ঘোষপুর, বিনোদপুর, ঘুল্লিয়া প্রভৃতি গ্রাম মহম্মদপুর রাজধানী ও তাহার উপকণ্ঠের অন্তর্গত ছিল।

সীতারামের প্রাদুর্ভাবের একশত বৎসর পূর্ব্বে নিম্নবঙ্গের জনসংখ্যা অতি অল্প ছিল। যে লোকসংখ্যা ছিল, তাহার মধ্যে উচ্চশ্রেণীর লোকের সংখ্যা অতি অল্প। রাঢ় অঞ্চলে মহারাষ্ট্রা বর্গীগণের আক্রমণ ও তাহাদের অমানুষিক অত্যাচারে ও মোগল পাঠানের নিয়ত যুদ্ধহেতু অত্যাচার-উৎপীড়নভয়ে সীতারামের প্রাদুর্ভাবের অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্ব হইতে এ দেশে উচ্চশ্রেণী হিন্দুগণের বসতি আরম্ভ হয়। সীতারামের সময়ে এ দেশের ভয়ানক দুরবস্থা। বাদসাহ অরঙ্গজেবের চিত্ত এক দাক্ষি-ণাত্যজয়ে আকৃষ্ট ছিল। বঙ্গের নবাবের সময় কেবল সম্রাটের প্রীতিসাধ-নার্থ অর্থসঞ্চয়ে নিয়োজিত (১)। রাজ্যভ্রষ্ট, দলভ্রষ্ট, হৃতসর্ব্বস্ব পাঠানগণ দলে দলে এই সময়ে নিম্নবঙ্গে আসিয়া বসতি করিতেছিল এবং এ অঞ্চলের লোকদিগের সহিত মিলিয়া দস্যুতা করিতেছিল (২)। স্রোতঃস্বান্ ব্রহ্মপুত্র নদ বাহিয়া আসামীগণ এদেশে আসিয়া গ্রামের পর গ্রাম লুণ্ঠন করিতে-ছিল (৩)। আরাকান হইতে মগগণ নৌকাপথে এ অঞ্চলে আসিয়া পৈশাচিক অত্যাচার করিতেছিল। তাহারা বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী হইয়েও তাহাদের অকরণীয় কোন পাপ ছিল না এবং কোন দ্রব্য তাহাদের

অথাস্থ হইত না। মগেরা গ্রাম নগর লুণ্ঠন করিত, বাধা পাইলে গ্রাম-দাহ ও নরহত্যা করিত। তাহারা বালক, বালিকা ও যুবতী হরণ করিয়া লইয়া যাইত। (৪) পর্ত্তুগীজদিগের অত্যাচারও কম ছিল না। তাহারাও গ্রাম লুটপাট করিত এবং নরনারীদিগকে বলপূর্ব্বক খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিত (৫)। দেশীয় ইতর লোকেরা দলবদ্ধ হইয়া দস্যুতা করিত। ইহাদের মধ্যে রঘো, শ্যামা, বিশে প্রভৃতি দ্বাদশ দস্যু বিখ্যাত।

উল্লিখিত পঞ্চবিধ অত্যাচারে দেশের শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য, এমন কি, কৃষিকার্য্য পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। দলে দলে লোক এ অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া কুমিল্লা ও শ্রীহট্ট অঞ্চলে যাইতেছিল। দেশীয় লোকের মনে নিরতিশয় আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাওয়া তখন ভয়ের বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। তখন তীর্থ-পর্য্যটন প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। সেই সময় গয়া, কাশী যাওয়া দূরের কথা, গঙ্গা-স্নানে নবদ্বীপ বা চক্রদহে কেহ গমনকালে তাহার পরিজনগণ ক্রন্দনের রোল উঠাইত। বাজার ও বন্দর সকল নষ্ট হইয়া যাইতেছিল। দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত কেবল লোকের মর্ম্মপীড়ার আর্ত্তনাদ ও ত্রাসজনিত দীর্ঘ-নিশ্বাসে পূর্ণ হইয়াছিল।

দ্বিতীয় অংশ।

সীতারামের রাজ্যের মধ্যস্থিত ও পার্শ্ববর্ত্তী সংস্পৃষ্ট জমিদারগণের ইতিহাস।

নলডাঙ্গার রাজবংশ:—এই রাজবংশ রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ইহারা

শাণ্ডিল্য গোত্র ও শ্রেষ্ঠ বংশজ আখণ্ডল সন্তান। ঢাকা জেলার অন্তঃপাতী ভব্‌রসুবা গ্রামে হলধর ভট্টাচার্য্য নামক এক ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার পঞ্চমপুরুষ নিম্নে বিষ্ণুদাস হাজরা নামক একব্যক্তি যোগবলে বিশেষ শক্তিধর হন। তিনি পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া ক্ষত্রমুনি (হাজরাহাটী) গ্রামে জঙ্গলে বাস করিতে থাকেন। ঢাকা হইতে নবাব নৌকাপথে গমনকালে খাদ্যাদির অভাবে পতিত হন। নবাবের লোকেরা খাদ্যের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলে তাঁহারা যোগীর আশ্রম প্রাপ্ত হন। বিষ্ণুদাস যোগবলে নবাবের লোকদিগের প্রয়োজনীয় দ্রব্য দান করেন। নবাব পরিতুষ্ট হইয়া বিষ্ণুদাসকে হাজরাহাটী ও তন্নিকটস্থ চারি খানি গ্রাম দান করিয়া যান। বিষ্ণুদাসের পুত্র শ্রীমন্ত রায় সমরনৈপুণ্যের জন্য রণবীর খাঁ নাম ধারণপূর্ব্বক স্বরূপপুরের আফগান জমিদারকে পরাস্ত করিয়া সমগ্র মহামুদসাহী পরগণা হস্তগত করেন। রণবীরের পুত্র গোপীনাথ দেবরায়। গোপীনাথের পুত্র চণ্ডীচরণ দেবরায় প্রথমে রাজা উপাধি লাভ করেন। চণ্ডীচরণ দেবরায়ের পুত্র শূরনারায়ণ দেবরায়। রাজা শূরনারায়ণের ছয় পুত্র—উদয়নারায়ণ, রামদেব, ঘনশ্যাম, নারায়ণ, রাজারাম এবং রামকৃষ্ণ। ইহাঁরা গৃহবিচ্ছেদে মত্ত হইয়া জমিদারী বিভাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। রাজকর বাকি পড়িয়াছিল। নবাব সরকার হইতে উদয়নারায়ণকে ধৃত করিবার জন্য সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল। রামদেবের চক্রান্তে নবাব-সৈন্যকরে উদয়নারায়ণ নিহত হইয়াছিলেন। রামদেব এইরূপে ভ্রাতৃনিধন সাধন করিয়া জমিদারী হস্তগত করিয়াছিলেন। রামদেব সন ১১০৫ হইতে ১১৩৪ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এই রামদেবই আমাদের সীতারামের

সমসাময়িক ছিলেন। রামদেবের পুত্র রঘুদেব নবাব-নিদেশ পালন না করায়, তাঁহার জমিদারী নবাবের আদেশে নাটোরের রাজা রামকান্ত হস্তগত করেন। তিন বৎসর পরে রঘুদেব পুনরায় স্বীয় জমিদারী লাভ করেন। ১১৮০ সালে রঘুদেবের পুত্র কৃষ্ণদেবের মৃত্যু হয়। কৃষ্ণদেবের দুই ঔরস পুত্র মহেন্দ্রশঙ্কর ও রামশঙ্কর এবং এক দত্তক পুত্র গোবিন্দচন্দ্র দেবরায়। ইঁহাদের সময়ে মহামুদ-সাহী পরগণা তিনভাগে বিভক্ত হয়। মহেন্দ্রশঙ্করের উত্তরাধিকারিগণের জমিদারী নড়াইলের জমিদারগণ ক্রয় করিয়াছেন। রাজা রামশঙ্কর রায়ের পুত্র রাজা শশিভূষণ রায়, রাজা শশিভূষণের দত্তক পুত্র রাজা ইন্দুভূষণ দেবরায় ও রাজা ইন্দুভূষণের দত্তক পুত্র রাজা প্রমথভূষণ দেবরায়। এই রাজবংশ দেবালয়, দেবমূর্ত্তি স্থাপন ও নিষ্কর দানের জন্য সুবিখ্যাত।[১৩] ইঁহারা শান্তিপ্রিয় জমিদার।

শুনা যায় রাজা রামদেবের সময় জঙ্গলবাধাল অঞ্চলের শ্রীনাথ বসু নামক এক কুলীন কায়স্থ তাঁহার দেওয়ান ছিলেন। তিনি সীতারামের সহিত রামদেবের মীমাংসা করিয়া হরিশঙ্করপুরে বহু ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। হরিশঙ্করপুরের বসুগণ এ অঞ্চলের গণ্যমান্য কায়স্থ বংশ। শ্রীনাথের নামানুসারে ইঁহাদের নারায়ণের নাম শ্রীধর। মুনসেফ বিজয়গোপাল ও অধ্যাপক কালীপদ সংপ্রতি এই বংশের খ্যাতনামা লোক।

নান্দইলের রাজা শচীপতি :—রাঢ়ীশ্রেণীর বৈদ্যবংশজ শচীপতি মজুমদার রাজা শূরনারায়ণের বংশধরগণের গৃহবিচ্ছেদের সুবিধা পাইয়া মহামুদসাহী পরগণার কিয়দংশ লইয়া পরগণে নান্দইল নাম দিয়া স্বাধীন রাজা হন। পরে নলডাঙ্গার রাজগণ কর্ত্তৃক তাঁহার পরাজয় হয়।

নাল্দইলে রাজার ঘাট, রাজার বাড়ী নামক স্থান এখনও আছে। মৃত বিখ্যাত কবিরাজ প্যারিমোহন মজুমদার রাজা শচীপতির বংশধর; কিন্তু ইঁহারা পরে নলডাঙ্গা রাজসরকারে কার্য্য লওয়ায়, রাজা শচীপতির উত্তর-পুরুষ বলিয়া বড় স্বীকার করেন না।" কথিত আছে, শচীপতি সীতারামের পরামর্শে স্বাধীন হইয়াছিলেন।

যশোহর চাঁচড়ার রাজবংশ:—১৫৮২ খৃঃ আজিম খাঁ বাঙ্গালার বিদ্রোহদমন করিতে আসেন। ভবেশ্বর রায় তাঁহার একজন সহচর সেনানায়ক ছিলেন। যুদ্ধান্তে ভবেশ্বর আজিমের নিকট সৈয়দপুর, আমিদপুর, মুড়গাছা ও মল্লিকপুর পরগণার জমিদারীসত্ব উপহার পাইয়াছিলেন। ১৫৮৮ খৃঃ তাঁহার মৃত্যু হইলে, তাঁহার উত্তরাধিকারী মুতুবরাম রায় ১৬১৯ খৃঃ পর্য্যন্ত এই সকল পরগণা ভোগ করেন। প্রতাপাদিত্যের সহিত মানসিংহের সংগ্রামকালে তিনি মানসিংহকে সাহায্য করিয়াছিলেন। মানসিংহ যুদ্ধে জয়ী হওয়ায় মুতাবের পরগণা সকল মুতাবেরই দখলে থাকিয়া যায়। মুতাব ১৬১১ খৃঃ হইতে সম্রাট্ সরকারে কর দিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী কন্দর্প রায় ১৬৪৯ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। কন্দর্প রায় দাঁড়িয়া, খলিসাখালি, বাগমাড়া, সেলিমাবাদ ও সাজিয়ালপুর পরগণায় স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। এই সকল পরগণা সৈয়দপুর পরগণার দক্ষিণ পশ্চিমে সংস্থাপিত। কন্দর্পের উত্তরাধিকারী মনোহর রায় সীতারামের সমসাময়িক লোক ছিলেন। তিনিও সীতারামের ন্যায় রাজ্যবিস্তারে প্রমত্ত ছিলেন। তিনি ১৬৮২ খৃঃ রামচন্দ্রপুর, ১৬৮৯ খৃঃ হোসেনপুর, ১৬৯১ খৃঃ রংদিয়া ও রহিমাবাদ, ১৬৯০ খৃঃ চেঙ্গুটিয়া, ১৬৯৬ খৃঃ ইসুপপুর, ১৬৯৯ খৃঃ মাল্লে,

ছোবনাল, ছোবনা ও ১৭০৩ খৃঃ সাহস পরগণা লাভ করেন। তল্লা, ফলুয়া, শ্রীপদকবিরাজ, ভাটুলা, কলিকাতা প্রভৃতি অনেক ক্ষুদ্র পরগণাও তাঁহার শাসনাধীন ছিল। মনোহর রায়ই রাজ্যের সবিশেষ উন্নতি করেন। তিনি উত্তররাঢ়ী কায়স্থগণের মধ্যে গণ্য হইয়া নানা স্থান হইতে সম্ভ্রান্ত কায়স্থ আনিয়া স্ব-সমাজের পুষ্টিসাধন করেন। ১৭০৫ খৃঃ মনোহরের মৃত্যু হয়। মনোহরের পুত্রের নাম কৃষ্ণরাম রায়। তাঁহার সময়ে মহেশ্বরপাশা ও রায়মঙ্গল পরগণা এবং কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরগণা তাঁহার শাসনাধীন হয়। তিনি কৃষ্ণনগরের রাজার নিকট হইতে বাজিৎপুর পরগণার কিয়দংশ ক্রয় করেন। ১৭২৯ খৃঃ কৃষ্ণদেবের পর শুকদেব রাজা হন। মনোহরের বিধবা পত্নীর অনুরোধে শুকদেব তাঁহার রাজ্যের চারি আনা অংশ তাঁহার ভ্রাতা শ্যামসুন্দরকে অর্পণ করেন। এইরূপে জমিদারী দুই ভাগে বিভক্ত হয়। শুকদেবের পুত্র নীলকণ্ঠ ১৭৪৫ খৃঃ রাজ্য লাভ করেন। ১৭৫৮ খৃঃ নবাব ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে কলিকাতার নিকটস্থ কিছু জমি দান করেন। সেই ভূ-সম্পত্তির মালেক ছালাউদ্দীন খাঁ যখন নবাবের নিকট স্বীয় সম্পত্তি নাশে আবার সম্পত্তির প্রার্থী ছিলেন, তখন শ্যামসুন্দর ও তাঁহার শিশু পুত্রের মৃত্যু হওয়ায় চাঁচড়ারাজ্যের চারি আনা অংশ তাঁহার সহিত বন্দোবস্ত করা হইল। এই জমিদারীর চারি আনা অংশকে সৈয়দপুর ও বার আনা অংশকে ইসুপপুর রাজ্য বলিত। ১৭৬৪ খৃঃ নীলকণ্ঠের পর বার আনা অংশে শ্রীকণ্ঠ রাজা হন। শ্রীকণ্ঠ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় সকল জমিদারী হারাইয়া ইংরাজের বৃত্তিভোগী হন। ১৮০২ খৃঃ বাণীকণ্ঠ শ্রীকণ্ঠের উত্তরাধিকারী হইয়া সুপ্রিম আদালতে মোকদ্দমা করিয়া ১৮০৮ খৃঃ স্বীয় জমিদারী উদ্ধার করেন। ১৮১৭ খৃঃ নাবালক

বরদাকণ্ঠ পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হন। সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডের তত্ত্বাবধানে যায়। এই সময়ে সম্পত্তির বিশেষ উন্নতি হয় ও সাহস পরগণা নিলাম খরিদ করা হয়। বরদাকণ্ঠের পদগৌরব ও সিপাহীবিদ্রোহ কালীন সহায়তার প্রতি লক্ষ্য করিয়া মহামতি লর্ড কেনিং তাঁহাকে রাজাবাহাদুর উপাধি ও সনন্দ দান করেন। চারি আনা জমিদারীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সময়ে মন্নুজান বিবি ইহার তত্ত্বাবধান করিতেন। তিনি জমিদারী কার্য্যে অতি বিচক্ষণতা দেখাইয়াছেন। তাঁহার ভ্রাতা মহম্মদ মোমিন তাঁহার মৃত্যু অন্তে ঐ চারি আনা জমিদারী প্রাপ্ত হন। তিনি অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুকালে এই জমিদারী হুগলির ইমামবাড়ীর কার্য্য চালাইবার জন্য দান করিয়া যান। এই হাজি মহম্মদ মসিনের জমিদারীর আয় হইতে হুগলি-কলেজ ও মুসলমান শিক্ষার অনেক সুবিধা হইয়াছে।

ধর্ম্মদাস মগ:—আরাকান হইতে আসিয়া গোরাই নদের উৎপত্তি স্থানে খুলুমবাড়ী প্রভৃতি কতিপয় গ্রাম দখল করিয়া লইয়া ধর্ম্মদাস নামে একজন মগ আধিপত্য করিতে থাকে। তাঁহার শাসনাধীন গ্রামসমূহের নাম মগজায়গীর পরগণা হয়। খড়েরা, চামটালপাড়া, খুলুমবাড়ী ও আর কয়েক মৌজা এই পরগণার অন্তর্গত ছিল। ধর্ম্মদাস সম্রাট্ অরঙ্গজেবের সময় বন্দী হন এবং মুসলমানধর্ম্ম অবলম্বন করায় নিজাম শা নাম ও মগ-জায়গীর পরগণা জায়গীর প্রাপ্ত হন।[১৫] মগদিগের যাতায়াতের জন্য নবগঙ্গাতীরস্থ বরুণাতৈল, মাগুরা, মহাটা, পানিঘাটা প্রভৃতি গ্রামে মঘুয়া ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, বারুই প্রভৃতির বাস হইয়াছে। অনুমান হয়, মাগুরা (ঙ) এবং মঘি গ্রামের নাম মগ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

রাজা সংগ্রাম শাহ :—সংগ্রাম শাহ সম্বন্ধে ঢাকার ইতিহাসলেখক মিঃ ক্লে, বরিশালের ইতিহাসলেখক মিঃ বিভারীজ, যশোহরের ইতিহাস-লেখক মিঃ ওয়েষ্টল্যাণ্ড ও বঙ্গের ইতিহাসলেখক ডাক্তার হান্টার স্ব স্ব ইতিহাসে কিছুই বলেন নাই। কিন্তু তথাপি আমরা সংগ্রাম শাহ সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া থাকিতে পারি না। বর্ত্তমান ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত মথুরাপুর গ্রামে চন্দনা নদীতটে মথুরাপুরের দেউল নামে এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা আছে, ইহা সংগ্রাম শাহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। সংগ্রাম শাহ জাতিতে ক্ষত্রিয়। তিনি পশ্চিম দেশ হইতে এদেশে আসিয়া স্বীয় বাহুবলে রাজ্য বিস্তার করেন। এদেশে ব্রাহ্মণের নিম্নেই বৈদ্যজাতি জানিয়া তিনি 'হাম বৈদ্য বলিয়া' বৈদ্য হইতে চাহেন। সংগ্রাম শাহ হইতে হামবৈদ্য নামে এক বৈদ্য সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। সংগ্রাম শাহের সভায় শ্রীকান্ত বেদাচার্য্য নামে একজন জ্যোতির্ব্বিদ্ ছিলেন। তিনি গণনা করিয়া, পরদিন দ্বিপ্রহরের বেলায় সংগ্রামের মৃত্যু হইবে, বলেন। ইহাতে বেদাচার্য্যের সম্পত্তি সংগ্রাম বাজেয়াপ্ত করিয়া লয়েন। বেদাচার্য্যের প্রপৌত্র দেবীপ্রসাদ ন্যায়ালঙ্কার ও দেবীপ্রসাদের পুত্র নন্দকুমার ভট্টাচার্য্য। নন্দকুমার প্রায় ২৫ বৎসর হইল ৭৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। এই বংশের হিসাবে ও পরিশিষ্টের সনন্দ দৃষ্টে আমরা জানিতে পারি যে, ১৬৪২ খৃঃ যুদ্ধে সংগ্রামের মৃত্যু ঘটে। ফতেয়াবাদ সরকারের ফৌজদারের বাসস্থান ভূষণায় উঠিয়া আসে। সংগ্রামের জমিদারীর সুবন্দোবস্ত উপলক্ষেই উদয়নারায়ণ ভূষণায় সাঁজোয়াল হইয়া আইসেন।[১৩] সংগ্রামের স্বাধীনতা অবলম্বনে পাঠান মুসলমানগণ কর্ত্তৃক তাঁহার নিধন সাধিত হয়।

নাটোরের রাজবংশ :—এই রাজবংশ সম্ভ্রান্ত বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। রামজীবন ও রঘুনন্দন দুই সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। রঘুনন্দন কাজ-কর্ম্মের উমেদার অবস্থায় পুঁটিয়ার রাজবাটীতে গিয়াছিলেন। একদিন অপরাহ্নে বিষধর সর্প রঘুনন্দনের মুখোপরি পতিত সৌরকর ফণা-বিস্তারে নিবারণ করিতেছে দেখিয়া পুঁটিয়ারাজ তাঁহার ভাবী উন্নতির বিষয় বুঝিতে পারেন। তিনি রঘুনন্দনকে প্রতিজ্ঞা করান যে, তিনি পুঁটিয়ার দু' পরগণার উপর হস্তক্ষেপ করিবেন না। রঘুনন্দন মুর্শিদাবাদে পুঁটিয়ারাজের উকিলস্বরূপ গমন করেন। তথায় তিনি স্বীয় প্রতিভাবলে সুবা বাঙ্গালার রাজস্ব-সচিব পদে নিযুক্ত হইয়া রায়রাঁয়া উপাধি প্রাপ্ত হন। জ্যেষ্ঠ রামজীবন রাজা হন। রামজীবনের দত্তক পুত্রের নাম রামকান্ত। রাজা রামকান্তের রাণীর নাম বঙ্গবিখ্যাতা রাণী ভবানী। রাণী ভবানীর গর্ভজাতা কন্যার নাম তারামণি ও দত্তক পুত্রের নাম রামকৃষ্ণ। রাজা রামকৃষ্ণ পরম যোগী ছিলেন। তাঁহার সময়ে নাটোরের জমিদারীর অনেক নষ্ট হয়। রামকৃষ্ণের দুই পুত্র—বিশ্বনাথ ও শিবনাথ। বিশ্বনাথ ও শিবনাথ হইতে নাটোরের বড় ও ছোটতরপ রাজবংশ বহির্গত হইয়াছে। রাজা বিশ্বনাথের পুত্র রাজা গোবিন্দচন্দ্র, গোবিন্দচন্দ্রের পুত্র রাজা গোবিন্দনাথ, গোবিন্দনাথের পুত্র মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ ও জগদিন্দ্রনাথের পুত্র যোগীন্দ্রনাথ। ছোটতরফে শিবনাথের দত্তকপুত্র আনন্দনাথ, আনন্দনাথের ৪ পুত্র, চন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, নগেন্দ্রনাথ ও যোগেন্দ্রনাথ। রাজা যোগেন্দ্রনাথের পুত্র যতীন্দ্রনাথ ও যতীন্দ্রনাথের পুত্র বীরেন্দ্রনাথ। এই বংশের রাজা চন্দ্রনাথ বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। নাটোর রাজবংশের জমিদারী লইয়া

বঙ্গের অনেক জমিদারবংশ জমিদারী পাইয়াছেন। এই রাজবংশ দেবদেবীপ্রতিষ্ঠা, নিষ্কর ভূমিদান ও অর্থদানের জন্য বিখ্যাত।

দীঘাপতিয়া-রাজবংশ:—এই রাজবংশ জাতিতে তেলী। দয়ারাম রায় এই রাজবংশের স্থাপয়িতা। দয়ারাম রাজা রামজীবনের সময় হইতে রাণী ভবানীর সময় পর্য্যন্ত নাটোর রাজবংশের দেওয়ান ছিলেন। দয়ারাম বুদ্ধিমান্, বিচক্ষণ ও বিশ্বস্ততাগুণে ভূষিত। রাজা প্রসন্ননাথ, প্রমথনাথ প্রভৃতি নানা সদ্‌গুণের পরিচয় দিয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট বিশেষ সম্মান লাভ করেন। রাজবংশের নানা সদনুষ্ঠান ও দেবদেবী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

নড়াইলের বাবু উপাধিধারী জমিদার-বংশ:—আদিশূরের সভায় যে পুরুষোত্তম দত্ত আসেন, নড়ালের বাবুগণ তাঁহারই বংশধর। ঘটকের মতে, ইহাঁরা বালির দত্ত ও কায়স্থ-গোষ্ঠীপতি বলিয়া পরিচিত। বর্গীর হাঙ্গামে ইহাদের আদিপুরুষ বালী হইতে মুর্শিদাবাদের নিকটে চৌরা-গ্রামে পলায়ন করেন। তথা হইতেও বর্গীর ভয়ে মদনগোপাল দত্ত নড়াইলে আগমন করেন। মদনগোপালের ব্যবসায়ে অনেক টাকা খাটিত, কিন্তু তাঁহার ভূসম্পত্তির মধ্যে বার বিঘা মাত্র বসতবাটী ছিল। মদনগোপালের পুত্রের নাম রামগোবিন্দ ও রামগোবিন্দের পুত্রের নাম রূপরাম। রূপরাম নাটোর রাজসরকারের মোক্তার হইয়া মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হন। রূপরাম নাটোররাজ-অধীনে ১১৯৮ সালে (১৭৯১ খৃঃ) ১৪৮৲ টাকায় এক জমা করেন। রূপরাম ১৮০২ খৃঃ কালীশঙ্কর ও রামনিধি নামে দুই পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। কালীশঙ্কর নাটোর রাজসরকারে দেওয়ানী পদ পান। তিনি অসাধারণ প্রতিভা ও

গুণসম্পন্ন লোক ছিলেন। ভূষণা জমিদারী কালীশঙ্করের সহিত বন্দোবস্ত করা হয়। বাকি করে নাটোর রাজার পরগণা সকল বিক্রয় হইতে আরম্ভ হইলে কালীশঙ্কর তেলিহাটী, বিনোদপুর, রূপাবাদ, খালিয়া ও পোক্তানি পরগণা নিজে ক্রয় করেন। এই সকল পরগণা কালীশঙ্কর নিজের অধীনস্থ লোকের বিনামে ক্রয় করেন। আর কয়েকটী ক্ষুদ্র পরগণাও তিনি এই সময়েই ক্রয় করিয়াছিলেন। ১৭৯৫ হইতে ১৭৯৯ খৃঃ মধ্যে এই সকল পরগণা ক্রয় করা হয়। কালীশঙ্করের বিরুদ্ধে কোর্ট অব ওয়ার্ড মোকদ্দমা করিয়া তাঁহাকে কর বাকি ফেলার জন্য কারারুদ্ধ করেন। চারি বৎসরের পর কিছু টাকা দিয়া মোকদ্দমা মিটাইয়া কালীশঙ্কর মুক্তিলাভ করেন। ওয়েষ্টল্যাণ্ড বলেন, কালীশঙ্কর বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া নাটোরের অনেক জমিদারী আত্মসাৎ করেন। কালীশঙ্করের দুইপুত্র, রামনারায়ণ ও জয়নারায়ণ। কালীশঙ্কর ১৮২০ খৃঃ কাশীধামে গমন করেন। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে জয়নারায়ণের, ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে রামনারায়ণের এবং ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ৯০ বৎসর বয়সে কালীশঙ্করের মৃত্যু হয়। তিনি শতাধিক ভূসম্পত্তি রাখিয়া যান। কালীশঙ্কর মুর্শিদাবাদের নবাব সরকার হইতে রায় উপাধি পান। রামনারায়ণের তিন পুত্র—রামরতন, হরনাথ ও রাধাচরণ এবং জয়নারায়ণের দুই পুত্র, দুর্গাদাস ও গুরুদাস। রামনারায়ণ পিতার পরিবর্ত্তে কিছুদিন দেওয়ানী জেলে বাস করিয়া পিতাকে কতিপয় ধর্ম্মানুষ্ঠানের অবসর দেওয়ায় কালীশঙ্কর অধিকাংশ সম্পত্তি তাঁহাকে উইল করিয়া দিয়া যান। এই উইল সম্বন্ধে রামরতন ও গুরুদাস এই দুই জনের মধ্যে ৪৪ লক্ষ টাকা দাবিতে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে

মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে এই মোকদ্দমায় জজ্ আদালতে গুরুদাস অকৃতকার্য্য হন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে এই মোকদ্দমায় গুরুদাস হাইকোর্টে জয়লাভ করেন। প্রিভিকাউন্সেলে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে উভয় সরীকে মোকদ্দমা মীমাংসা করেন। বাবু রামরতন বুদ্ধিমান্, বিচক্ষণ ও শ্রমশীল জমিদার ছিলেন। তিনি মাহমুদসাহি পরগণার ⅛ অংশ ক্রয় ও অন্যান্য জমিদারীর শ্রীবৃদ্ধি করেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে রামরতনের, ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে হরনাথ ও ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে রাধাচরণের মৃত্যু হয়। যশোহর, ফরিদপুর, বরিশাল, পাবনা, নদিয়া, চব্বিশপরগণা, হুগলী, মুজাপুর ও বারাণসী জেলায় এই জমিদার-বংশের জমিদারী আছে। রতনবাবুর মাতৃশ্রাদ্ধ ও রতনবাবুর নিজ শ্রাদ্ধ অতি সমারোহে সমাহিত হইয়াছিল। এই বংশে রামনারায়ণের শাখায় দান ও উন্নমশীল নরেন্দ্রবাবু প্রভৃতি ও জয়নারায়ণের শাখায় গুরুদাস বাবুর পুত্র গোবিন্দবাবুর দুইপুত্র জিতেন্দ্রনাথ ও দেবেন্দ্রনাথ জীবিত আছেন।”

তৃতীয় অংশ

বার ভূঁইয়ার ইতিহাস।

অর্থাৎ

যে সকল জমিদারগণের রাজ্যে সীতারামের রাজ্য গঠিত হয়, তাহার বিবরণ।

পদ্মার উত্তরপারে দিনাজপুর, পুঁটিয়া, নাটোর ও তাহেরপুরের রাজবংশ এবং পদ্মার দক্ষিণপারে যশোহরের প্রতাপাদিত্য, চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্প, বিক্রমপুরের চাঁদ রায় ও কেদার রায়, ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্য, ভূষণার মুকুন্দ রায়, চাঁদপ্রতাপের চাঁদগাজি, ভাওয়ালের ফজলগাজি ও খিজিরপুরের ঈশা খাঁ মসনদালী, এই বার ঘর জমিদার লইয়া বারভূঞা দল গঠিত হয়। ইঁহারা কোন সময়ে স্বাধীন রাজ্যস্থাপনে অভিলাষী হইয়াছিলেন। ইঁহাদিগের সকলেরই গড়বেষ্টিত দুর্গ, গোলা কামান, বন্দুক, গুলি প্রভৃতি যুদ্ধোপকরণ ছিল। রাজা মানসিংহ ইঁহাদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। পুস্তকের কলেবর পুষ্ট হয় এজন্য আমরা ইঁহাদিগের সকলের বিবরণ লিপিবদ্ধ না করিয়া কেবল সীতারামের সংসৃষ্ট প্রতাপাদিত্য, চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্প ও রামচন্দ্র রায়, নাটোরের রামকৃষ্ণ, ভূষণার মুকুন্দ রায়, বিক্রমপুরের চাঁদ রায় ও কেদার রায়, ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্য ও খিজিরের ঈশা খাঁর সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম।

(১) প্রতাপাদিত্য :—প্রতাপাদিত্য বঙ্গজ কায়স্থ ছিলেন। ইঁ

বিক্রমপুর, চন্দ্রদ্বীপ প্রভৃতি স্থান হইতে কুলীন কায়স্থ আনিয়া স্বীয় সমাজে বাস করাইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সমাজকে এক্ষণে টাকী শ্রীপুরের সমাজ বলে। প্রতাপ নিজে কুলীন ছিলেন না। প্রতাপের পিতা বিক্রমাদিত্য তাণ্ডায় (চ) বঙ্গেশ্বর দাউদের একজন বিচক্ষণ মন্ত্রী ছিলেন। দাউদের সহিত সম্রাটের যুদ্ধ বাধিবার উপক্রমে বিক্রম তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। যুদ্ধে ভাবী বিপদ আশঙ্কায় সপরিবারে বাস করিবার নিমিত্ত বিক্রম বহু নদীপূর্ণ সুন্দরবনের মধ্যে একটী বাটী নির্ম্মাণ করিতে অভিলাষী হন। সেই গৃহনির্ম্মাণের জন্য দাউদ গৌড় হইতে বহুমূল্য প্রস্তরাদি বিক্রমকে দান করেন ও স্বীয় বহুমূল্য হীরক রত্নাদি ও প্রতাপের সহিত প্রেরণ করেন। পূর্ব্বে চব্বিশ-পরগণার এবং বর্ত্তমান খুলনা জেলার অন্তর্গত কালীগঞ্জ থানার অধীন সেইস্থান ক্রমে একটী সুন্দর নগর হইয়া উঠিল। নগরের নাম যশোহর (ছ) হইল, যশোহরের অর্থ—যে নগরের শ্রীসমৃদ্ধি ও অট্টালিকার নির্ম্মাণ-কৌশল সকল নগরের যশঃ হরণ করে। এই নগর খৃষ্টীয় ১৫৫৮ অব্দে সংস্থাপিত হয়। বিক্রমের অশেষগুণসম্পন্ন পুত্রের নাম প্রতাপাদিত্য। প্রতাপাদিত্য বঙ্গের অপরাপর জমিদারগণের সহিত বঙ্গে স্বাধীন হিন্দুরাজ্যস্থাপনে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। তিনি মতপার্থক্যের নিমিত্ত খুল্লতাত বসন্তরায়কে নিধন করেন এবং অবিশ্বাসী জামাতা চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্রকে সংহার করিতে উদ্যোগী হন। মোগলসম্রাটের সহিত প্রতাপ দীর্ঘকাল যুদ্ধ করেন। তিনি আজিম খাঁ প্রভৃতি সেনাপতিদিগকে পরাস্ত করিয়া বিদূরিত করিয়া দেন। মানসিংহকেও তিনি যুদ্ধে পরাস্ত করেন। শেষদিনের যুদ্ধে বাঙ্গালায় বিশ্বাস

ঘাতকতায় বাঙ্গালীবীর প্রতাপাদিত্যের পরাজয় ঘটে। ১৬১৪ খৃষ্টাব্দে প্রতাপের পরাজয় ও ঐ খৃষ্টাব্দের জ্যৈষ্ঠমাসে ৺কাশীধামে প্রতাপের মৃত্যু হয়। প্রতাপের সংস্থাপিত রাজ্যের নামও যশোহর রাজ্য ছিল জাহাঙ্গীরনগরের যে নবাব-ফৌজদার ছিলেন, তাঁহাকে যশোহরের ফৌজদার বলিত। মুরলিতে বৃটীশ-গভর্ণমেণ্টের যে জেলা বসে তাহাকেও যশোহর জেলা বলিত এবং ঐ জেলা কশবায় আসিবার পরেও উহার যশোহর নামই থাকিয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে যশোহর রাজ্যের জেলা বলিয়া কশবার নামই যশোহর হইয়া পড়িয়াছে।[১১]

২। চন্দ্রদ্বীপ বাকলার কন্দর্প রায় ও রামচন্দ্ররায় বঙ্গজকায়স্থ ছিলেন। ইঁহারা বসু উপাধিধারী কুলীন। ইঁহাদের সমাজের নাম চন্দ্রদ্বীপ-বাকলার সমাজ। কন্দর্প রায়ের পুত্র রামচন্দ্র রায়। উনি প্রতাপাদিত্যের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ইনি প্রতাপের সহিত একমত হইয়া প্রথমে মোগলবিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে সম্মত ছিলেন, পরে যুদ্ধে অসম্মতি প্রকাশ করায় প্রতাপের সহিত তাঁহার বিরোধ ঘটে। রামচন্দ্র ভুলুয়ার লক্ষ্মণ মাণিক্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নৌযুদ্ধে পটু ছিলেন।

৩। সাঁতৈরের রামকৃষ্ণ:—সাঁতৈরের রাজা রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে আমরা কিছু জানিতে পারি নাই। পর্ত্তুগীজ বণিকেরা ইঁহার সভায় আসিয়া তাঁহার সভায় ধনরত্ন দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ মোগল বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন নাই। সাঁতৈর রাজধানী রাজসাহী জেলায় অবস্থিত ছিল শুনা যায়। সাঁতৈরে পঞ্চ-মহাপাতকের চিহ্ন আছে।

৪। রাজা মুকুন্দ রায়:—ফতেআলি নামক একজন মুসলমান বন

জঙ্গল পরিষ্কারপূর্ব্বক নগর-পত্তন করিয়া ফতেয়াবাদ সরকার নাম রাখেন। এই সরকারে অধুনা যশোহর, খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর ও নোয়াখালি জেলার কতকাংশ ছিল। আইন ই আকবরীতে দেখা যায়, ইহা ৩১ মহলে বিভক্ত ছিল ও ইহার রাজস্ব ৭৯৮৯৫৩৭ দাম ছিল। ফতেয়াবাদ সরকারের প্রধান নগর ভূষণায় ছিল। মুকুন্দ রায়ের পূর্ব্ব পুরুষ কিরূপে এদেশে আসেন, আমরা জানিতে পারি নাই। ফতেয়াবাদের ফৌজদার মোরাদ খাঁর সহিত মুকুন্দের প্রণয় ছিল। ফৌজদার মোরাদের মৃত্যুর পর মুকুন্দ তাঁহার পুত্রদিগের অভিভাবক হইয়া ফতেয়াবাদ শাসন করিতেছিলেন। কতলু খাঁ ফতেয়াবাদ আক্রমণ করিলে মুকুন্দ তাঁহার সহিত তুমুল সংগ্রাম করেন, পরে মানসিংহ আসিয়াও মুকুন্দের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। মানসিংহ মুকুন্দের বীরত্ব দেখিয়া তাঁহাকে ফতেয়াবাদ সরকার শাসন করিতে দিয়া যান। দ্বিতীয়বার মানসিংহ বঙ্গে আসিয়া দেখিলেন, মুকুন্দ স্বাধীন হইয়াছেন। মানসিংহ তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত ও বন্দী করিলেন। মুকুন্দের ছয় পুত্র, তন্মধ্যে শত্রুজিৎ ও শিবরামের নাম পাওয়া গিয়াছে। শত্রুজিৎ স্বাধীন হইলে তিনিও ১৬৪৮ খৃঃ বন্দী হইয়া দিল্লীতে প্রেরিত ও প্রায় নিহত হন। শত্রুজিতের বংশধরগণ কিছুদিন ভূষণায় ঢালিসৈন্যের নায়ক ছিলেন। সীতারামের পতনের পর তাহারা শত্রুজিৎপুর স্থাপন করিয়া বাস করেন। মুকুন্দের সময়ে ভূষণার বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল। এই ভূষণায় বাস বলিয়া তথাকার বারেন্দ্রশ্রেণী ব্রাহ্মণ, তেলি, মালি ও কর্ম্মকারগণ-ভূষণাই পটী, নামে বিদিত হইয়াছে।[১৯]

৫। চাঁদরায় ও কেদার রায়ঃ—ইঁহারাও বঙ্গজ কায়স্থ ছিলেন।

ইঁহাদের সমাজও মান্যগণ্য সমাজ ছিল। খিজিরের ঈশা খাঁ চাঁদ রায়ের বন্ধু ছিলেন। তিনি চাঁদ রায়ের রাজধানী বিক্রমপুরের শ্রীপুরে আসিয়া চাঁদ-কন্যা বাল-বিধবা লাবণ্যময়ী স্বর্ণ বা সোণামণিকে দেখেন। সোণা-মণিকে ঈশা খাঁ অঙ্কলক্ষ্মী করিবার চেষ্টা করায় চাঁদ ও কেদার ঈশা খাঁর কলাগাছি দুর্গ, খিজিরের ভবন ও ত্রিবেণী দুর্গ আক্রমণ করেন। চাঁদ-ভৃত্য বিশ্বাসঘাতক শ্রীমন্ত কৌশলে স্বর্ণকে খাঁ সাহেবের অঙ্কশায়িনী করেন। এই অপমানে চাঁদ অনশনে প্রাণত্যাগ করেন। কেদার ভগ্নমনে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হন। এই যুদ্ধে হীনবল হইবার পর কেদারের সহিত মানসিংহের যুদ্ধ হয়। শ্রীমন্তের পরামর্শে কেদারকে উপাসনা কালে কালীমন্দিরে নিধন করা হয়। রঘুনন্দন প্রভৃতি অমাত্যবর্গ মানসিংহের সহিত সন্ধি করেন। কেদারের স্ত্রী কিছুদিন রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া পরলোক গমন করিলে কেদারের রাজ্য রঘুনন্দন, কোং-শরণ, কালিদাস প্রভৃতির মধ্যে ছয়ভাগ হইয়া যায়। চাঁদরায়ের পুত্র কেদারের অসংখ্য কীর্ত্তি কীর্ত্তিনাশা নদী গ্রাস করিয়াছে। কেদার প্রতাপাদিত্যের সমকক্ষ বীর ও কীর্ত্তিমান্ ছিলেন।

৬। ভুলুয়ার লক্ষ্মণ মাণিক্য:—ইনি ক্ষত্রিয় আদিশূরের আত্মীয় বিশ্বম্ভর শূরের বংশধর। বিশ্বম্ভর চন্দ্রনাথ যাইতে নৌকায় স্বপ্ন দেখিয়া ভূগর্ভে বারাহী দেবী প্রাপ্ত হন এবং ভ্রমক্রমে দেবীকে পশ্চিমাস্য করিয়া স্থাপন করায় তাঁহার পূর্ব্ববঙ্গের পরগণার নাম ভুলুয়া (ভুল হুয়া) রাখেন। কাহার মতে, নবাবকে অল্প কর দিয়া ভুলাইয়া বঙ্গভূমি ভোগ করায় এই পরগণার নাম ভুলুয়া হইয়াছে। রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য কাল ক্রমে কায়স্থসমাজে মিশ্রিত হন এবং বাকলার পরমানন্দ ঘোষের সহিত

স্বীয় তনয়ার বিবাহ দেন। তাঁহাতে সদাজচ্যুত হইয়া ভুলুয়ায় যাওয়ায় লক্ষ্মণ অন্য বিবাহ উপলক্ষে বিক্রমপুর, ভুলুয়া, চন্দ্রদ্বীপ ও যশোহর সমাজ স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া আনেন। লক্ষ্মণ মগ্ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া ঈশা খাঁর শরণাপন্ন হন। ঈশা খাঁ দিল্লী হইতে সাবাজ খাঁকে আনাইয়া বারভূঞার দল সঙ্গে লইয়া লক্ষ্মণকে রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে যাত্রা করেন। সাবাজ খাঁ সাহবাজপুর দুর্গ সংস্থাপন করেন। মগদিগের সহিত তুমুল যুদ্ধ হয়। মগেরা যুদ্ধে হারিয়া পলায়ন করিলে পর লক্ষ্মণ স্বরাজ্য প্রাপ্ত হন। কাহার মতে, লক্ষ্মণ চন্দ্রদ্বীপরাজ রামচন্দ্রের গৃহে নিহত হন ও কাহার মতে তিনি মগযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। লক্ষ্মণের বংশধরগণ কেহ লক্ষ্মণের ন্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিলেন না।

ঈশা খাঁ:—ইনি পাঠান জাতীয় মুসলমান। ইনি ভূঞাদলের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে স্বাধীন হইয়া বসেন। ১৬৮৭ খৃঃ মানসিংহ ইঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বন্দী করেন ও দিল্লীতে লইয়া যান। এই যুদ্ধকালে চাঁদকন্যা স্বর্ণ (যাঁহাকে লাভ করা উপলক্ষে চাঁদ ও কেদারের সহিত ঈশা খাঁর যুদ্ধ হয়) বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করেন। ঈশা খাঁ দিল্লীর গুণগ্রাহী আকবরের নিকট অপমানিত না হইয়া পুরস্কৃত হন। ঈশা খাঁ সোণার গাঁর শাসনকর্ত্তৃত্ব ভার পাইয়া খিজিরপুরে আসেন। তিনি পরে আর মোগল বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করেন নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সীতারামের বংশ-পরিচয় ও বাল্যজীবন

বর্ত্তমান সময়ের মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তঃপাতী কল্যাণগঞ্জ থানার গিধিনা নামে যে গ্রাম আছে, তাহায় সীতারামের পূর্ব্বপুরুষের নিবাস ছিল। সীতারাম জাতিতে উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ ; যে কায়স্থকুলে পাঠান শাসন সময়ে রাজা গণেশ জন্মগ্রহণ করিয় স্বীয় ভুজবলে এবং রণপাণ্ডিত্যে স্বাধীন হিন্দু-রাজ্য সংস্থাপিত করিয়াছিলেন ; যে গণেশের পুত্র নানাদেশ আক্রমণ ও লুণ্ঠনে রত রণকুশল নিষ্ঠুর তাইমুরকে সমরে পরাস্ত করিয়া যদু নাম স্থলে জেলাল নাম গ্রহণপূর্ব্বক কিছুদিন সুনিয়মে ও সুশৃঙ্খলায় বঙ্গের শাসনদণ্ড পরিচালন করেন, যে যদুরায়ের ধর্ম্মনিষ্ঠ ভগিনীপতির বংশ হইতে বর্ত্তমান দিনাজপুরের রাজবংশের সমুদ্ভব হইয়াছে, যে কায়স্থকুলে সনাতন ধর্ম্মনিষ্ঠ বদান্য দিনাজপুরের রায় সাহেব সমুৎপন্ন হইয়াছেন ও যাঁহার পূর্ব্বপুরুষ অশেষ দেশহিতকর কার্য্যে পরম যশস্বী ছিলেন ও যে কায়স্থকুলের বংশধরগণ যশোহরের নিকটবর্ত্তী চাঁচড়া গ্রামে বাসভবন সংস্থাপন করিয়া রাজা নাম গ্রহণপূর্ব্বক দীর্ঘকাল সুবিশাল জমিদারী শাসন ও প্রজাপালন করিয়া আসিতেছেন, সেই উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকুলে সীতারামের জন্ম। উচ্চ সম্প্রদায়ের কায়স্থগণের ঘটক মহাশয়দিগের গ্রন্থে জানা যায় যে, বঙ্গদেশে ভিন্ন ভিন্ন গোত্রজ সাড়ে

সাত ঘর উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ আছেন। তন্মধ্যে ঘোষ এক ঘর, সিংহ এক ঘর, মিত্র এক ঘর, দত্ত এক ঘর, মৌদ্গল্য দাস এক ঘর, কাশ্যপ দাস এক ঘর, শাণ্ডিল্য ঘোষ এক ঘর, কর ½ (জ) ঘর ও ভরদ্বাজ ¼ ঘর।

সীতারাম হইতে ঊর্দ্ধতন একাদশ পুরুষের নাম রামদাস দাস। এই দাস মহাশয় মাতার দানশালার শ্রীবৃদ্ধি করায় সম্রাটদত্ত রায় গজ-দানী উপাধি পাইয়াছিলেন। ঘটক গ্রন্থে পরিলক্ষিত হয়, সীতারামের বংশ কাশ্যপ গোত্রজ খাস-বিশ্বাস শাখার অন্তর্ভুক্ত। যশোহরের নিকটবর্ত্তী পুড়াপাড়ার দেবনাথ ঘটক মহাশয়ের নিকট হইতে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ ঘনশ্যাম ঘটকপ্রণীত সীতারামের খাস-বিশ্বাস বংশ সম্বন্ধে একটী কবিতা পাওয়া গিয়াছে, তাহা এই :—

হাল চসে তাল খায় গিধনাতে বাস।
তার বেটা কায়েত হলো বিশ্বাস খাস

এই কবিতা শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন সরকার মহাশয়ের লিখিত নব্যভারতে প্রকাশিত সীতারাম প্রবন্ধের প্রথম প্রবন্ধে এইরূপ ভাবে লিখিত হইয়াছে ;—

হাল চসে তাল খায় গিধনাতে বাস।
তাহার হইল নাম বিশ্বাস খাস ॥

এই কবিতা দৃষ্টে মধুবাবু সীতারামকে খশ জাতি হইতে উৎপন্ন হওয়া অনুমান করিতে ত্রুটি করেন নাই এবং একাধিক সীতারাম বিষয়ে প্রবন্ধলেখক সীতারামকে নীচ উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থবংশজ বলিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। আমরা বলি, উক্ত প্রবন্ধলেখকগণের অনুমান

ঠিক নহে। তাঁহারা একটু বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন, সীতারামের বংশমর্য্যাদা খুব উচ্চ না হইলেও নিতান্ত নীচ নহে। পুঁড়োপাড়ার ঘটক মহাশয়েরা উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থের ঘটক হইলেও যশোহরের চাঁচড়া রাজবংশের আশ্রিত। আমরা পরে দেখাইব, সীতারামের সমসাময়িক চাঁচড়ার রাজা মনোহর রায়ের সহিত সীতারামের অসদ্ভাব ও দ্বেষাদেষী ছিল। তাঁহার ঘটকে সীতারামের বংশ পরিচয় একটু মন্দ করিয়া বলিবে তাহা আশ্চর্য্য নহে। সে কালের মুর্শিদাবাদ আর যশোহর বড় কম দূর নহে। অধুনা রেলপথ ও রেলগাড়ীর সহায়তায় কলিকাতা ও যশোহর ৬ ঘণ্টার পথ হইলেও অদ্যাপি কলিকাতা অঞ্চলে যশোহর প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গের কৈ-ডিম্বের অদ্ভুত কাল্পনিক কিম্বদন্তী দূর হইল না। বাষ্পীয় শকট-বর্জ্জিত সেই প্রাচীন কালে মুর্শিদাবাদ হইতে নবাগত, নূতন স্বাধীন রাজ্য-স্থাপনে উদ্যত ও অন্য জমিদারগণের জমিদারী হস্তগতকরণে রত সীতারামের পূর্ব্বপুরুষ সম্বন্ধে "হাল চাসে তাল খায়" ইত্যাদি বর্ণনা করা অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থগণের আচার-আহ্নিক উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণের আচার আহ্নিক অপেক্ষা কোন অংশে নীচ নহে। নিম্নবঙ্গ অপেক্ষা মুর্শিদাবাদ অঞ্চল আদি সভ্য। এইরূপ-স্থলে সীতারামের পূর্ব্বপুরুষগণের আচার-ব্যবহার নিতান্ত নীচ হইতে পারে না।

সীতারামের পূর্ব্বপুরুষ রামদাস দানসাগর শ্রাদ্ধ ও হস্তিদান করিয়াছিলেন। তিনি পাঠান-শাসনের প্রথম সময়ে প্রাদুর্ভূত হন। তৎকালে এরূপ শ্রাদ্ধ করা বড় নিরাপদ্ ছিল না। তৎকালে ধনী

অপবাদ বড় ভয়াবহ ছিল। সেই সময়ে ভূগর্ভে ধন প্রোথিত রাখা বঙ্গের নিয়ম হইয়াছিল। যিনি মাতৃশ্রাদ্ধে গজদান করেন, তিনি নিতান্ত নিঃস্ব ছিলেন না। তাঁহার এই দানের কথা নবাব বা দস্যু-তস্করের কর্ণগোচর হইলেই ঘোর বিপদ; সকলেই বক্রদৃষ্টি তাঁহার প্রতি পড়িতে পারে। নবাব বা দস্যু-তস্করের হস্ত হইতে নিজ ধন, প্রাণ ও মানরক্ষা করিবার সামর্থ্য না থাকিলে রামদাস কখনই এরূপ একটা শ্রাদ্ধ করিতে পারিতেন না। দ্বিতীয়তঃ একজন নিতান্ত নিঃস্ব "হাল চসা তাল খাওয়া" লোকের পক্ষে হস্তিদানসহ দানসাগর শ্রাদ্ধ করাও সহজ কথা নহে। সীতারাম হইতে ঊর্দ্ধতন একাদশ পুরুষের অবস্থা যখন এইরূপ উচ্চ এবং যাঁহার নামই ঘটক মহাশয় প্রথমে এই কবিতায় দিয়াছেন, তখন সীতারামের "হাল চসা তাল খাওয়া" লোক বসাইবার আর স্থান কোথায়? এমতে বলি, উক্ত কবিতাটী দ্বারা ঘটক মহাশয় সীতারামের বংশে কলঙ্ক আরোপ করিয়া চাঁচড়া-রাজ-সরকারে মান, প্রতিপত্তি ও অর্থলাভ করিতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন মাত্র; উহার কোন অর্থ নাই।

বিশ্বাস-খাস উপাধি দৃষ্টেও উক্ত প্রবন্ধলেখকগণ সীতারামের বংশ নীচ অনুমান করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। মধুবাবু লিখিয়াছেন, বর্ণ-জ্ঞানহীন ইতরজাতীয় লোক প্রথমে শিক্ষালাভ করিলেই বিশ্বাস উপাধি পাইয়া থাকে। দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের অপর নাম কুমার। তিনি রণকুশল দেবসেনাপতি। সম্প্রতি অনেক ভূস্বামিগণের উপাধি কুমার। তাই বলিয়া কি বুঝিতে হইবে যে, সেই ভূম্যধিকারিগণ অতুলনীয় ভুজবলসম্পন্ন বীর? বিশ্বাস, সরকার, শীকদার, মজুমদার,

রায়, জোদ্দার, মজুমদার প্রভৃতি কার্য্যের উপাধি। এই সকল উপাধি প্রাচীনকাল হইতে [illegible]লাপের জন্য প্রদত্ত হইয়া আসিতেছে। মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, ঘোষ, বসু উপাধি কাহারও নূতন পাইবার অধিকার নাই। কিন্তু যে সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ কায়স্থের উপাধি বিশ্বাস সরকার প্রভৃতি আছে। রাজস্বসংক্রান্ত বিশ্বাসভাজন কর্ম্মচারীকে বিশ্বাস উপাধি দেওয়া হইত। সুতরাং [illegible] দেওয়ানের উপাধি বিশ্বাস হইলে তাহার পদোচ্চত্ব সম্বন্ধে লোকের সন্দেহ হয় নাই। কিন্তু রাজধর ভৌমিকের তহশীলদার ধর্ম্মদাস চঙ্গ মণ্ডলের উপাধি বিশ্বাস হইলেই তাহার নিকৃষ্ট লোকত্ব আসিয়া পড়ে। খাস শব্দ বর্ত্তমান সময়ের প্রাইভেট শব্দের একার্থবোধক। প্রাইভেট সেক্রেটারীর পারসিক নাম মুন্সী-খাস হইবে। নবাব-সরকারে কার্য্য করিয়া সীতারামের পূর্ব্বপুরুষগণ বিশ্বাস-খাস উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা খাস ভাণ্ডারের অর্থসংক্রান্ত কোন কর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত থাকিয়া উক্ত উপাধিলাভ করিলেও তাঁহাদের বংশের নীচত্ব প্রকাশ পাইতে পারে না। বিশ্বাস যখন একটী উপাধি, যাহা যত্নপূর্ব্বক লোকে গ্রহণ করে, তাহা কখনও নীচত্ব-জ্ঞাপক হইতে পারে না। রায়-সাহেব, রায় বাহাদুর ও মহারাজ উপাধির ছোটবড় হইতে পারে। একজন কুলীন চট্টোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ জমিদার রায়-বাহাদুর উপাধি পাইলেন একজন নীচ কায়স্থকুলোদ্ভব ভূম্যধিকারী মহারাজ উপাধি লাভ করিলেন; ইহাতে তাহাদের বংশমর্য্যাদার কি হ্রাস বৃদ্ধি হইল? উল্লিখিত কারণে আমরা বলিতেছি, বিশ্বাস-খাস উপাধিতেও সীতারামের বংশের নীচতা প্রকাশ পায় না।

সীতারামের বংশকে প্রচলিত ভাষায় কড়ের দাস বংশ বলে। আমি কোন সুযোগ্য লোকের অনুসন্ধান হইতে জানিয়াছি, মুর্শিদাবাদ জেলায় কড়ে নামে গ্রাম নাই, কোনা নামে গ্রাম আছে; এমতে অনুমিত হয় যে, কোনা শব্দই প্রচলিত ভাষায় "কড়ে" বলিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে।

১ম রামদাস গজদানীর তিনপুত্র [illegible], ধনঞ্জয় ও শিবরাম। ২ অনন্তের পুত্র ৩ ধরাধর, ধরাধরের পুত্র ৪ [illegible], [illegible]করের পুত্র ৫ নীলাম্বর, নীলাম্বরের পুত্র ৬ রত্নাকর, রত্নাকরের পুত্র ৭ ভিমকর, ভিমকরের পুত্র ৮ রামদাস (বিশ্বাস খাঁ), রামদাসের পুত্র ৯ হরিশ্চন্দ্র রায় (রায় রাঁয়া), হরিশ্চন্দ্রের পুত্র ১০ উদয়নারায়ণ, উদয়নারায়ণের দুইপুত্র ১১ সীতারাম ও লক্ষ্মীনারায়ণ রায়।

ধনঞ্জয় ও শিবরামের বংশের যে যে লোক [illegible] মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও মেদিনীপুর জেলায় আছেন, তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ষোড়শ পরিচ্ছেদে প্রদত্ত হইল।

সীতারামের প্রপিতামহ রামদাস [illegible] নবাব-সরকারের খাস সেরেস্তায় কোন রাজপদে বিচক্ষণতার সহিত কার্য্য করায় বিশ্বাস-খাস উপাধি লাভ করেন। তদীয় পুত্র হরিশ্চন্দ্র রাজমহলের কোন উচ্চপদে সমাসীন হইয়া রায়-রাঁয়া উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। এই রায়রাঁয়া উপাধি মুসলমান শাসনকালে উচ্চপদ ও সাতিশয় সম্মানের পরিচায়ক ছিল। সীতারামের পিতা উদয়নারায়ণ প্রথমে রাজমহলে পিতৃপদ পাইয়া উক্ত রায়রাঁয়া উপাধিতে ভূষিত হয়েন। তাঁহার কার্য্যকুশলতা দেখিয়া কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে ঢাকার নবাব ইব্রাহিম খাঁর

অধীনে প্রেরণ করেন। তিনি ঢাকা হইতে ভূষণার ফৌজদারের অধীনে রাজস্ব-সংক্রান্ত সাঁজোয়াল[১০] নিযুক্ত হইয়া ভূষণায় আইসেন এবং গোপালপুর ও সূর্য্যকুণ্ডে গৃহনির্ম্মাণ করেন ও তথায় সপরিবারে বাস করিতে থাকেন। সীতারামের অপর ভ্রাতার নাম লক্ষ্মীনারায়ণ। সীতারামবিষয়ক লেখকগণ কেহ কেহ লক্ষ্মীনারায়ণকে জ্যেষ্ঠ বলেন এবং সীতারামের বংশধরগণও সেই কথা সমর্থন করেন, কিন্তু গুরুকুলপঞ্জী ও কুলাচার্য্যের কুলপঞ্জিকা পাঠ করিয়া নিঃসন্দেহরূপে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, সীতারাম জ্যেষ্ঠ ও লক্ষ্মীনারায়ণ কনিষ্ঠ ছিলেন।

সীতারামের পিতা উদয়নারায়ণ বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী কাটোয়া মহকুমার অধীন রাজধানী বেনোয়ারিয়াবাদের নিকটবর্ত্তী মহীপতিপুর গ্রামে এক কুলীনকন্যা বিবাহ করেন। সীতারামের সময়ে স্ত্রীলোকের নাম প্রকাশ করা বড় নিয়ম ছিল না। এই কারণে সীতারামের মাতার নাম জানিবার উপায় নাই। কিংবদন্তীতে জানা যায়, সীতারামের মাতা মেলা, উৎসব প্রভৃতি ভাল বাসিতেন। অধুনা মহম্মদপুরে দয়ামরীতলা নামক একটী স্থান আছে; এইস্থলে এখনও প্রতি বৎসর বসন্তকালে সামান্যরূপ বারওয়ারী পূজা হয় ও সামান্য বাজার বসিয়া থাকে। সীতারামের সময়ে এই স্থানে বৃহৎ মেলা বসিত এবং ঘোর আড়ম্বরের সহিত বারওয়ারী পূজা হইত। এই দেবীর নাম সীতারাম মাতার নামানুসারে রাখিয়াছিলেন। সীতারামের মাতা তাঁহার পিতার উদ্যম ও উৎসাহের কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিতেন। কথিত আছে, সীতারামের জননী ভয়শূন্যা বীরললনা ছিলেন। যৎকালে উদয়নারায়ণ ভূষণা অঞ্চলে কার্য্য

করিতেন, তখন তিনি এদেশে স্ত্রীপুত্র আনিতে সাহস করেন নাই। কথিত আছে, সীতারামের মাতুলবংশ শাক্ত ছিলেন। একদা শ্যামা পূজার পর রাত্রিতে সীতারামের মাতামহগৃহে ডাকাইত পড়ে। পূজার জন্য পূর্ব্বরাত্রে জাগরণে সকলেই গাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন ছিলেন। সীতারামের ষোড়শবর্ষীয়া মাতা তাঁহার জননীর পার্শ্বে নিদ্রিতা ছিলেন। দস্যুগণ যখন সদর দরজা ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে, তখন সীতারামের জননীর নিদ্রা ভঙ্গ হয়। প্রথমতঃ গোলযোগের ও শব্দের কারণ কেহ বুঝিতে পারেন নাই। দস্যুগণ "জয় কালী মায়কী জয়" বলিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল এবং সীতারামের মাতামহীর গৃহাভিমুখে ধাবিত হইল, তখন সীতারামের মাতা শয়নখট্টার নিম্ন হইতে 'যে খড়্গ দ্বারা বলিদান করা হইত' তাহা গ্রহণপূর্ব্বক রণচণ্ডীবেশে দণ্ডায়মানা হইলেন। তিনি এমন ভয়ঙ্করভাবে আলুলায়িতকেশে বীরবেশে খড়্গসঞ্চালন করিতে লাগিলেন যে, উজ্জ্বল মশালের আলোকে দস্যুগণ তাঁহাকে ভবভয়নাশিনী অসুরঘাতিনী শম্ভুনিসূদনী বলিয়া শঙ্কা করিতে লাগিল। দস্যুগণ তাঁহার সম্মুখীন হইল বটে, কিন্তু গৃহে প্রবেশ করিতে পারিল না। অপরাপর লোকের চীৎকারে বহুলোক সমাগত হইল। ডাকাইত-গণ ভয়ে পলাইয়া গেল। যখন ষোড়শীর স্বজনগণ আসিয়া তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন, তখন তিনি খড়্গ ফেলিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন।

উদয়নারায়ণ প্রথমে ঢাকায় কার্য্য করেন। যে সকল সৈন্যগণ সংগ্রাম শাহকে দমন করিতে আসিয়াছিল, সীতারাম তাহার কোন দলের নেতা হইয়া আসিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করা যায় না।

পাঞ্জা সংগ্রাম শাহের প্রদত্ত যে সনন্দ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে অনুমান করা যায়, সংগ্রাম শাহ ১৬৯২ খৃষ্টাব্দের পর জীবিত ছিলেন না। উদয়নারায়ণ সম্ভবতঃ ১৬৫৫-৫৬ খৃষ্টাব্দে সংগ্রাম শাহের নিকট হইতে গৃহীত জমিদারীর ভূখণ্ডের বন্দোবস্তের সময়ে আইসেন। বোধ হয়, সংগ্রাম শাহের দমনের পূর্ব্বে ভূষণায় কোন ফৌজদারের আবাস ছিল না। সংগ্রাম শাহের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ভূষণায় ফতেয়াবাদের ফৌজদারের অবস্থিতি করিবার নিয়ম হয়। যাহা হউক, উদয়নারায়ণ ঢাকা, মুর্শিদাবাদ যেখানেই রাজপদে নিযুক্ত থাকুন না কেন, ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দের পর হইতে তিনি ভূষণার ফৌজদারের অধীনে রাজস্ব-সংক্রান্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। ভূষণার নিকটবর্ত্তী গোপালপুরে তিনি প্রথমে বাসবাটী নির্ম্মাণ করেন। তিনি ভূষণার নিকটে একটী তালুক ও বর্ত্তমান মহম্মদপুরের নিকটবর্ত্তী শ্যামনগর জোত বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন শ্যামনগর জোতের রাজস্ব আদায়ের জন্য তাঁহার যে কাছারী বাড়ী ছিল, তাহাই পরে তাঁহার সপরিবারে বাসের বাড়ী হইয়া উঠে।

দুই শত বৎসর পূর্ব্বে কালীগঙ্গা নদী কলকলনাদিনী স্রোতস্বিনী তটিনী ছিল ও তাহার তীরে ভূষণা, হরিহরনগর, মহম্মদপুর প্রভৃতি সমৃদ্ধনগর ও অনেক সুন্দর সুন্দর গ্রাম ছিল। সম্প্রতি যে যে স্থলে কালীগঙ্গানদীর চিহ্ন আছে, তথায় দূষিত জল হইতে এরূপ পূতিগন্ধ বহির্গত হইতেছে যে, তন্নিকটবর্ত্তী ভ্রমণশীল পান্থকে বস্ত্রাংশে নাসারন্ধ্র রোধ করত পথান্তর অবলম্বন করিতে হইতেছে।

সীতারামের উকীল মুনিরাম রায়ের প্রতিষ্ঠিত এক দেবালয়ে ১৬১৮ শকাব্দের লিখিত শ্লোক হইতে সীতারামবিষয়ক প্রস্তাব-লেখক

মধুবাবু অনুমান করেন যে, সীতারামের জন্ম ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী কোন সময়ে হইয়াছিল। আমরা সীতারামের বংশাবলী পর্য্যালোচনা করিয়া যাহা জানিয়াছি, তাহাতে অনুমান করি, সীতারাম ১৬৫৭ কি ৫৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সীতারামের এদেশে কোন গুরু বা অধ্যাপকের নাম পাওয়া যায় না। সীতারামের মাতামহালয় মহীপতিপুর গ্রামে সীতারামের জন্ম হয়। উদয়নারায়ণ দীর্ঘকাল ঢাকা ও ভূষণায় অবস্থিতি করায় এবং তাঁহার অন্য ভ্রাতা না থাকায় তদীয় পৈতৃকসম্পত্তি তাঁহার জ্ঞাতিগণ আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। সীতারামের বাল্যশিক্ষা দেশপ্রচলিত নিয়মানুসারে মাতামহালয়ে কোন গুরুর নিকট হইয়াছিল।

সীতারাম অধ্যাপক ও পণ্ডিতগণের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিতেন এবং পণ্ডিতগণের তর্কবিতর্ক উত্তমরূপে বুঝিতেন। তাহা হইতেই আমরা অনুমান করিতে পারি, তিনি কাটোয়া অঞ্চলে অল্পাধিক সংস্কৃতভাষায় জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। জয়দেব ও চণ্ডীদাসের কবিতা সকল সীতারামের কণ্ঠস্থ ছিল, আমরা তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি।[২১] সীতারামের মাতুলকুলের কোন আত্মীয় ঢাকার নবাব-সরকারে কার্য্য করিতেন। তৎকালে রাজধানী ঢাকানগরীতে আরবী ও পারসী শিক্ষার বিশেষ সুবিধা ছিল। সীতারাম সেই মাতামহকুলের কোন আত্মীয়ের নিকট থাকিয়া আরবী ও পারসী ভাষা শিক্ষার নিমিত্ত ঢাকায় আসিয়াছিলেন। কেন না তৎকালে তাঁহার পিতা ঢাকা ছাড়িয়া ভূষণায় অবস্থিত ছিলেন। মাতামহালয়ে অবস্থিতিকালে বীরকাহিনী শুনিতে শুনিতে সীতারামের শৌর্য্য-বীর্য্যের ও কার্য্যের প্রতি বিশেষ

শ্রদ্ধা জন্মিয়া ছিল। তিনি কালাপাহাড়, শের শাহ, দায়ুদ খাঁ, কতলু খাঁ প্রভৃতির সমরকুশলতার প্রচলিত দোঁহা সকল লোকমুখে ও শ্লোকে শুনিতে শুনিতে সামরিক কার্য্যই তৎকালে সর্ব্বপ্রধান কার্য্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন। মুসলমান আমলে জাতিভেদে অস্ত্রশিক্ষা হইত না। সীতারাম ঢাকায় আসিয়া আরবী ও পারসী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সৈনিকদলে যাইয়া অস্ত্রবিদ্যাও শিক্ষা করিতেন। কেহ কেহ বলেন, যে মহম্মদ আলী ফকিরের নামানুসারে মহম্মদপুর নগর হইয়াছে, সেই মহম্মদ আলী সীতারামের আরবী ও পারসীক ভাষার শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীপুত্রবিয়োগের পর তিনি ফকির হইয়া সীতারামের প্রতি স্নেহবশতঃ সীতারামের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন এবং তাঁহার প্রতি অপত্য-নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিয়া তাঁহার প্রধান মন্ত্রদাতার কার্য্য করিতেন।

সীতারামের আরবী ও পারসী ভাষাজ্ঞানের পরিচয় আমরা পাই নাই। বোধ হয়, সীতারাম জ্ঞানগর্ভ শিক্ষাপেক্ষা অস্ত্রশস্ত্র-শিক্ষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তদানীন্তন ঢাকার নবাব সায়েস্তা খাঁ সীতারামের অস্ত্রচালনাকৌশল সন্দর্শনে প্রীত হইয়াছিলেন। এই সময়ে ফতেয়াবাদ নামক স্থানে করিম খাঁ নামক একজন পাঠান বিদ্রোহী হইয়াছিল। কয়েকবার ফৌজদার সৈন্য তৎপ্রতিকূলে প্রেরিত হইয়া যুদ্ধে পরাভূত হয়, নবাব-প্রেরিত একদল সৈন্যও তৎপ্রতিকূলে যুদ্ধ করিয়া বিফলমনোরথ হইয়া ভগ্নমনে দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এই ব্যাপারে ঢাকার নবাব স্বয়ং সায়েস্তা খাঁরও ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল। সীতারাম বঙ্গেশ্বর নবাবের পরিচিত ছিলেন। তৎকালে গুণের আদর ছিল। তখন বর্ণভেদে বা জাতিভেদে গুণের আদর

অনাদর হইত না, শ্বেত কৃষ্ণে বা জেতা বিজেতায় বড় প্রভেদ ছিল না। সীতারামের এই বিদ্রোহদমন-প্রবৃত্তি ও আগ্রহাতিশয় সন্দর্শনে প্রীত হইয়া বঙ্গেশ্বর তাঁহাকে ৭ হাজার পদাতিক ঢালিসৈন্য ও তিন হাজার অশ্বারোহী সৈন্য দিয়া করিম খাঁর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন।

সীতারাম নবোদ্যমে ও নবোৎসাহে এই বিদ্রোহীর বিরুদ্ধে শুভদিনে শুভক্ষণে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তিনি অর্দ্ধেক ঢালিসৈন্য নৌকাপথে গোপনে ফতেয়াবাদে প্রেরণ করিলেন এবং অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া স্বয়ং স্থলপথে গমন করিয়া ফতেয়াবাদের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইলেন। রাজ্যভ্রষ্ট বীর্য্যবান্ পাঠান অতুলবিক্রমের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিল। যৎকালে করিম খাঁ সীতারামের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিল, তৎকালে নৌকাপথে আগত ঢালিসৈন্যগণ করিম খাঁর দুর্গ আক্রমণ করিয়া ধনাগার ও রসদসমূহ লুণ্ঠন করিল। করিম যুদ্ধে পরাভূত ও নিহত হইল। সীতারাম যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ফুল্লমনে ও সমারোহে ঢাকায় নবাবসকাশে উপস্থিত হইলেন।

তৎকালের নবাবগণ গুণের প্রকৃত পুরস্কার দিতে জানিতেন! সীতারামের বীরত্ব ও রণপাণ্ডিত্যে সায়েস্তা খাঁ পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ভূষণার অধীন নলদী পরগণা জায়গীর দিলেন। এই নলদী পরগণা পূর্ব্বে সংগ্রাম শাহের ছিল। সংগ্রাম শাহের নিকট হইতে এই পরগণা গ্রহণের পর ইহার সুশাসন ও সুবন্দোবস্ত হয় নাই। নিজ নলদী পরগণায় ও এদেশে তখন বারো ডাকাইতের খুব ভয় ছিল। নলদীতে তখন লোকসংখ্যা বড় বেশী ছিল না এবং রাজস্বও বড় বেশী আদায় হইত না।

সীতারাম এই পরগণা জায়গীর পাইয়া ঢাকা হইতে ভূষণায় আসিয়া

পিতার সহিত দেখা করিতে অভিলাষী হইলেন। এই সময়ে রামরূপ ঘোষ ও মুনিরাম ঢাকায় নবাব-সরকারে কাজকর্ম্মের উমেদার ছিলেন। নবাব-সরকারে সীতারামের যশঃ ও কীর্ত্তির কথা শ্রবণে তাঁহারা সীতারামের নিকটই যাতায়াত করিতেছিলেন। সীতারাম তাঁহাদিগকে নবাব-সরকারে কার্য্য না লইয়া তাঁহার সহিত ভূষণায় আসিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারাও সীতারামের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাঁহার সহিত নৌকাপথে ভূষণায় আসিবার জন্য যাত্রা করিলেন। এই সঙ্গে ফকির মহম্মদ আলিও যাত্রা করেন।

ঢাকা হইতে আসিবার সময় সীতারাম পথিমধ্যে রজনীযোগে কোন গ্রামের নিকট তরণী সকল তীরে সম্বদ্ধ করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছিলেন। রজনী অন্ধকার ছিল। রজনীর নিশীথ সময়ে গ্রামের লোকের ভীষণ কোলাহল ও আর্ত্তনাদ শ্রবণে সীতারামের নিদ্রাভঙ্গ হইল। নৌকার কর্ণধার নৌকার মাস্তুলের উপর উঠিয়া বলিল "গ্রামে ডাকাইত পড়িয়াছে; মশালের আলোক দেখা যাইতেছে।" পরদুঃখকাতর সীতারাম ও রামরূপ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। শিশু, বালক ও স্ত্রীলোকের রোদনধ্বনি তাঁহাদের হৃদয়ের স্তরে স্তরে প্রবেশ করিতে লাগিল। সীতারাম ও রামরূপ তাঁহাদের সহচর দ্বাদশটী সৈনিকের সহিত গ্রামাভিমুখে ছুটিতে উদ্যত হইলেন। ভীরু মুনিরাম তাঁহাদিগকে নিষেধ করিলেন। তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া সীতারামপ্রমুখ বীরগণ দস্যুতার স্থলে উপনীত হইলেন। তাঁহাদের অস্ত্রাঘাতে কোন কোন দস্যু পলায়ন করিল ও কেহ কেহ ভূতলশায়ী হইল

সীতারাম ও দস্যুপতি উভয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধ বাধিল। ডাকাইতদিগের পরিত্যক্ত মশালগুলি সীতারামের লোকেরাই ধরিয়া রহিল। উভয়ে অপূর্ব্ব যুদ্ধ চলিতে লাগিল। উভয়ের অতুলনীয় শিক্ষা—আশ্চর্য্য অসি-চালনা। সীতারামের মুখে "কালী মায়িকী জয়"; দস্যুদলপতির মুখে "আল্লা হো অকবর"। অত্যাচার হ্রাস হইল দেখিয়া আবালবৃদ্ধবনিতা যুদ্ধ দর্শনার্থ সমবেত হইল। কে মিত্র, কে শত্রু কেহই চিনিতে পারিল না। শাণিত অসিযুগলের পরস্পর আঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতেছিল। এই সীতারামের অসি, দস্যুদলপতির অসির উপর পড়িল, ঐ দস্যুপতি সবেগে লম্ফ দিয়া সীতারামের অসিতে আঘাত করিল—ঝন্ ঝন্ শব্দের সহিত বহ্নিকণা নির্গত হইল।

কিয়ৎকাল যুদ্ধের পর সীতারাম বলিলেন—আর কতক্ষণ? দস্যু-পতি উত্তর করিল—দেহে যতক্ষণ এক বিন্দু রক্ত আছে।

সীতারাম। ফল কি?

দস্যুপতি। জয়—নয় মৃত্যু।

সীতা। তুচ্ছ কারণে দুষ্কর্ম্ম করিতে আসিয়া জীবন বিসর্জ্জন কেন?

দস্যুপতি। দুষ্কর্ম্ম হউক আর সুকর্ম্ম হউক, এই বৃত্তি।

সীতা। উচ্চ বৃত্তি কি আর নাই?

দস্যুপতি। ছিল, স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছে।

সীতা। স্বাধীনতার চেষ্টা কি আর সম্ভবে না?

দস্যুপতি। বর্ত্তমানে অসম্ভবই মনে করি।

সীতা। যদি তুমি আমি মিলি, যদি হিন্দু পাঠানে মিশে, তবে?

দস্যুপতি। তবে সকলই সম্ভব।

সীতা। এই অসি ফেলিলাম, এস চেষ্টা করি।

দস্যুপতি। দোস্ত! অসি লও, আমি তোমার।

যুদ্ধ থামিল। সীতারাম অসি ফেলিলেন। বক্তার সীতারামের হস্তে অসি দান করিলেন। দস্যুপতির নাম বক্তার, ইনি পাঠান জাতীয় মুসলমান। সীতারাম বক্তারকে আলিঙ্গন করিলেন। সমবেত দর্শকেরা উভয়ের পরিচয় চাহিলেন। সীতারাম সংক্ষেপে উত্তর করিলেন, "আমরা তোমাদের মিত্র, দস্যু মারিতে ও তাড়াইতে আসিয়াছি।" বক্তার এই কথায় হাসিলেন। বক্তার সীতারামের সহিত তাঁহার নৌকায় গমন করিলেন। উভয়ে অনেক কথা হইল। বক্তার প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক দস্যুতা ছাড়িয়া সদলে সীতারামের অধীনে কার্য্য করিতে অঙ্গীকার করিলেন। কয়েক দিনের মত বক্তার মৃত দস্যুদিগের সৎকার ও আহতদিগের শুশ্রূষার জন্য বিদায় লইয়া গেলেন। কথা থাকিল, ভূষণায় বক্তার সীতারামের সহিত মিলিত হইবেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

—*—

সীতারামের কর্ম্মক্ষেত্র ও হরিহর নগরের বাটী

বহুদিন পরে বিজয়ী সীতারাম তৎকালের সরকার (পরে চাক্‌লা) ভূষণার নিকটবর্ত্তী গোপালপুর গ্রামে জনকজননীর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহারই ৫.৭ বৎসর পূর্ব্বে উদয়নারায়ণ সপরিবারে গোপালপুরের বাটীতে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। উদয়নারায়ণ পুত্রের বিজয়সংবাদে পরম প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। তার পর আবার যখন শুনিলেন, সীতারাম নলদী পরগণা জায়গীর পাইয়া রায়-রাঁয়া উপাধিতে ভূষিত হইয়া গৃহাগমন করিতেছেন, তখন উদয়নারায়ণ ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর আহ্লাদের পরিসীমা থাকিল না। সীতারামের গৃহ-প্রবেশকালে ললনাকুল উলুধ্বনি এবং বালকবালিকাগণ লাজা ও পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন। সীতারাম গৃহে আসিবার অব্যবহিত পরেই নজর ও উপায়ন সহকারে ভূষণার ফৌজদার আবু তোরাপের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সীতারামের বিনয়-নম্র ব্যবহারে ও সৌজন্যে আবু তোরাপ পরম প্রীতিলাভ করিলেন। তিনি সীতারামের নব জায়গীর দখল, শাসন, পালন ও তাহার আয়-বৃদ্ধি সম্বন্ধে অনেক পরামর্শ দিলেন।

গোপালপুরের বাড়ী মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়ী ছিল। ভূষণার নিকটবর্ত্তী গোপালপুর ও মহম্মদপুরের অন্তর্গত গোপালপুর এক নহে। কলকলনাদিনী কালীগঙ্গা নদীতীরে বিস্তীর্ণ শস্যপ্রান্তর মধ্যে

হরিহরনগর নাম দিয়া সীতারাম নূতন নগর সংস্থাপন করিতে অভিলাষী হইলেন। অনতিবিলম্বে সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণী খনন করা হইল, সুন্দর সুন্দর সুধাধবলিত সৌধমালায় নবভবন শোভমান হইয়া উঠিল। দেবালয় সকল নির্ম্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। শ্রীধরনারায়ণ শিলাও ইহার এক দেবালয়ে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। নানা দিগ্‌দেশ হইতে দলে দলে লোক আসিয়া হরিহর নগরের অঙ্গপুষ্ট করিতে লাগিল—ধনসম্পত্তি বৃদ্ধি করিতে লাগিল।

সীতারাম মহম্মদপুরের অন্তর্গত সূর্য্যকুণ্ডের কাছারি-বাড়ী নল্‌দী পরগণার প্রধান কাছারী-বাড়ী করিলেন। এই সময়ে নল্‌দী পরগণার জনসংখ্যা বড় অধিক ছিল না এবং উচ্চশ্রেণী হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যাও অতি অল্প ছিল। তৎকালে নিম্ন বঙ্গাঞ্চল বহুসংখ্যক লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও অপরিজ্ঞাত ডাকাইতে পরিপূর্ণ ছিল, তন্মধ্যে রঘো, শ্যামা, রামা, ভন্তো, বিশে, হরে, নিমে, কালা, দিনে, ভলো, জগা ও যেদো এই বার জন দস্যু বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। দস্যুভয়ে তখন এ অঞ্চলে লোকে বাস করিতে সাহস করিত না এবং যাহারা বাস করিত, তাহারাও রজনী যোগে নিদ্রা যাইতে পারিত না। ইহারা পত্র দিয়া ডাকাইতি করিত। ইহারা লিখিয়া পাঠাইত—অমুক মাসে, অমুক তারিখে, অমুক বারে, এতক্ষণ রাত্রের সময় আমরা তোমার সহিত দেখা করিতে যাইব। তুমি আমাদিগের সহিত দেখা করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবে। এই দস্যুদল গৃহস্থের প্রতি অমানুষিক পশ্বাচার করিয়া,—গৃহস্থকে মারিয়া, তাহাদের স্ত্রী-কন্যার ধর্ম্মনাশ করিবার উদ্যোগী হইয়া ও তাহাদের পরিবারস্থ বালকগণের শিরচ্ছেদ-

পূর্ব্বক তাহাদিগের গুপ্ত অর্থ অপহরণ করিত। সীতারাম বক্তার খাঁকে পাইবার রজনীতেই দস্যুগণের অমানুষিক অত্যাচার সন্দর্শন করিয়াছিলেন। হৃদয়বান্ বীরপুরুষের করুণাপূর্ণ হৃদয় তাহাতে সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত হইয়াছিল। এতদ্দেশের দস্যুভয়নিবারণ করিতে তিনি দৃঢ়সংকল্প হইলেন। রামরূপ ঘোষ, বক্তার খাঁ ও নমঃশূদ্রজাতীয় রূপচাঁদ মণ্ডল ঢালী তাঁহার এই কার্য্যের সহায় হইল। বক্তার পূর্ব্বে ডাকাইত ছিল। সে ডাকাইতগণের অনেক সাঙ্কেতিক শব্দ, আচারব্যবহার ও আড্ডা প্রভৃতি পরিজ্ঞাত ছিল। সীতারাম যখন দস্যু-নিবারণে দিন-যামিনী অতিবাহিত করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার অনুজ লক্ষ্মীনারায়ণ গোবিন্দ রায় দেওয়ানের সহিত নলদী-পরগণার রাজস্ব আদায় ও প্রজা-পত্তনাদি কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। উদয়নারায়ণ এ সময়েও ভূষণার ফৌজদারের অধীনে সাজোয়ালের কার্য্য পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি সর্ব্বদা ফৌজদার-প্রভুর মনস্তুষ্টি করিয়া চলিতেন এবং যাহাতে পুত্রগণের প্রতি ফৌজদার রুষ্ট না হন ও তাঁহারা ফৌজদারের নিকট সর্ব্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হন, তাহার চেষ্টা করিতেছিলেন।

সীতারাম যৎকালে দস্যুদলনে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তিনি একদিন, একরাত্রি বা একবেলা পরিশ্রম করিয়া এই দেশীয় অরাতি নিদূরিত করিতে পারেন নাই। তাঁহাকে দীর্ঘকাল ধরিয়া এই নৈশ বিপদসঙ্কুল সমরে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে। বনে, জঙ্গলে, শ্বাপদমুখে তাঁহাকে অনেক সময়ে অনাহারে অনিদ্রায় দিনযামিনী অতিবাহিত করিতে হইয়াছে। সেই স্বার্থপরতার দিনে, সেই অনুদারতার দিনে, সেই

বাঙ্গালীর তরপনের কলঙ্কপঙ্কে নিপতিত হইবার দিনে এরূপ শম, ক্লেশ ও বিপদসঙ্কুল কার্য্যে ব্রতী হওয়া যে সে হৃদয় ও যেমন তেমন মনের কার্য্য নহে। এই দেশ-হিতকর কার্য্যে সীতারামের উচ্চমনা জনক জননী বাধা দেন নাই। বস্তুতঃ তাঁহারা এ কার্য্যে সীতারামকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। যাঁহারা অনুমান করেন, বঙ্গের দ্বাদশ ঘর ভূঁঞা জমিদার হইতেই দ্বাদশজন দস্যুর উৎপত্তি, তাঁহাদের অনুমান সম্পূর্ণ ভ্রমসঙ্কুল। (ঝ)

এই দস্যুদলন সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। সীতারাম শ্যামাদস্যুকে ধরিতে সুন্দরবনে ছয়মাস অতিবাহিত করিয়াছিলেন। শ্যামা সুন্দরবনে থাকিয়া দস্যুতা করিত। সুদীর্ঘ সুন্দর-তরুবেষ্টিত জঙ্গললতা সমাকীর্ণ সুন্দরবনের মধ্যে তাহার গড়বেষ্টিত বাড়ী ও বড় বড় ছিপ্ নৌকা লুক্কাইত ছিল। জোয়ারের সময় শ্যামা সদলবলে খুলনা অঞ্চলে আসিয়া দস্যুতা করিয়া আবার ভাটার সময় ফিরিয়া যাইত। সীতারাম ছয়মাস পরে তাহাকে তাহার নিজ ভবনে কালীপূজার সময় ধরিয়াছিলেন।

বক্তার খাঁ সর্ব্বদেশে রঘোর অনুচর ডাকাত হইয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে পরিভ্রমণ করত তাহার সকল গোপনীয় বাসস্থান ও চলাচলের নিয়ম-ধরণ পরিজ্ঞাত হইয়া তাহাকে ধরাইয়া দেন। কালা ডাকাইতকে সীতারাম দস্যুতা-কালে ধরিয়াছিলেন। এই দস্যুগণের সকলেই যে অতি নীচপ্রকৃতির, নীচাশয় এবং কেবল পরস্বাপহরণে রত লোক ছিল এমত নহে। হ'রে বর্ত্তমান ঝিনাইদহ মহকুমার চুয়াডাঙ্গার মধ্যে যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাঠ আছে, তাহার নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে থাকিয়া

দস্যুতা করিত। একদা এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ দূরদেশ হইতে ভিক্ষা করিয়া কিছু অর্থসংগ্রহ করিয়া দেশে ফিরিতেছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যার বিবাহ দেওয়া তাহার সমূহ দায় হইয়াছিল। পথিমধ্যে অপরাহ্ণ সময়ে ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে ব্রাহ্মণ ঘোর বিপদাপন্ন হইয়া আর্দ্রবসনে কম্পান্বিত কলেবরে এক কর্ম্মকার-দোকানে আশ্রয় লয়েন। কর্ম্মকার ভক্তিসহকারে তাঁহাকে যথেষ্ট যত্ন ও আদর করিয়া আশ্রয় দান করেন। ব্রাহ্মণ কথাপ্রসঙ্গে প্রকাশ করেন যে, ঝড়, বৃষ্টি ও শিল-পতন অপেক্ষা হ'রের ভয় তাঁহার প্রবলতর ছিল। ব্রাহ্মণ সংগৃহীত টাকাগুলি সেই কর্ম্মকারের নিকটেই রাখিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণের আহার ও শয়নের বেশ সুবন্দোবস্ত করা হইল। পরদিন প্রত্যূষে ব্রাহ্মণ রওয়ানা হইবার সময়, কর্ম্মকার ব্রাহ্মণকে তাঁহার টাকা বুঝাইয়া দিয়া প্রণামপূর্ব্বক বলিল,"প্রভো! আমিই হ'রে ডাকাত। আমি ডাকাতি করিতাম, কিন্তু আপনার ন্যায় গরীব ব্রাহ্মণের অর্থগ্রহণ করি না। আপনি কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিয়া আমাকে পত্র লিখিবেন ও একটি ফর্দ্দ পাঠাইয়া দিবেন, আমি আপনার কন্যার বিবাহের সকল ব্যয় দিব।" বলা বাহুল্য হ'রে তাহার অনুচর সহ ব্রাহ্মণের বাটীতে যাইয়া বিবাহের সর্ব্বপ্রকার দ্রব্য ও অর্থ দিয়া ব্রাহ্মণকন্যার বিবাহ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দিয়াছিল।

ইংলণ্ডের দুষ্টদমন, শিষ্টপালন, বিপন্নের উপকার প্রভৃতি দেশহিতকর ব্রতে ব্রতী "নাইট" উপাধিধারী মহাত্মগণের ন্যায় সীতারাম দীর্ঘকাল অকাতরে পরিশ্রম করিয়া দস্যুদলকে দস্যুতা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। দস্যুদিগের কাহাকেও ধরিয়া নবাব-সকাশে প্রেরণ করিলেন,

কাহাকেও না প্রতিজ্ঞা করাইয়া দলভঙ্গ করিয়া ছাড়িয়া দিলেন, আবার কাহারও ভাল অস্ত্রশিক্ষা, উচ্চমন ও উচ্চচরিত্র দেখিয়া তাহাকে নিজের সহচর করিয়া লইলেন।

সীতারামের এই মহাব্রতের অৰ্দ্ধেক কার্য্য সম্পাদন হইবার পূর্ব্বে, অগ্রে তাঁহার পিতা উদয়নারায়ণ ও ছয়মাস পরে তাঁহার মাতৃদেবী দয়াময়ী পরলোক গমন করেন। সীতারাম পিতামাতার আদ্যশ্রাদ্ধ কালে বিশেষ কোন সমারোহ করিতে পারেন নাই। তাঁহার পিতার মৃত্যুর একবৎসর পরে নবাব-ফৌজদার, দেশের জমিদারগণ, প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ-সমাজ, কায়স্থ-সমাজ প্রভৃতির অনুমতি লইয়া মহা আড়ম্বরে হয় হস্তী প্রভৃতি দান করিয়া দানসাগর-শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন[১২]। এই শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে হরিহরনগরের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ-সমাজ সীতারামকে একটি সুবৃহৎ জলাশয় খনন করিয়া দিতে অনুরোধ করায় তিনি একটি সুবৃহৎ পুষ্করিণী খনন করাইয়া দিতে কৃতসঙ্কল্প হন। পুষ্করিণী করিতে বহু অর্থব্যয় হয়। ইহার চারিধার প্রথমে বালুকার জন্য ভাঙ্গিয়া চুরিয়া অসমান হইয়া পড়ে এবং সাত আট হাত কাটা হইবার পর তলদেশে এরূপ কর্দ্দম উত্থিত হয়, যে তাহা উঠাইতেও অনেক টাকা ব্যয় পড়ে। এই কারণে ইহাকে "ধনভাঙ্গার দোহা" বলে। এই দোহা সম্বন্ধে অন্য কিম্বদন্তী আছে, তাহা "সীতারামের কীর্ত্তি" শীর্ষক পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইবে। ভূষণা-অঞ্চলের ব্রাহ্মণগণ শ্রাদ্ধের দিনে কায়স্থাদি জাতির বাড়ীতে ভোজন করিতেন না। সীতারামের পিতৃমাতৃ-শ্রাদ্ধ উপলক্ষে যে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের মহতী সভা হয়, তাহাতে স্থিরীকৃত হয় যে শ্রাদ্ধের দিনে অশৌচ থাকে না। শ্রাদ্ধের দিনে আহার করাও

য তাহার পাঁচদিন পরে আহার করাও সেই; কারণ শ্রাদ্ধের দিন অশৌচ থাকে না। শ্রাদ্ধের মন্ত্রে আছে, "অশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েহহ্নি" অর্থাৎ অশৌচান্তের পর দ্বিতীয় দিন। শ্রাদ্ধের দিন আহারের প্রথা সীতারাম প্রথম প্রচলন করেন।

ডাকাইত-দমনরূপ মহাব্রত উদযাপন হইবার পর, সীতারামের যশশ্চন্দ্রমার বিমল কিরণে সমগ্র বঙ্গদেশ সুশীতল হইবার পর, প্রতি-গৃহের নরনারী ও বালকবালিকার মুখে আন্তরিক আশীর্বাদের সহিত সীতারামের সুকীর্তি গাথা উচ্চারিত হইবার পর, যখন সীতারাম পারিষদ-বর্গ ও কর্মচারিবৃন্দে পরিশোভিত হইয়া নলদী পরগণার সাঁতের তালুকের প্রকৃতিপুঞ্জের সংখ্যা ও সুখশান্তিবৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবন করিতেছিলেন, তখন একদিন মহাদেব চূড়ামণি বাচস্পতি নামক এক ব্রাহ্মণ কন্যাদায়ের জন্য সীতারামের নিকট কিঞ্চিৎ অর্থ পাইবার লালসায় সীতারামকে নিশানাথ ঠাকুর ও তাঁহার সহচরগণকে নিশানাথের ভ্রাতৃগণস্বরূপ কল্পনা করিয়া কতিপয় শ্লোক রচনা করিয়া আনিয়াছিলেন।

নিশানাথ একজন গ্রাম্য দেবতা, বৃহৎ বৃক্ষাদিতেই তাঁহার অধিষ্ঠান। তদ্দেশে নহাটা, গঙ্গারামপুর, নড়াল, রায়গ্রাম প্রভৃতি অনেক স্থানে নিশানাথের আশ্রয়স্থল বৃক্ষমূল আছে এবং তাহার প্রত্যেক বৃক্ষমূলে প্রতি শনি-মঙ্গলবারে মহাসমারোহে তত্তদ্স্থানে তাঁহার পূজার্চ্চনা হয়। নিশানাথের আরও এগারজন ভ্রাতা আছেন। তাঁহাদিগের নাম মোচড়া সিংহ, বাবুর ডালন, হরিপাগল, কৃষ্ণকুমার, কালকুমার প্রভৃতি। নিশানাথ ঠাকুর ও তদীয় ভ্রাতৃগণ প্রত্যেক গ্রামের সুখশান্তিরক্ষক। তাঁহারা ব্যাধি হইতে মুক্তিদাতা, বন্ধ্যার সন্তানদাতা ও সর্ব্ববিধ সকামফলপ্রার্থীর

ফলদাতা। তাঁহারা নিশীথ সময়ে বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে ও প্রতি গৃহস্থ ভবনে পরিভ্রমণ করেন। নিশানাথের ভগিনীর নাম রণরঙ্গিণী।

এই নিশানাথের সহিত সীতারামের তুলনা করিবার তাৎপর্য্য এ যে, সীতারাম তাঁহার সহচরগণকে "ভাই" বলিতেন। নিশানা যেমন রাত্রিকালে নগরে নগরে পরিভ্রমণ করিয়া গৃহস্থের অমঙ্গল দূ করেন, তিনিও তদ্রূপ তাঁহার ভ্রাতৃগণসহ রাত্রে দস্যুতা নিবার করিয়া পরিভ্রমণ করিতেন। তিনিই তাঁহার নিকটবর্ত্তী দেশে অধিবাসিগণের একমাত্র শান্তিদাতা ও সুখসমৃদ্ধির বিধাতা। সেই কবিত হইতে সীতারাম ও তাঁহার সভাসদগণ তাঁহার সহচরদিগকে রহস্য করি মোচড়াসিং, গাবুর ডালন ইত্যাদি বলিতেন। এই কবিতা হইলেই জা যায়, সীতারামের একাদশ জন ছোট বড় সেনানায়ক ও একটী ভগি ছিল। সীতারামের জীবনচরিত বিষয়ক প্রস্তাব-লেখকগণ স্ব স্ব প্রস্তা উল্লেখ করিয়াছেন—মোচড় সিং, গাবুর ডালন প্রভৃতি সীতারামে সৈন্যধ্যক্ষগণের নাম ছিল। প্রকৃতপক্ষে এবংবিধ নাম তাঁহার কো সৈন্যাধ্যক্ষেরই ছিল না।

সীতারাম দস্যুতানিবারণ করিলে তৎসম্বন্ধে যে কবিতাটি রচি হয় তাহা এই—

"ধন্য রাজা সীতারাম বাঙ্গালা বাহাদুর।
যার বলেতে চুরি ডাকাতি হয়ে গেলো দূর॥
এখন বাঘ মানুষে একই ঘাটে সুখে জল খাবে।
এখন রামী শ্যামী পোঁটলা বেধে গঙ্গাস্নানে যাবে॥"

সীতারাম দেশের দস্যুতানিবারণ করিতে যাইয়া দেখিলে

কোইতগণই দেশের একমাত্র শত্রু নহে। তিনি দেখিলেন, আরাকানের মগ, আসামের আসামী, চট্টগ্রামে অবস্থিত পর্ত্তুগীজ, জমিদাররূপী রাক্ষস, ফৌজদাররূপী সয়তান ও সর্ব্বোপরি নবাবরূপী ভীষণ অসুরের যন্ত্রণায় দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা ঘোর ক্রন্দনের রোল উঠাইতেছে। ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম আর থাকে না; ধনীর ধন তাহার পাপস্বরূপ হইয়াছে; উচ্চান্তঃকরণ সদাশয় লোকের সদাশয়তা তাহাদিগের পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র হইয়াছে। কোথাও পর্ত্তুগীজ আসিয়া গ্রাম লুণ্ঠন করিয়া গ্রামের অধিবাসীদিগকে বলে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেছে। কোথাও আসামী আসিয়া গ্রামের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতেছে। কোথাও মগগণ গ্রামে প্রবেশ করিয়া গ্রাম লুণ্ঠন-পূর্ব্বক স্বামীর সাক্ষাতে তাহার যুবতী স্ত্রীর ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতেছে; মাতার কোল হইতে সন্তান কাড়িয়া লইতেছে এবং বৃদ্ধ পিতামাতা ও যুবতী স্ত্রীর সম্মুখে যুবকের শিরে অস্ত্রাঘাত করিতেছে। জমিদার ছলে বলে কৌশলে ভিক্ষা, পার্ব্বণী, হিসাবআনা, তলবানা প্রভৃতি অসংখ্য অন্যায় আবওয়াব প্রজার নিকট হইতে আদায় করিয়া বিলাসের তরঙ্গে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া প্রজার সুখস্বচ্ছন্দের প্রতি বৈরাগ্য-প্রদর্শন-পূর্ব্বক কেবলমাত্র নবাবের অনুজ্ঞাই প্রতিপালনে যত্নবান্ আছেন। ফৌজদারগণের শাসনের শক্তি নাই, পালনের গুণ নাই, প্রজারঞ্জনে ইচ্ছা নাই, হৃদয়ে দয়ামায়া প্রভৃতি সৎপ্রবৃত্তির লেশমাত্র নাই। আছে কেবল—অর্থলালসা আর বিলাসিতা, সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতার ব্যভিচার ও অমানুষিক অত্যাচার। সে সময়ে দেশের সাধারণ লোকের অবস্থা দেখিয়া মানুষ কেন, বোধ হয় তরুলতাও কাঁদিতেছিল।

"চাচা আপনি বাচা" ইহাই তৎকালে সকলের জীবনের উদ্দেশ্য হইয়াছিল।

একের দুঃখে অপরের চাহিবার ও উদ্ধার করিবার সাধ্য ও ইচ্ছা নাই। সকলেরই দুঃখ, দুঃখের পর দুঃখ, মারিলেও দণ্ড দিবার কেহ নাই। মার খাইলেও কাহারও নিকট যাইয়া কাঁদিবার স্থান নাই। ফৌজদার দেশের শাসন ও পালনকর্ত্তা বটে, কিন্তু তাহার সৈন্য আর শাসনের উপযুক্ত নহে। তিনি ব্যবসায়ে ধনবৃদ্ধি করিতে ও নানাবিধ অসদুপায়ে উৎকোচগ্রহণে তাঁহার অর্থলালসা চরিতার্থ করিতে ব্যতিব্যস্ত।

সীতারাম দেশের অবস্থা দেখিয়া নিরন্তর রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সদয় হৃদয় দস্যুগণের উৎপীড়নে দ্রবীভূত হইয়াছিল, এখন দেশের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় আরও অধিকতর দ্রবীভূত হইল। তিনি পারিষদগণের সহিত উপায় উদ্ভাবনের চিন্তা করিতে লাগিলেন। রামরূপ লক্ষ্মণ-ভ্রাতার ন্যায় সীতারামের অনুস্থাবহ হইয়া আজীবন দেশের কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। বক্তারও সীতারামকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। রূপচাঁদ ঢালী, ফকির মাছকাটা প্রভৃতি সীতারামের অন্য অনুচরগণও দেশের কল্যাণার্থে জীবন উৎসর্গ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। যখন সীতারামের স্বদেশহিতৈষিতা ব্রত উদ্যাপনের সঙ্গী মিলিল, তখন কথা হইল কিরূপে, কি প্রণালীতে এই মহাব্রত উদযাপিত হইবে। নবাবের হিতকর কার্য্য করিয়া সীতারাম জায়গীর পাইয়াছেন। দেশের দস্যুভয় দূর করিয়া তিনি নবাবের প্রীতিভাজন হইয়াছেন বটে, কিন্তু

এই সঙ্গে দস্যুগণের নিকট উৎকোচগ্রাহী ফৌজদারগণের চক্ষুঃশূল হইয়াছেন। ফৌজদারগণ কখন কি কথা নবাবের কর্ণগোচর করিয়া সীতারামের সর্ব্বনাশ করে, তাহাও সীতারামের ভয়ের কারণ হইয়াছে। নলদী পরগণা ও সাঁতৈর তালুকের শ্রীবৃদ্ধি ও ফৌজদারগণের অসহনীয় হইয়াছে। অন্যদিকে অপরাপর পরগণার অনেকানেক ভদ্রলোক সীতারামের জমিদারী মধ্যে বাস করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ করিতেছেন। সীতারাম ভাবিলেন, সম্রাট্ ও নবাব প্রভৃতিকে বাধ্য করিতে না পারিলে আর এক পদও অগ্রসর হওয়া উচিত নহে। অনন্তর ফকির মহম্মদআলি, সীতারামের বংশের গুরু রত্নেশ্বর বাচস্পতি, মুনিরাম, বক্তার, ফকির, রূপচাঁদ ও লক্ষ্মীনারায়ণ প্রভৃতির সহিত সীতারাম গোপনে পরামর্শ করিলেন। পরামর্শে স্থির হইল, ফকির মহম্মদ আলি, গুরুদেব, বক্তার, ফকির, রূপচাঁদ ও লক্ষ্মীনারায়ণ হরিহর নগরে আসিয়া জমিদারীর কার্য্য করিবেন এবং সীতারাম, রামরূপ ও মুনিরাম গয়া ও প্রয়াগধামে পিতৃলোকের পিণ্ডদান-ব্যপদেশে সন্ন্যাসিবেশে হিন্দুর সকল তীর্থস্থান পর্য্যটনপূর্ব্বক দিল্লীতে বাদশাহের নিকট গমন করিবেন। এই পরামর্শ স্থির হইবার অনতিবিলম্বেই সীতারাম ভূষণার ফৌজদারের সহিত দেখা করিয়া জানাইলেন ;—

জীবন মরণ গালি নহে !

ধর্ম্মানুষ্ঠানের নির্দ্দিষ্ট কাল নাই।

স্বধর্ম্মনিষ্ঠ সীতারামের পিতামাতার মৃত্যু হইয়াছে, গয়া ও প্রয়াগ-ধামে তাঁহাদিগের ও পিতৃপুরুষের পিণ্ডদান করা আবশ্যক। তিনি সত্বর তীর্থযাত্রা করিবেন। ফৌজদার সাহেব, মেহেরবাণী করিয়া

তাঁহার জায়গীর ও ভ্রাতার প্রতি একটু নেক-নজর অর্থাৎ সদয় হইয়া করুণদৃষ্টি করুন। ভূষণার ফৌজদার আবু তোরাপেরও ইচ্ছা—সীতারামের ন্যায় লোক যত দূরে থাকে, ততই ভাল। তিনি সাগ্রহে ও সোৎসাহে সীতারামকে তীর্থযাত্রা করিতে অনুমতি করিলেন।

সীতারাম সন্ন্যাসিবেশে সহচরদ্বয়ের সহিত বৈদ্যনাথ, গয়া, কাশী, প্রয়াগ, অযোধ্যা, বৃন্দাবন, মথুরা প্রভৃতি তীর্থস্থান পর্যাটন করিয়া তৎকালের রাজধানী দিল্লী মহানগরীতে বাদশাহ অরঙ্গজেবের দরবারে উপস্থিত হইলেন। সীতারামের সুকীর্ত্তি-কাহিনী নবাবের পত্রে পূর্ব্বেই সম্রাট্-দরবারে প্রচার হইয়াছিল। নবাব সায়েস্তা খাঁ সীতারামকে ভাল বাসিতেন। সদ্বক্তা মুনিরাম সম্রাট্সকাশে নিম্নবঙ্গের অনেক পরগণার দুরবস্থাবর্ণন করিলেন। তিনি কহিলেন, নিম্নবঙ্গের কোন পরগণা জনশূন্য ও কোন পরগণা জঙ্গলাবৃত হইয়া আছে। আসামী, আরাকানী ও পর্ত্তুগীজের অত্যাচারে তদ্দেশে আর লোক বাস করিতে চাহে না। তথায় লোক বাস করান বিশবৎসর কাল-সাপেক্ষ। সম্রাট্ অরঙ্গজেব এই সকল অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া সীতারামকে রাজা উপাধির পাঞ্জাসহি ফরমান দিয়া নিম্নবঙ্গের আবাদী সনদ অর্থাৎ প্রজা-পত্তনপূর্ব্বক সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খলাস্থাপনের সনন্দ দিলেন।

সীতারাম এই রাজা উপাধির সনন্দ পাইয়া প্রফুল্লমনে দিল্লী হইতে স্থলপথে প্রয়াগ পর্য্যন্ত আগমন করিলেন। তখন বর্ষাকাল, ভাগীরথী অতি স্রোতস্বতী হইয়াছিলেন। তিনি প্রয়াগ হইতে নৌকাপথে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে কাশীধামে তিন দিনের জন্য অপেক্ষা করেন। এই সময়ে মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের কতকগুলি যাত্রিপূর্ণ এক নৌকার

সহিত তাঁহার দেখা হইল। এই নৌকায় দুই কায়স্থ ভগিনী দুইটি কন্যার সহিত তীর্থযাত্রায় গিয়াছিলেন। দুইটি কন্যার মাতা জ্যেষ্ঠা ভগিনী রোগযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছিলেন। হৃদয়বান্‌ সীতারাম রোগনিপীড়িতা রমণীর শুশ্রূষায় রত হইলেন। বিধবার কাল পূর্ণ হইয়া আসিল। তিনি কন্যা দুইটিকে সীতারামের হাতে হাতে দিয়া, তাহাদিগের বিবাহ দিবার ভার লওয়ার কথা সীতারাম দ্বারা অঙ্গীকার করাইয়া লইয়া, কনিষ্ঠা বিধবা ভগিনীকে আশ্বস্ত করিয়া স্বচ্ছন্দমনে ভবলীলা সাঙ্গ করিলেন। সীতারাম সেই যাত্রিনৌকার সহিত মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত আসিয়া সেই কন্যাদ্বয়ের মাতৃস্বসাকে কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া তাহার গৃহে রাখিয়া আসিলেন, এবং তাঁহাকে বলিয়া আসিলেন, কন্যাদ্বয়ের বিবাহকাল উপস্থিত হইলে বিধবা সীতারামকে সংবাদ দিবেন, অথবা তিনি কন্যাদ্বয়কে লইয়া সীতারামের নিকট যাইবেন ও সীতারাম কন্যা দুইটির বিবাহ দিয়া দিবেন।

অনন্তর সীতারাম মুর্শিদাবাদে আসিলেন। তিনি যথানিয়মে অতিশয় বিনয় ও নম্রতা সহকারে নজর দিয়া কুর্ণিশ করিয়া মুর্শিদ কুলী খাঁর সহিত দেখা করিলেন। মুর্শিদ কুলী খাঁও সীতারামকে আর একটি আবাদী সনন্দ দিয়া দশ বৎসরের কর দেওয়া হইতে নিস্কৃতি দিলেন। কিন্তু তিনি প্রকাশ করিলেন, আবাদী মহলের অল্প দিনের মধ্যে অবস্থান্তর হইলে কিছু নজরান ও আব্‌ওয়াব আদায় করিয়া দিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন সীতারাম গড়বেষ্টিত বাড়ী নির্ম্মাণের ও অত্যাচার উৎপীড়ন নিবারণ জন্য সৈন্য রাখিবার অনুমতি লইলেন।

মুর্শিদাবাদ হইতে রওনা হইয়া আসিয়া পথিমধ্যে কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত কপিলেশ্বরের ঘাটে কৃষ্ণপ্রসাদ গোস্বামীর সহিত সীতারামের দেখা হইল। কৃষ্ণপ্রসাদের ভূষণা অঞ্চলে শিষ্য থাকায় এবং তিনি ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ পণ্ডিত হওয়ায় সীতারাম ও তাঁহার পিতার সহিত তাঁহাদিগের পূর্ব্ব হইতে বিশেষ পরিচয় ছিল। বর্গীর হাঙ্গামাদি কারণে কৃষ্ণপ্রসাদ ভূষণা অঞ্চলে বসবাস করিবার অভিলাষ জানাইলেন। সীতারামও তাঁহাকে সাহায্য করিবার সম্পূর্ণ আশা দিলেন। কৃষ্ণপ্রসাদ ও সীতারাম দুইজনে বহুক্ষণ নানা বিষয়ে সন্তোষ সহকারে কথোপকথন হইল। কৃষ্ণপ্রসাদই গণিয়া সীতারামের ভাবী গৌরবের বিষয় বলিয়া দিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

—*—

মহম্মদপুর নগর-নির্ম্মাণ, কর্ম্মচারি-নির্ব্বাচন ও বিবাহ

যৎকালে সীতারামের যশঃসৌরভে বঙ্গদেশ পূর্ণ, তখন সীতারাম স্বয়ং বাদশাহ অরঙ্গজেবের নিকট হইতে রাজা উপাধি ও আবাদী সনন্দ লইয়া আসিলেন। সীতারাম সম্বন্ধে কাল্পনিক ও অতিরঞ্জিত অনেক গল্প প্রচার হইয়া পড়িল। সীতারামের দানশীলতা, সত্যবাদিতা, ন্যায়নিষ্ঠতা ও নিরপেক্ষবাদিতা সম্বন্ধে কত গল্প প্রতিদিন উদ্ভাবিত হইয়া প্রচারিত হইতে লাগিল। কয়েকটী বিধবা ভূস্বামিনী ও নাবালক জমিদার স্ব স্ব জমিদারী সীতারামের তত্ত্বাবধানে রাখিলেন। ইহাতেও রাজভবন দৃঢ়তর করিবার ও প্রবলতর সৈনিকদলের শীঘ্র প্রয়োজন হইল। তিনি নিকটবর্ত্তী স্থানের মধ্যে একটী রাজধানীর উপযুক্ত স্থান অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ফকির মহম্মদ আলি তৎকালে নারায়ণপুর গ্রামে রাজধানী নির্ম্মাণ করিবার স্থান নির্ব্বাচন করিলেন। ইহার উত্তরে ছত্রাবতী ও তাহার কিঞ্চিৎ উত্তরে বারাসিয়ানদী, পূর্ব্বে স্রোতস্বতী এলেংখালির খাল, মধ্য দিয়া কালাগঙ্গা নদী প্রবাহিত ছিল। এই স্থানের পশ্চিমদিকে কতকগুলি বৃহৎ বৃহৎ বিল তৎকালে বিদ্যমান ছিল। এইরূপ স্থলে শত্রুগণ সহসা প্রবেশ করিতে পারে না বলিয়া মহম্মদ আলি এই স্থান রাজধানীর উপযুক্ত

মনে করি . ছিলেন। নারায়ণপুর নাম দিয়া নব রাজধানী সংস্থাপন সম্বন্ধে এ . শে বহুবিধ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। আমরা তাহার কোনটিকে অলীক ও কল্পনাপ্রসূত বলিতে প্রস্তুত নহি। সকল কিম্বদন্তীরই কিছু না কিছু মূল আছে, কিম্বদন্তীগুলি এই :—

(১) . .রাম নারায়ণপুরে রাজধানী স্থাপনের অভিলাষী হইয়া সেই স্থানবাসী মহম্মদ আলি নামক এক ফকিরকে তাঁহার আস্তানা ভাঙ্গিয়া উঠিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। ফকির প্রথমতঃ যাইতে সম্মত হইলেন না, পরে প্রস্তাব করিলেন তাঁহার নামানুসারে নব রাজধানীর নাম রাখিলে তিনি ঐ স্থান পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছেন। সীতারাম ফকিরের কথায় সম্মত হইয়া নগর নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন।

(২) মহম্মদ আলি ফকির সীতারামের উপদেষ্টা ও পরম হিতৈষী ছিলেন। তিনি নারায়ণপুরে তাঁহার আবাস ভাঙ্গিয়া সীতারামকে নব নগর প্রস্তুত করিবার উপদেশ দিয়া আজীবন সীতারামের পরামর্শদাতার কার্য্য করিতেন। এজন্য তাঁহার নামানুসারে নগরের নাম হইয়াছে।

(৩) সীতারামের পিতা উদয়নারায়ণ ভূষণার নিকটবর্ত্তী গোপালপুরের বাটী হইতে অশ্বারোহণে সূর্য্যকুণ্ডের বাটীতে আসিবার কালে নারায়ণপুরে কর্দ্দমমধ্যে তাঁহার অশ্বের ক্ষুর বসিয়া যায়। তিনি অবতরণ করিয়া সেই স্থান খনন করিয়া দেখেন, অশ্বক্ষুর এক ত্রিশূলে বিদ্ধ রহিয়াছে। তিনি সেই স্থানের নিম্নদেশ খনন করিয়া একটী ক্ষুদ্র মন্দির ও লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উদয়নারায়ণের ইচ্ছা ছিল, নারায়ণপুরে লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা

করিয়া একটি বাটী নির্ম্মাণ করেন, কিন্তু তিনি তাঁহার জীবদ্দশায় তাহা সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই। সীতারাম পিতার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন।

(৮) সীতারাম একদা অশ্বপৃষ্ঠে গমন করিতে করিতে নারায়ণপুরে তাঁহার অশ্বক্ষুর ভূগর্ভে প্রবেশ করে। অশ্ব আপন বলে তাহার পা উঠাইতে পারে না। সীতারাম অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া অশ্বক্ষুর মুক্ত করিয়া দেন। অশ্বক্ষুরে ত্রিশূল বিদ্ধ হইয়াছিল। সেই স্থান খনন করিয়া একটি ক্ষুদ্র মন্দির ও লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা পাইয়াছিলেন। এই ব্যাপার দৈব ইচ্ছা মনে করিয়া তিনি নারায়ণপুরে নগর নির্ম্মাণ করেন।

এই সকল কিম্বদন্তীর তাৎপর্য্য এই যে, সীতারামের কোন ফকির সুহৃদ্ ছিলেন। সীতারাম মহম্মদপুরে লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতারও একটি লক্ষ্মীনারায়ণ-স্থাপনের ইচ্ছা ছিল। তিনি অনেক স্থানে গমন করিয়াছেন এবং অশ্ব অনেক স্থলে কর্দ্দম মধ্য দিয়া গমন করিয়াছিল। সীতারাম অনেক স্থান খনন করিয়াছেন। কোথাও একটী ভগ্ন মন্দির বা কিছু ইষ্টক পাইতে পারেন। সীতারাম প্রথম নারায়ণপুরের নাম লক্ষ্মীনারায়ণপুর রাখিয়াছিলেন। পরে কোন রাজভক্ত প্রজা স্বীয় মনের ভাব প্রকাশ করিলে তিনি ইসলামধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহম্মদের নামানুসারে স্বীয় রাজধানীর নাম মহম্মদপুর রাখেন। সীতারাম নিজে প্রকাশ করেন যে, তিনি লক্ষ্মীনারায়ণের দাস, তিনি উক্ত দেবতার প্রীত্যর্থে রাজ্যবৃদ্ধি, দুষ্টদমন, শিষ্টপালন ও বিপন্নের উপকার করিয়া থাকেন। এই সকল ঘটনাবলী বিমিশ্রিত হইয়া কল্পনা ও অতিরঞ্জনের সঙ্গে উক্ত ৪টা কিম্বদন্তী

গঠিত হইয়াছে। সীতারামের নব রাজধানী নির্ম্মাণের যদিও অ মরা ঠিক তারিখ বলিতে পারি না, তবে আমরা এই কথা বলিতে পারি যে, নব রাজধানী দেবালয়সমূহপ্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে খৃষ্টীয় ১৬৯৭ ও ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

সীতারামের রাজবাড়ী প্রায় এক মাইল দীর্ঘ ও অর্দ্ধ মাইলের কিঞ্চিদধিক প্রস্থ; এই দুর্গ চতুষ্কোণ, পূর্ব্বপশ্চিমে গভীর গড়, দুর্গের অনতিদূরে উত্তরপূর্ব্বে সীতারামের পিতার নামানুসারে উদয়গঞ্জের খাল ও বাজার। বাটীর দক্ষিণে তিন শত বত্রিশ হাত ব্যাসার্দ্ধ বা ৬৬৪ হাত ব্যাসের বৃত্তাকার পুষ্করিণী এবং সেই পুষ্করিণীর চতুষ্কোণ স্থলে সীতারামের গ্রীষ্মাবাস। রাজধানীর কিঞ্চিৎ দূরে চিত্ত-বিশ্রাম নামক স্থানে সীতারামের চিত্তবিশ্রাম বা পল্লীনিবাস ছিল। চিত্তবিনোদনার্থ তিনি নবগঙ্গা নদীতীরে বিনোদপুর গ্রামে একটি ক্ষুদ্র ভবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বিনোদপুরেও তাঁহার দ্বিতীয় পল্লীভবন ছিল। কালের সর্ব্বসংহারী নিশ্বাসে সকলেরই বিলয় সাধন হয়। এই ভবনও নবগঙ্গা নদী গ্রাস করিবার উপক্রম করিলে নীল-কুঠীর সাহেবগণ তাহা ভাঙ্গিয়া ইহার কোন কোন উপকরণ চাউলিয়ার কুঠীবাড়ী নির্ম্মাণে ব্যবহার করিয়াছিলেন। বীরপুরে কালীগঙ্গাতীরে সীতারামের আড়ঙ্গবাড়ী অর্থাৎ শারদীয়া বিজয়া দশমী দিনের অবস্থিতি স্থান ছিল। এই বাড়ীর দৃশ্য অতি রমণীয়। ইহার একদিকে কালীগঙ্গা নদী, অন্যদিকে স্বচ্ছ নীলজলপূর্ণ সঙ্গীতের দোহা অবস্থিত ছিল। বিজয়াদশমীর দিনে এই বাটী ও ইহার চতুর্দ্দিকস্থ পথ সকল আলোকমালায় সজ্জিত হইলে ও সেই সকল আলোকমালা

নদী ও দোহার জলে প্রতিবিম্বিত হইলে ভবনও অতি চিত্তবিনোদ দৃশ্য ধারণ করিত। কালের সর্ব্বসংহারিণী শক্তিবলে এই ভবন মধুমতী নদী গ্রাস করিয়াছে। এই গৃহে সীতারামের চতুর্থ ও পঞ্চম রাণী বাস করিতেন। এতদ্ভিন্ন সূর্য্যকুণ্ড ও শ্যামগঞ্জেও সীতারামের দুইটী বাড়ী ছিল। সীতারামের বাড়ীর বিস্তৃত বিবরণ সীতারামের "কীর্ত্তিশীর্ষক" পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইবে।

সীতারামের নব রাজধানী অল্পদিন মধ্যে ধনে জনে পূর্ণ হইয়া উঠিল। নানা দিগ্দেশ হইতে গুণী, জ্ঞানী ও শিল্পী আসিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। কর্ম্মকারপটী, কাইয়াপটী প্রভৃতি বাজার বসিল। নগর ও তাঁহার রাজধানীর উপকণ্ঠে অনেক গ্রাম ছাইয়া ফেলিল। এই নগরে হিন্দু মুসলমান, ক্ষত্রিয় পাঠান সুখে সম্প্রীতিতে বসবাস করিতে লাগিল।

মেনাহাতী, মেলাহাতী বা মৃণ্ময় সীতারামের সেনাপতি ছিলেন। ইহাঁকে কেহ শিখ, কেহ পাঠান মুসলমান, কেহ ক্ষত্রিয় ও কেহ বঙ্গদেশীয় কায়স্থ বলিয়া থাকেন। যে কারণে ইহাঁকে ভিন্ন ভিন্ন লোক ইঁহাকে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বলেন,তদ্বিবরণ পরে বলিব। এস্থলে তৎসম্বন্ধে আমাদের মত মাত্র প্রকাশ করিব। মেনাহাতী নড়াইল মহকুমার অন্তর্গত রায়গ্রামনিবাসী ঘোষবংশের পূর্ব্বপুরুষের একজন। এই বংশে সুনামখ্যাত ডাক্তার সীতানাথ ঘোষ ও সবজজ প্রসন্নকুমার ঘোষের নাম অনেকেই পরিজ্ঞাত আছেন। ইহাঁরা জাতিতে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ। মেনাহাতীর প্রকৃত নাম রূপনারায়ণ বা রামরূপ ঘোষ, ইহাঁর শরীর দৈর্ঘ্যে ৫ হাত ও হৃষ্টপুষ্টতা আকারানুযায়ী ছিল।

ইনি গৃহে থাকিতে দুষ্টদমন ও দস্যুদিগের অত্যাচারনিবারণে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অগ্রসর হওয়ায় তাঁহার পিতামাতা ও স্বজনগণ তিরস্কার করেন। ইহাতে তিনি ক্রোধপরবশ হইয়া ঢাকার নবাব-সরকারে কার্য্য করিবেন বলিয়া গমন করেন। তথায় সীতারামের সহিত তাহার পরিচয় হয়। সীতারামের ডাকাইতি-নিবারণ সময় দেশের নানা স্থান পর্য্যটন করায় ও দেশীয় লোকের নানা যন্ত্রণা সন্দর্শন করায় তিনি দেশহিতকর কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে কৃতসংকল্প হন। মেনাহাতী অকৃতদার ছিলেন। তিনি সীতারামকে আদর্শ পুরুষ মনে করিতেন। মেনাহাতী ভীমের ন্যায় জানিতেন 'দাদা আর গদা' অর্থাৎ সীতারামের অনুজ্ঞা ও তাহার পালন। তিনি কোন কার্য্যে ভয় করিতেন না, জীবনের প্রতিও তাঁহার কিছুমাত্র মমতা ছিল না। তাঁহার শারীরিক বল ও অস্ত্রচালনাকৌশল অপূর্ব্ব ছিল। তিনি গৃহে থাকিতেই কুস্তী ও তীরন্দাজী শিক্ষা করিয়াছিলেন। ঢাকা ও দিল্লীতে থাকিয়া অন্যান্য অস্ত্রচালনা শিক্ষা করেন। তিনি দিল্লীতে কুস্তী করিয়া মল্লসমাজে মেনাহাতী উপাধি পান। মেনাহাতী প্রতিদিন কুস্তী করিয়া সর্ব্বাঙ্গে মৃত্তিকা মাখিতেন; এইজন্য সীতারামের গুরুদেব তাঁহার নাম মৃন্ময় রাখিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি পূজাহ্নিক করিয়া সর্ব্বাঙ্গে মৃত্তিকার ফোঁটা দিতেন, এ কারণেও তাঁহাকে লোকে মৃন্ময় বলিত। মেনাহাতী যেমন পূজাহ্নিক করিতেন, তেমনি মুসলমান ভজনাগৃহেও যাইতেন। তাঁহার কোনও ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ ছিল না। তিনি সীতারামের পাঠান ও ক্ষত্রিয় সৈনিকের সহিত একাসনে বসিতেন এবং ধার্ম্মিক, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। তিনি

কোন বেতন লইতেন না। তাঁহার নিজের ভরণপোষণ ও দরিদ্রদিগকে দানের জন্য কিঞ্চিৎ অর্থ লইতেন মাত্র। তাঁহার স্বদেশহিতৈষিতা-ব্রতের বিঘ্ন হইবার ভয়ে বাড়ী ও স্বজনগণের সহিত কোন সম্বন্ধ রাখিতেন না। মেনাহাতী এক এক দিনে এক এক রূপ বেশ ধারণ করিতেন। কখন বাঙ্গালী, কখনও হিন্দুস্থানী, কখন হিন্দু, কখনও মুসলমান সাজিয়া রাজপথে বাহির হইতেন; নিজের কোন পরিচয় দিতেন না। তিনি স্বপাক অন্ন-ব্যঞ্জন আহার করিতেন।

সীতারামের ২য় সেনাপতির নাম আমিন বেগ, আমল বেগ বা হামলা বাবা। ইনি জাতিতে পাঠান এবং একজন নির্ভীক বীরপুরুষ ছিলেন। ইঁহার পরিচয় আর আমরা কিছুই জানিতে পারি নাই। তৃতীয় সেনাপতির নাম বক্তার খাঁ, ইনিও পাঠানজাতীয় বীর। ইঁহার সহিত সীতারামের যেরূপে পরিচয় হয়, তাহা তৃতীয় পরিচ্ছেদের শেষভাগে বর্ণিত হইয়াছে।

সীতারামের ঢালিসৈন্যের কর্ত্তা ফকিরা মাছকাটা, ইনি জাতিতে নমঃশূদ্র, মৎস্য কাটিয়া বিক্রয় করাই ইঁহার পূর্ব্বপুরুষের ব্যবসায় ছিল। শুনা যায়, ফকিরার বাড়ী পরগণে নলদীর বর্ত্তমান তরফ কালিয়ার অন্তর্গত কোন গ্রামে ছিল। ইঁহার বাহুবল দেখিয়া সীতারাম ইহাকে অস্ত্রশিক্ষা দিয়া সৈনিক করিয়া তুলেন। রূপচাঁদ ঢালি সীতারামের ঢালিসৈন্যের অপর একজন নায়ক ছিলেন। ইনিও জাতিতে নমঃশূদ্র। রূপচাঁদের বংশধরগণ এক্ষণে মহম্মদপুরের নিকটস্থ থলিসাখালি গ্রামে বাস করিতেছে।

ভারা খাঁ, দোস্ত মামুদ সর্দ্দার, সোণাগাজি সর্দ্দার, এবং গোলামী

সর্দ্দার, এই চারিজন সীতারামের শরীররক্ষক ছিলেন। ইঁহারা পাঠান-জাতীয় সৈনিকপুরুষ; ইঁহাদের উত্তরপুরুষগণ মাগুরা হইতে ৯ মাইল দক্ষিণে ও মহম্মদপুর হইতে ১৯ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কাতলি গ্রামে বাস করিতেছে। এতদ্ভিন্ন সীতারামের ক্ষত্রিয় সৈন্য ছিল। এখনও মহম্মদপুরের অন্তর্গত কাটগড়াপাড়ায় অনেক ক্ষত্রিয়ের বাস আছে। মহম্মদপুর থানার অন্তর্গত নবগঙ্গার তীরে নহাটা গ্রামে যে ক্ষত্রিয়গণের বাস আছে, তাঁহারা বলেন, তাঁহারা পূর্ব্বে সীতারামের রাজধানীতে ছিলেন, পরে মঘ আক্রমণ নিবারণ জন্য নহাটায় ও উহার অপর পারে সিংহড়া-বেরৈল গ্রামে আসিয়াছিলেন। ঐরূপ আসামীদিগের আক্রমণ নিবারণ জন্য গন্ধখালীতেও সীতারামের প্রতিষ্ঠিত ক্ষত্রিয়পল্লী দেখা যায়। সীতারামের ক্ষত্রিয় সেনাপতির নাম পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ মেনাহাতী ক্ষত্রিয় সৈন্যদলের নায়ক ছিলেন।

সীতারাম ক্ষত্রিয়, পাঠান ও ঢালিসৈন্যের মধ্যে কাহারও প্রতি অনুগ্রহ বা কাহারও প্রতি নিগ্রহ প্রদর্শন করিতেন না। সকলের প্রতি তাঁহার সমান বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার শরীররক্ষক পাঠান বীর ও অন্তঃপুররক্ষক পাঠান সৈনিক প্রহরী ছিল। এক্ষণে অন্তঃপুরের নিকটে যে ছবিলাবিবির ভিটা বর্ত্তমান আছে, তাহা একজন পাঠান অন্তঃপুর-প্রহরীর পত্নী ছবিলার বাস-গৃহাবশেষ। সীতারামের সৈন্যদলের রসদদাতা অনেকে ছিলেন। কুমরুলের দত্তবংশের পূর্ব্বপুরুষ রূপনারায়ণ দত্ত সীতারামের সৈনিকবিভাগের একজন রসদদাতা ছিলেন।[২৩] তিনি সীতারামের রামপাল-বিজয়ের সময় উত্তমরূপ রসদ সংগ্রহ করায় সীতারাম তাহাকে পারিতোষিক স্বরূপ ৯৮ পাখী জমি দেবত্র দিয়াছিলেন।

কুমরুলের দত্তবংশ দক্ষিণ-রাঢ়ী কায়স্থ। তাঁহাদের বংশে এক্ষণে রামচরণ দত্ত, লালবিহারী দত্ত প্রভৃতি কয়েক লোক জীবিত আছেন। পলাসবাড়ীয়ার বসুবংশের আদিপুরুষ মদনমোহন বসু সীতারামের বেলদার সৈন্যের কর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার বংশে এখন রাসবিহারী বসু জীবিত আছেন। মদনমোহন দৃঢ়কায় ও বলিষ্ঠ ছিলেন। কথিত আছে, তিনি কোন সময়ে বৃষ্টি হইতে স্বীয় বসন ও শরীররক্ষার জন্য একখানি ক্ষুদ্রনৌকা দুই হস্তে মস্তকোপরি ধরিয়া সীতারামের সভায় আসিয়াছিলেন। রূপচাঁদ মদনমোহনের তুল্য-বলশালী ছিলেন।

সীতারাম নলদী পরগণা নিষ্কর পাইয়া আসিবার পর, তাঁহার একজন জমিদারীর কার্য্যনির্ব্বাহক প্রধান কর্ম্মচারীর প্রয়োজন হয়। হামবৈদ্য দলের সংস্থাপক মথুরাপুরনিবাসী রাজা সংগ্রাম সিংহের দেওয়ান গড়েদহ আড়পাড়ার বিখ্যাত রায়বংশের কোন ব্যক্তি ছিলেন। দেওয়ানের যাতায়াতের জন্য গড়দেহ হইতে মথুরাপুর পর্য্যন্ত যে সুপ্রশস্ত জাঙ্গাল বা রাস্তা প্রস্তুত হয়, তাহা এখনও বর্ত্তমান আছে। এই রায়বংশের সাতটী বৃহৎ পুষ্করিণী চিহ্ন এখনও বিদ্যমান দেখা যায়। যে বংশের লোক যে কার্য্যে পটু, প্রাচীন কালে সেই বংশের লোককে সেই পদে নিয়োগ করার রীতি ছিল। সীতারাম সংগ্রাম শাহের দেওয়ানবংশীয় গোবিন্দ রায়কে আনিয়া স্বীয় দেওয়ানপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। গোবিন্দ এই সময়ে বৃদ্ধ ও একচক্ষুহীন হইয়াছিলেন। তিনি কিছুদিন বিশেষ দক্ষতার সহিত সীতারামের দেওয়ানী কার্য্য করিয়া পরলোক গমন করেন। তিনি এত ধাম্মিক ও ন্যায়বান্ ছিলেন যে, এখনও এ অঞ্চলে পাশা খেলিবার সময়ে পাশার দানে

এক পোয়া বা এক চখের দরকার হইলে খেলয়ারেরা দান ছাড়িবার সময় বলে—"ভালা গোবিন্দ রায়, চোখ না পোয়া রেখে যাস্"। গোবিন্দ রায় রাঢ়ীশ্রেণীয় শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার শেষ বংশধর হারাণ বা হাকরায় পরলোক গমন কালে একটী কন্যা রাখিয়া যান ঐ কন্যা হইতে এক্ষণে হাকর ২টী দৌহিত্র মাত্র আছে।

সীতারামের জমিদারী সংক্রান্ত কর্ম্মচারীর মধ্যে আমরা সীতারামের অপর দেওয়ান যদুনাথ মজুমদার মহাশয়ের নাম পাইয়াছি; ইঁহার নিবাস রামসাগরের দক্ষিণ দিকে ছিল। এখনও তাঁহার বাটী ও মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ আছে। ইঁহাদের গৃহে সীতারামের মোহরযুক্ত সনন্দ রহিয়াছে।[২৩] ইঁহারা রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, সাবর্ণ গোত্র। ইঁহার উত্তরপুরুষগণ এক্ষণে কানুটিয়া গ্রামে বাস করেন। ইঁহার বংশে এখন জানকীনাথ, আশুতোষ ও শ্রীশচন্দ্র জীবিত আছেন। ইঁহাদিগের গৃহে সীতারামের সময়ের কোন কোন কবিতা ও হিসাবখণ্ড আমরা পাইয়াছি। তাহা যথাস্থানে প্রকাশ করিব। ইঁহাদের এক্ষণে পূর্ব্বের ন্যায় সম্পত্তি নাই, কিন্তু সীতারাম প্রদত্ত কিঞ্চিৎ নিষ্কর জমি আছে। সীতারামের দেওয়ান বংশ বলিয়া ইঁহাদের বেশ মানসম্ভ্রম আছে। ইঁহাদের মহম্মদপুরে পৈতৃক বাটী, বার্ষিক ৩৲ টাকায় জমায় মহম্মদপুরনিবাসী বঙ্কবিহারী দত্তকে জমা দেওয়া ছিল। মহেশচন্দ্র দাস মজুমদার সীতারামের নায়েব দেওয়ান ছিলেন। ইনি জাতিতে বারেন্দ্রশ্রেণীর বৈদ্য। মহম্মদপুরের অন্তর্গত বাউইজানিতে ইঁহার নিবাস ছিল।

ভবানীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী সীতারামের পেস্কর ছিলেন। তাঁহার

উত্তরপুরুষগণ এক্ষণে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত নলিয়া গ্রামে বাস করেন এবং নলিয়ার চক্রবর্ত্তী বলিয়া বিখ্যাত ইঁহারাও সাবর্ণগোত্রজ রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। যদুনাথ দেওয়ান হইয়া মজুমদার উপাধি পান কিন্তু ভবানীপ্রসাদের পূর্ব্ব উপাধি চক্রবর্ত্তীই থাকিয়া যায়। নলিয়ার চক্রবর্ত্তী মহাশয়দিগের এখনও কিছু সম্পত্তি আছে। সীতারামের দত্ত সহস্রাধিক বিঘা নিষ্কর ব্রহ্মত্র আছে। রঙ্গপুরের বিখ্যাত উকিল ৺জ্ঞানমোহন বাবু ও তদীয় ভ্রাতা সবজজ্ বাবু গিরীন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী এম এ, বি এল, চক্রবর্ত্তিবংশের বংশধর।

বলরাম দাস সীতারামের মুন্সী ছিলেন। ইনি জাতিতে বারেন্দ্র-শ্রেণীর কায়স্থ। ইঁহার উত্তরাধিকারিগণের উপাধি সম্প্রতি মুন্সী, বর্ত্তমান সময়ে যশোহর জেলার অন্তর্গত কাদিরপাড়া গ্রামে ইঁহাদের নিবাস। ইঁহাদের এখনও বেশ সম্পত্তি আছে। চারি সম্প্রদায়ের কায়স্থ মধ্যে বারেন্দ্রশ্রেণীর কায়স্থ অতি অল্প। কৌলিন্য-প্রথার এই শ্রেণীর কায়স্থগণ সিদ্ধ ও সাধ্য দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। দাস, নন্দী ও চাকী সিদ্ধ; দেব, দত্ত, নাগাদি সাধ্য। অত্রিগোত্রজ নরহরি দাস দাসবংশের আদিপুরুষ। দাসবংশ চাকরী উপলক্ষে মজুমদার, সরকার, রায়, মুন্সী প্রভৃতি উপাধি পাইয়াছেন। নরহরি হইতে ৮ম পুরুষ নিম্নে রাজীবলোচনের ৩য় পুত্র হরিরাম, রামরাম ও দুর্গারাম। রামরাম ও দুর্গারাম অসীম সাহসের সহিত আসামী ডাকাইতদিগের আক্রমণ নিবারণ করায় সীতারাম সন্তুষ্ট হইয়া বিলপাকুটীয়া নামে এক খানা গ্রাম দুই ভ্রাতাকে দুগ্ধ খাইবার জন্য নিষ্কর দান করেন। দুর্গা-রামকে আদর করিয়া সীতারামের গোস্বামি-গুরু বলরাম বলিতেন

এবং দুর্গারামের নাম সীতারামের রাজধানীতে 'বলরাম' বলিয়াই সকলে জানেন। এই বংশে ব্রজনাথ মুন্সী, দ্বারকানাথ মুন্সী, যদুনাথ মুন্সী, চন্দ্রনাথ মুন্সী প্রভৃতি অনেকে জীবিত আছেন।

গদাধর সরকার সীতারামের বাটীর তত্ত্বাবধারক ছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ এক্ষণে বোর্ণি আমগ্রামে বাস করেন। এই বংশে এখনও বিজয়বসন্ত সরকার ও গুরুদাস সরকার জীবিত আছেন। উক্ত আমগ্রামের বিশ্বাস ও মুন্সীবংশ সীতারামের সরকারে সহকারী মুন্সী ও নাএবের কার্য্য করিতেন।

সীতারামের অন্যান্য কর্ম্মচারীর নাম আমরা বিশেষ অনুসন্ধানেও জানিতে পারি নাই। মুনিরাম রায় সীতারামের পক্ষে অগ্রে ঢাকায় পরে মুর্শিদাবাদ নবাবসরকারে মোক্তার ছিলেন। মুনিরাম বঙ্গজ কায়স্থ। মহম্মদপুরের নিকটবর্ত্তী ধুলজুড়ী গ্রামে ইঁহার উত্তরপুরুষের এখনও বাস আছে। ইঁহার বর্ত্তমান বংশধরের নাম জগবন্ধু রায় ইঁহার ৭।৮ শত টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি আছে। মুনিরাম পণ্ডিত ও সদ্বক্তা লোক ছিলেন। তিনি প্রথমে সীতারামের অধীনে নলদী পরগণায় সুমারের কার্য্য করেন। নবাব-সরকারে মুনিরামের বেশ যশঃ এবং প্রতিপত্তি ছিল। একটা কথা আছে, "কোন সীতারাম রায়? যেস্‌কা উকিল মুনিরাম রায়"।

কুলাচার্য্যের কুলপঞ্জিকা ও গুরুকুলপঞ্জীতে সীতারামের এই তিনটি বিবাহের পরিচয় পাওয়া যায়;—সীতারামের প্রথম বিবাহ মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত ফতেসিংহ পরগণার মধ্যে দাসপালসা গ্রামে, দ্বিতীয় বারে অগ্রদ্বীপের নিকট পাটুলীতে, তৃতীয় বারে ভূষণার অধীন

ইদিলপুর গ্রামে হইয়াছিল। সীতারামের প্রথমা স্ত্রীর নাম কমলা, তিনি প্রধান কুলীন সরল খাঁ (ঘোষের) কন্যা। সীতারাম-বিষয়ক প্রস্তাবলেখকগণ সরলখাঁকে বীরভূম অঞ্চলের লোক বলিয়াছেন। জানি না, মুর্শিদাবাদের কিয়দংশ সম্প্রতি বীরভূম জেলাভুক্ত হইয়াছে কি না। সীতারাম কমলাকে ওজন করিয়া কন্যাপণের টাকা দিয়াছিলেন। সরল খাঁর বিবরণ যথাস্থানে লিখিত হইবে।

বীরপুরে নওয়ারাণীর বাটী বা আড়ঙ্গবাটী বলিয়া সীতারামের যে বাটী ছিল, তাহার নামদৃষ্টে অনুমান হয় সীতারামের আরও দুইটী পরিণীতা স্ত্রী ছিলেন। কিম্বদন্তীতে ও মাসালিয়ার চক্রবর্ত্তি-গৃহের হস্তলিখিত কুলপুস্তক দৃষ্টে অনুমান হয়, সীতারাম কাশীতে যে বিধবার সৎকার করেন ও তাঁহার অন্তিম সময়ে তাঁহার কন্যাদ্বয়ের বিবাহের ভার লইবেন বলিয়া স্বীকার করেন, সেই বিধবার ভগিনী, কন্যা ২টী লইয়া সীতারামের রাজধানীতে উপস্থিত হন। সীতারাম কন্যা ২টী স্থানান্তরে বিবাহ দিবার আয়োজন করিলে বিধবা বলেন, 'কন্যার বিবাহের ভার লওয়া অর্থ—সীতারাম কন্যা দুটিকেই বিবাহ করিবেন এই অঙ্গীকার করিয়াছেন। সীতারামের রাজবিভব, রাজগৌরব দেখিয়াই বিধবা সম্ভবতঃ ঐ প্রকার অর্থ করিয়াছেন। সীতারাম প্রথমতঃ বিবাহে অস্বীকার করেন। কিন্তু বিধবা যখন বলিলেন— সীতারাম বিবাহ না করিলে অঙ্গীকারভ্রষ্ট হইবেনই, তখন তিনি প্রতিজ্ঞাভঙ্গভয়ে কন্যা ২টীকে বিবাহ করিলেন। অজ্ঞাতকুলশীলা বিধবার সহিত আগত ২টী বালিকার পাণিপীড়ন করায় সীতারামের অন্য রাণীগণ এই নবোঢ়া রাণীদ্বয়ের সহিত এক বাটীতে বাস করিতে

অসম্মত হন। এই কারণে বোধ হয় তাঁহারা মাতৃষ্বসার সহিত আড়ঙ্গবাটীতে থাকেন এবং তাঁহাদের বিবরণ কুলাচার্য্যের গ্রন্থে স্থান পায় নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সীতারামের গুরুবংশ, পুরোহিতবংশ ও সীতারাম-সংসৃষ্ট পণ্ডিত, কবিরাজ ও মৌলবীগণ

সীতারামের পিতার গুরুদেবের নাম রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার। তাঁহার দুই পুত্র—রত্নেশ্বর সার্ব্বভৌম ও রামপতি সিদ্ধান্ত। রামপতি সিদ্ধান্তের উত্তরপুরুষের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। রত্নেশ্বরের তিন পুত্র—রাজেন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, দেবেন্দ্র ন্যায়রত্ন ও শ্রীরাম বাচস্পতি। এই তিন পুত্রের মধ্যে রাজেন্দ্র বিদ্যাবাগীশের এক পুত্র মুকুন্দরাম ন্যায়পঞ্চানন। মুকুন্দরামের পাঁচ পুত্র—মহাদেব ন্যায়বাগীশ (স্ত্রীর নাম তারামণি দেবী) দুর্গারাম, গঙ্গাধর, কালিদাস ও বিষ্ণুরাম। এই পাঁচ পুত্রের মধ্যে দুর্গারামের পুত্র নীলকণ্ঠ, নীলকণ্ঠের পুত্র মহেশচন্দ্র, মহেশচন্দ্রের পুত্র জগচ্চন্দ্র, জগচ্চন্দ্রের পুত্র পরেশনাথ স্মৃতিতীর্থ জীবিত। অন্য শাখায় শ্রীরাম বাচস্পতির দুই পুত্র, জয়রাম ন্যায়পঞ্চানন ও পুরুষোত্তম ন্যায়ালঙ্কার। জয়রামের পুত্র রামপ্রসাদ, রামপ্রসাদের পুত্র সদাশিব, সদাশিবের পুত্র বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য। রত্নেশ্বরের ভ্রাতা রামপতির এক প্রপৌত্রের নাম চন্দ্রচূড় ছিল। বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসের চন্দ্রচূড় ও এই চন্দ্রচূড় এক কি না বলিতে পারি না। আমাদের বোধ হয়, বঙ্কিমবাবুর চন্দ্রচূড় কাল্পনিক চন্দ্রচূড়, এই চন্দ্রচূড় নামের সহিত বঙ্কিমবাবুর চন্দ্রচূড়ের মিলন একটা দৈবী ঘটনা মাত্র।

বর্ত্তমান সময়ের স্রোতস্বতী মধুমতী নদীর নাম পূর্ব্বে বারাসিয়া ছিল এবং উহার তীরস্থ প্রকাণ্ড বাবুখালির কুঠিবাড়ীও পূর্ব্বে ছিল না। ঐ বারাসিয়া নদীতটে নন্দনপুর নামে একখানি গ্রাম ছিল। বারাসিয়া নদী ও নন্দনপুর গ্রাম এক্ষণে মধুমতী নদীর বিশাল উদরে বিলীন হইয়াছে। উদয়নারায়ণের সহিত তাঁহার দীক্ষাগুরু রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় রাঢ় হইতে ঐ নন্দনপুরে আসিয়া নবনিবাস নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

নন্দনপুরের নিকটস্থ ফ.লসা গ্রামে ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের এক ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহে চতুষ্পাঠী ছিল। তিনি শতাধিক ছাত্রকে ব্যাকরণ, সাহিত্য, স্মৃতি ও জ্যোতিষ পড়াইতেন। সেই চতুষ্পাঠীর ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

নন্দনপুর গ্রামের নিকটে ভাল ব্রাহ্মণ-সমাজ না থাকায় রামভদ্র নন্দনপুরে বাস করা অসুবিধা বোধ করিতেছিলেন। একদা রামভদ্র বাসের উপযুক্ত স্থানের অনুসন্ধানে ভ্রমণ করিতে করিতে গঙ্গারামপুরে উপস্থিত হইয়া প্রাতঃকালে প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে নবগঙ্গাকূলে পূজা আহ্নিকে নিমগ্ন ছিলেন। এই সময় এক প্রকাণ্ড শার্দ্দুল আসিয়া তাঁহার পৃষ্ঠদেশ লেহন করিতে ছিল। নদীগর্ভস্থ কুম্ভীরেরাও ব্রাহ্মণের প্রতি কোন আক্রমণ করিতেছিল না। রোসেন সা নামক এক ফকির গঙ্গারামপুরে বাস করিতেন। তিনি এই অমানুষিক ব্রহ্মতেজ সন্দর্শন করিয়া রামভদ্রকে গঙ্গারামপুরে বাড়ী করিতে বলেন এবং তিনি ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া যান। রোসেনের অনুরোধে গঙ্গারামপুরে পূর্ব্বমৃত ফকিরগণের সমাধিস্থলে তত্রত্য ভট্টাচার্য্যগণ অদ্যাপি প্রদীপ দিয়া থাকেন। সেই সমাধি স্থান কর্ষিত হইলে অনেক নর-কঙ্কাল বহির্গত হইয়াছিল *।

মধুসূদন বাবু লিখিয়াছেন, উক্ত ভট্টাচার্য্যবংশের রত্নেশ্বর কবি সার্ব্বভৌম সীতারামের দীক্ষাগুরু ছিলেন। আমরা সীতারামের গুরুগৃহের গুরুপঞ্জীগ্রন্থে ইহার কিছুই দেখিতে পাই না। মধুবাবু আমার পরিচিত বন্ধু, তিনি যে লোকের নিকট হইতে এই গুরুবংশের তালিকা ও সনন্দাদি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহার কথায় ও কার্য্যে আমাদের বিশ্বাস কমই আছে।

বিশেষতঃ হরিহরনগরে লক্ষ্মীনারায়ণের যে বংশধর আছেন, তাঁহারা গঙ্গারামপুরের ভট্টাচার্য্যদিগকে গুরুবংশ বলিয়া স্বীকার করেন না। আমাদের বোধ হয়, রামভদ্র সীতারামের পিতার গুরু ছিলেন। রত্নেশ্বর সীতারামের গুরু নহেন। সীতারামের পৈতৃক গুরুবংশ বলিয়া গঙ্গারামপুরের ভট্টাচার্য্য-বংশের প্রতি সীতারাম ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন।

একটী কিম্বদন্তী আছে যে, রত্নেশ্বর ও সীতারামের গুরু কৃষ্ণবল্লভের বিচার হয় এবং সেই বিচারে কৃষ্ণবল্লভ জয়ী হওয়ায় সীতারাম কৃষ্ণ-বল্লভকেই গুরু নির্ব্বাচন করেন।

প্রেমধর্ম্মবিতরণকারী ভক্তির পূর্ণ অবতার চৈতন্যদেবের পার্শ্বচর হরিদাস ঠাকুরের নাম বৈষ্ণব-সাহিত্যে প্রসিদ্ধ। তাঁহার উত্তরপুরুষেরা জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কাটোয়া মহকুমার অধীন ভাগীরথিতীরে টিয়া গ্রামে বাস করিতেন। কৃষ্ণবল্লভ ঠাকুরেরা চারি ভ্রাতা ছিলেন,—কৃষ্ণকিঙ্কর, কৃষ্ণবল্লভ, কৃষ্ণপ্রসাদ ও কৃষ্ণকান্ত। হঠাৎ বর্গীর অত্যাচারে টিঁয়া অঞ্চল বড় উৎপীড়িত হইয়াছিল। তাহারা সর্ব্বদা অপহরণ করিত, স্ত্রী-কন্যার সতীত্ব-ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিত, গৃহ অগ্নিসাৎ করিত ও সামান্য

বাধা পাইলে গৃহস্থের প্রাণনাশ করিত। বর্গীর আক্রমণকালে কৃষ্ণ-কিঙ্কর গোস্বামী তাঁহার বাটীতে স্থাপিত বিগ্রহ মদনমোহন রায়ের ভূষণ রক্ষা করিতে যাইয়া বর্গী হস্তে নিহত হন, তাহার পর কৃষ্ণপ্রসাদ স্বদেশ ছাড়িয়া স্থানান্তরে যাইবার অভিলাষী হইলে কপিলেশ্বরের ঘাটে সীতারামের সহিত তাঁহার যে আলাপ হয়, পাঠক পূর্ব্বেই তাহা অবগত আছেন। অনন্তর কৃষ্ণবল্লভ সপরিবারে যশোহর জেলার অন্তর্গত বিনোদপুরের নিকটস্থ ঘুল্লিয়া গ্রামে আসিয়া সীতারামকে সংবাদ প্রেরণ করিলেন। সীতারাম যত্নপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। সীতারাম কৃষ্ণবল্লভের নিকট দীক্ষিত হইতে অভিলাষী হইলেন। কৃষ্ণবল্লভের কায়স্থাদি জাতি শিষ্য নাই বলিয়া তিনি তাঁহাকে মন্ত্র দিতে অসম্মত হইলেন। সীতারাম তাঁহাকে নজরবন্দী ভাবে রাখিলেন। অনন্তর কৃষ্ণবল্লভ বাধ্য হইয়া তাঁহাকে মন্ত্র দিলেন। শূদ্রের দান লইতেন না বলিয়া কৃষ্ণবল্লভ সীতারামের নিকট হইতে পূর্ব্বে কোন দান গ্রহণ করেন নাই। মহম্মদপুরের নিকটবর্ত্তী যশপুর গ্রামের কিয়দংশ কৃষ্ণবল্লভের ভ্রাতা কৃষ্ণপ্রসাদের নামে বার্ষিক ২৪৲ টাকা কর ধার্য্য করিয়া জমা লইয়া ছিলেন। এই গুরুবংশ যশপুর ও ঘুল্লিয়া গ্রামে আছেন। গুরুপুত্র আনন্দচন্দ্র ও গৌরী-চরণকে সীতারাম অনেক নিষ্কর জমি দান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে মহম্মদপুরের নিকটবর্ত্তী ঝামা মহেশপুরের ১৫০ বিঘা ব্রহ্মত্র জমি মধুমতী নদী গ্রাস করিয়াছে। আনন্দচন্দ্র ও গৌরীচরণ ৮০০ আট শত বিঘা নিষ্কর জমি সীতারামের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার অধিকাংশ এক্ষণে তাঁহার উত্তরপুরুষের দখলে নাই। উক্ত ব্রহ্মত্র জমির

সনন্দাদি তাঁহাদের গৃহে আছে। গুরুকুলপল্লী ও উক্ত সনন্দ যশপুরের গোস্বামি গৃহে পাওয়া গিয়াছে। এই গুরুবংশে পরে রাধাবল্লভ, কৃষ্ণসুন্দর, নিত্যানন্দ ও সর্ব্বানন্দ গোস্বামী প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে নিত্যানন্দ অন্ধ ছিলেন। তিনি অন্ধাবস্থায় অলৌকিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এই বংশে এক্ষণে সর্ব্বানন্দের পুত্র বালক ভূদেব গোস্বামী জীবিত আছেন।

কোঠাবাড়ী ও গোকুল-নগরের ভট্টাচার্য্যবংশ সীতারামের পুরোহিত-বংশ। সীতারামের সময়ে এ বংশে অনেক অধ্যাপক ছিলেন। ইহারা বংশমর্য্যাদায় প্রধান বংশজ। ইহাদের অবস্থা এখন ভাল নয়। সীতারাম প্রদত্ত নিষ্কর ব্রহ্মত্র অনেকই নষ্ট হইয়াছে।

সীতারামের সময়ে ও তাঁহার পরে তদীয় পুরোহিতবংশে নিম্নলিখিত অধ্যাপকগণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন :—

মঙ্গলানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের দুই পুত্র—রতিদেব ও রঘুনাথ।

১ম রতিদেব ন্যায়বাগীশ	২য় রঘুনাথ বিদ্যাবাগীশ
|	|
রামদেব তর্কভূষণ	মহাদেব তর্কবাগীশ
|	|
১। কালিদাস সিদ্ধান্ত,	১। জয়রাম পঞ্চানন
২। রামদেব ন্যায়ালঙ্কার	২। সনাতন সিদ্ধান্ত
৩। শ্রীহরি বাচস্পতি	৩। রূপরাম বিদ্যালঙ্কার
৪। দুর্গারাম সার্ব্বভৌম	

শ্রীহরি বাচস্পতির চারি পুত্র—১ নন্দকিশোর ন্যায়ালঙ্কার, ২ রাঘবেন্দ্র তর্কালঙ্কার, ৩ রামচরণ বিদ্যালঙ্কার, ৪ রামকেশব পঞ্চানন।

জয়রাম পঞ্চাননের এক পুত্র, কৃষ্ণকিঙ্কর বিদ্যালঙ্কার। সনাতন সিদ্ধান্তের পুত্র রত্নগর্ভ সার্ব্বভৌম। শ্রীহরি বাচস্পতির ১ম পুত্র নন্দকিশোর ন্যায়ালঙ্কারের পুত্র মুকুন্দরামের ধারায় চন্দ্রকান্ত বিদ্যাভূষণ। রূপরাম বিদ্যালঙ্কারের ১ম পুত্র, ঘনশ্যাম তর্কালঙ্কার। ঘনশ্যামের দুই পুত্র, ১ম নন্দকুমার ন্যায়বাগীশ ও দ্বিতীয় প্রাণনাথ বিদ্যাবাগীশ। নন্দকুমার ন্যায়বাগীশের ১ম পুত্র রামচরণ ন্যায়পঞ্চানন।

ভাস্করানন্দ আগমবাগীশ নামে একজন পণ্ডিত সীতারামের সভায় আসা যাওয়া করিতেন। তাঁহার লিখিত কবিতা সীতারামের দেওয়ান যদু মজুমদারের গৃহে পাওয়া গিয়াছে। ভাস্করের লিখিত কাগজ দৃষ্টেও তাহা বিচক্ষণ প্রাচীন বোধ হয়। ভাস্করানন্দ পলিতা-নহাটার বৈদিক ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের একজন পূর্ব্বপুরুষ। বর্ত্তমান সময়ে যে গুরুচরণ ও শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা আছেন, ভাস্করানন্দ তাঁহাদিগের ঊর্দ্ধতন পঞ্চম পুরুষের একজন।

ভাস্করের কবিতা এই :—

"ভাস্করে উদয় ভাস, উদয়নারায়ণ দাস,
তনয় রাজেন্দ্র সীতারাম।
গুণেন্দ্র দেবেন্দ্র তথি, ভূ-অধিপতি,
ভূষণে ভূষিত গুণগ্রাম॥
কমলা রাজমহিষী, কমলবনের শশী,
কিঞ্চিৎ ভূমি দিতে কাড়িলেন রাঁ।
যুবরাজ শ্যামরায়, তিনিও সায় দিলেন তায়
দেওয়ান জীউ পাড়িলেন হাঁ।॥

বলরাম দাস মুন্‌সী সনন্দে পাড়িলেন মসি
তুষ্কপালে বামনে কপাল।
বাচস্পতির গোসা ছিল, কেমনে অমনি জাহির হ'ল,
রাণী চুপ—ভূপাল।

* * *

হাস কর ভাস্কর আনগে গোঁসাই।
ঝাট যাও মাত লাও রাণীকো ফুস্‌লাই!

* * *

লয়ে ঝি দেওয়ান জী গুরু মাইর ঠাঁই।
তারা মাই দিলেন ঠাঁই রাণীর কাছে যাই।

* * *

সন ১১১৬। ১৭ই জ্যৈষ্ঠ। শ্রীভাস্কর—বাগীশ।

উক্ত কবিতার অর্থ এই :—

পূর্ব্বদেশে সূর্য্যতুল্য উদয়নারায়ণ দাস, তাঁহার পুত্র সীতারাম রাজার রাজা। সীতারামের রাণী কমলা এত রূপবতী যে, যেমন শশী দেখিলে কমল সকল মুদিত হয়, সেইরূপ কমলার রূপেও অপর রাণীগণ মুদিত-প্রায় হন। রাণী কমলা কিছু জমি দিতে সম্মত হইলেন। দেওয়ানজীও তাহাতে সম্মত হইলেন। যুবরাজ শ্যামরায়ও তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। মুন্সী বলরাম দাসও সনন্দ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এমন সময়ে দৈবাৎ প্রকাশ হইয়া পড়িল যে, রাজার গুরুবংশীয় শ্রীরাম বাচস্পতি ভাস্করের প্রতি রুষ্ট। ইহাতে রাজা বিশেষ ক্রুদ্ধ হইলেন। কিয়ৎকাল পরে রাজার ক্রোধ হ্রাস হইলে তিনি বলিলেন, ভাস্কর তুমি

হাস্য কর, গোঁসাইকে যাইয়া লইয়া আইস। রাণীকে বলিয়া জমি লইও না। তৎপরে দেওয়ানজী তারামণি গুরুঠাকুরাণীর নিকট একজন দাসী পাঠাইয়া তাঁহার সম্মতি আনাইয়া পরে রাণীর নিকট পুনরায় যাওয়া হইল।

মহাদেব চূড়ামণি বাচস্পতির শ্লোকে সীতারাম ও তাঁহার সহচরগণের সহিত নিশানাথ ঠাকুর ও তাঁহার অনুচরগণের তুলনার কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে শ্লোকগুলি পাই নাই। অনুসন্ধানে জানিয়াছি, মহাদেব সীতারামের পুরোহিতবংশীয় একজন অধ্যাপক।

সীতারামের সময়ে ও তাঁহার পরে মহম্মদপুরের অন্তর্গত বাউইজানী ও ধুপড়িয়া গ্রামে নিম্নলিখিত পণ্ডিতগণ প্রাদুর্ভূত হন।

১। শ্রীনারায়ণ তর্কালঙ্কার,
২। রামরাম বাচস্পতি,
৩। রামনিধি বিদ্যাভূষণ,
৪। জয়নারায়ণ সিদ্ধান্ত,
৫। গৌরচন্দ্র বিদ্যাভূষণ,
৬। বলরাম তর্কভূষণ,
৭। হরচন্দ্র তর্কালঙ্কার,
৮। লক্ষ্মীকান্ত বিদ্যাভূষণ,
৯। শূরনারায়ণ তর্কালঙ্কার,
১০। রামকিঙ্কর তর্কপঞ্চানন,
১১। রামগোবিন্দ তর্কসিদ্ধান্ত,
১২। রবিদাস বিদ্যাবাগীশ,
১৩। দুর্গাচরণ শিরোমণি,
১৪। রামসুন্দর স্মৃতিরত্ন,
১৫। গৌরপ্রসাদ ন্যায়বাগীশ,
১৬। রামকুমার সিদ্ধান্ত।

ধুপড়িয়ার পণ্ডিতবর্গ।

১। পাঠকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য,
২। কালিদাস সিদ্ধান্ত,
৮। নিমানন্দ সরস্বতী,
৯। বিশ্বনাথ তর্কসিদ্ধান্ত,

৩। রামকেশব তর্কালঙ্কার,
৪। রামকৃষ্ণ পঞ্চানন,
৫। কালিকাপ্রসাদ বিদ্যাভূষণ,
৬। রামনারায়ণ ন্যায়লঙ্কার,
৭। রামেশ্বর তর্কপঞ্চানন,
১০। রামনাথ বাচস্পতি,
১১। রামকান্ত তর্কবত্ন,
১২। অনন্তরাম সার্ব্বভৌম,
১৩। কাশীনাথ তর্কন্যায়রত্ন।

সীতারামের রাজধানীতে অভিরাম সেন কবীন্দ্রশেখর প্রথমে কবিরাজ ছিলেন। তাঁহার চতুষ্পাঠীতে অনেক ছাত্র অধ্যয়ন করিত। তিনি কোন সময়ে রাজার অপ্রীতিকর রাজনৈতিক বিষয় লইয়া ছাত্রগণের সহিত বাদানুবাদ করায় সীতারাম তাঁহার প্রতি রুষ্ট হন। রাজকোপে অভিরাম বাধ্য হইয়া মহম্মদপুর নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক খান্দারপাড় যাইয়া বাস করেন। কলিকাতার লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিরাজ দ্বারকানাথ সেন কবি-রত্ন মহাশয় এই অভিরাম কবিরাজ মহাশয়ের বংশধর। সীতারামের সময়েই তারানাথ কবিভূষণ, পঞ্চানন কবিরত্ন, বিশ্বম্ভর রায়, যুধিষ্ঠির দাসগুপ্ত, মধুসূদন কর প্রভৃতি কবিরাজগণ মহম্মদপুরে অবস্থিতি করিতেন। মধুসূদন করের বংশধরগণ এক্ষণে সারুলিয়া গ্রামে বাস করেন।[২৭]

মৌলবী সামসুদ্দীন, নুরমালি, সাজাহান্‌আলী, কেতাব্দী ও এনাতুল্লা মহম্মদপুর রাজধানীতেই অবস্থিতি করিতেন। ইঁহাদের তিন জনের মোক্তাব (চতুষ্পাঠী) ছিল। অপর দুই জন কখন ভূষণায় ও কখন মহম্মদপুরে সীতানাথের সভায় মোক্তারি করিতেন।[২৮]

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রাজ্যস্থাপন সম্বন্ধীয় কিম্বদন্তী ও রাজ্য-স্থাপনের পদ্ধতি

সীতারামের রাজ্যস্থাপন সম্বন্ধে বহু কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। সে সকল কিম্বদন্তী কোন কোনটী অসার, অলীক ও রূপক অলঙ্কারমূলক হইলেও তাহা ষ্টুয়ার্ট, ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব ও সীতারামবিষয়ক প্রস্তাব-লেখকগণ তাঁহাদিগের পুস্তকে সন্নিবেশিত করায় আমরা তাহা একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারি না। আমরা সেই সকল কিম্বদন্তীর সহিত সীতারামের প্রকৃত জীবনচরিতের কি সম্বন্ধ আছে, তাহা দেখাইবার চেষ্টা পাইব। কিম্বদন্তীগুলি এই:—

১। নিম্নবঙ্গদেশে সীতারাম বলিয়া একজন ডাকাইত ছিলেন। তিনি ডাকাইতি করিয়া বহু অর্থসংগ্রহ করেন ও জমিদার হইতে যত্নবান্ হয়েন। ফৌজদার নবাবের আত্মীয় আবু তরাপকে সীতারামের লোকে নিহত করায় সীতারাম ধৃত ও বন্দীকৃত হন; এবং নবাবের আদেশে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়।

২। সীতারামের হরিহর নগরে তালুক ও শ্যামনগরে একটী জোত ছিল। একদিন তিনি অশ্বারোহণে গমনকালে নারায়ণপুর গ্রামে তাঁহার অশ্বক্ষুরে একটী ত্রিশূল বিদ্ধ হয়। যে স্থলে ত্রিশূল বিদ্ধ হয়, সেইস্থান খনন করিয়া সীতারাম এক লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ লাভ করেন। সীতারাম

সেই দেবতার দাস, দৈব ইচ্ছা যে তিনি রাজ্য স্থাপন করেন, এই কথা প্রকাশ করায় দলে দলে লোক তাঁহার অধীনে আসিতে থাকে এবং তিনি ফকিরের আদেশে নারায়ণপুরের নাম মহম্মদপুর রাখিয়া রাজা হইয়া উঠেন।

৩। বঙ্গদেশে বারজন ভূয়া উপাধিধারী জমিদার ছিলেন। তাঁহারা দিল্লীর রাজস্ব বন্ধ করিয়াছিলেন। এই সময় সীতারাম দিল্লী হইতে তাহাদিগকে দমন করিতে আসেন এবং তাঁহাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া নিজে রাজা হন ও দিল্লীর প্রাপ্য কর বন্ধ করেন।

৪। সীতারাম দিল্লীতে চোপদার ছিলেন। বঙ্গদেশের রাজস্ব নিরাপদে আদায় হইত না। সায়েস্তা খাঁ ও আজিমওসান প্রভৃতি নবাবগণ রাজস্ব আদায়ে বিশেষ দক্ষ ছিলেন না। মুর্শিদকুলী খাঁ বাঙ্গালা, বিহার উড়িষ্যার নবাবের অধীনে দেওয়ান ও সীতারাম সাঁজোয়াল হইয়া আসেন। সীতারাম নিম্নবঙ্গ অঞ্চলে কর আদায়ে দক্ষতা দেখাইলে নলদী পরগণা জায়গীর পান ও পরে নিজেও সম্রাটের প্রাপ্য কর বন্ধ করেন।

৫। সীতারামের পাতা সাঁতৈরের রাজা শত্রুজিৎকে ধরিতে আসেন। তাঁহাকে বন্দী করিয়া দিল্লীতে লইয়া যান। সেখানে সীতারামের পিতা উদয়নারায়ণ মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। সীতারাম পিতার সহিত দিল্লীতে ছিলেন। তাঁহাকে নানা বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়। একদিন রাত্রিতে সীতারাম স্বপ্নে দেখেন, তিনি রাশি রাশি দগ্ধমৃত্তিকা ভক্ষণ করিতেছেন। পোড়া মাটী স্বপ্নে দেখার ফল রাজপ্রসাদ ও রাজ্যলাভ। অনন্তর সীতারাম বঙ্গদেশে আবাদী সনন্দ পাইয়া আইসেন।

৬। সীতারাম ডাকমন্ত্র জানতেন। ডাকমন্ত্রের কার্য্য এই যে তাহার প্রভাবে ভূগর্ভে প্রোথিত ধনের অনুসন্ধান পাওয়া যায়। সীতারাম মন্ত্রবলে ভূগর্ভের গুপ্তধন পাইয়া রাজা হয়েন।

৭। সীতারাম ভাগ্যবান্ পুরুষ। যেখানে যে গুপ্তধন থাকিত, তাহারা ডাকিয়া সীতারামকে উঠাইয়া লইতে বলিত। সীতারাম সেই সকল ধন পাইয়া রাজা হয়েন।

৮। এক ফকির সীতারামকে স্নেহ করিতেন। তিনি সীতারামের হাত ও কপাল দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি রাজা হইবেন। সীতারাম ফকিরের কথায় বিশ্বাস করিয়া রাজ্যস্থাপনের চেষ্টা করেন এবং তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হয়।

৯। সীতারাম মুর্শিদাবাদ হইতে গঙ্গাস্নান করিয়া নৌকাপথে বাড়ী আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণের সহিত গঙ্গাবক্ষে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি সীতারামের করকোষ্ঠী গণনা করিয়া বলেন, সীতারাম রাজা হইবেন। সীতারাম সেই ব্রাহ্মণের মন্ত্রশিষ্য হয়েন এবং সেই ব্রাহ্মণপ্রদত্ত মন্ত্রবলে তিনি রাজ্যলাভ করেন।

১০। সীতারাম স্বপ্নে দেখেন, তিনি এক রক্তময়ী পুষ্করিণীতে সন্তরণ করিতে করিতে উষ্ণরক্ত পান করিতেছেন। রক্তপান স্বপ্নে দেখার ফল প্রচুর অর্থলাভ। এই স্বপ্নদর্শনের কিছুদিন পরে তিনি যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার জন্য দিল্লীতে গমন করেন। দিল্লী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে তিনি ভাগীরথী মধ্যে এক লৌহ বাক্সপূর্ণ স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হয়েন। সেই অর্থদ্বারা তিনি সৈন্যসামন্ত রাখেন এবং রাজা হয়েন।

১১। সীতারামের কোন আত্মীয়ের বাটীতে রাত্রিযোগে ডাকাইত

আসিয়া পৈশাচিক অত্যাচার করে। সীতারাম তদ্দর্শনে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়া দস্যুদমনে অভিলাষী হয়েন। তিনি ঢাকায় যাইয়া নবাব-ভবনে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করেন ও বঙ্গেশ্বরের অনুমত্যানুসারে তৎকালের বঙ্গদেশের দস্যুদল দমন করিয়া পরে স্বয়ং রাজা হন।

১২। সীতারাম একদিন কোন আত্মীয়ের বাটীতে উপস্থিত ছিলেন। এমন সময়ে সেই আত্মীয়ের গ্রামে মগ, পর্ত্তুগীজ ও আসামী দস্যু প্রবেশ করে। তাহারা তত্রত্য যুবতীগণের ধর্ম্মনষ্ট করে, ধনরত্ন অপহরণ করে, গ্রাম অগ্নিসাৎ করে ও অনেকগুলি যুবক যুবতী বালকবালিকা ধরিয়া লইয়া গ্রামান্তরে চলিয়া যায়। সীতারাম এক কূপে পলাইয়া গিয়া আত্মরক্ষা করেন এবং প্রতিজ্ঞা করেন যে, বঙ্গদেশের এই আক্রমণকারীগণকে যে উপায়েই হউক দমন করিবেন [২৯]

১৩। সীতারামের এক মাতুল রাঢ়দেশ হইতে ভূষণা অঞ্চলে তাঁহার মাতাকে দেখিতে আসিতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে কিছু বহুমূল্য বস্ত্র ও কেবল পাথেয় জন্য কিছু অর্থ ছিল। বর্ত্তমান নদীয়া জেলার পূর্ব্বাংশে দস্যুগণ তাঁহাকে নিধন করে। সীতারাম মাতার ইচ্ছায় যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করেন এবং তাঁহার মাতা মৃত্যুশয্যায় সীতারাম ও লক্ষ্মীনারায়ণ দ্বারা প্রতিজ্ঞা করাইয়া লয়েন যে, তাঁহারা আজীবন দস্যুদমনে যথাসাধ্য যত্ন করিবেন। দস্যুদলন করিয়াই সীতারাম রাজা হন।

প্রথম কিম্বদন্তী ষ্টুয়ার্ট সাহেব পারসিক গ্রন্থ হইতে অনুবাদ করিয়াছেন। নবাবের আত্মীয় আবুতরাপ সীতারাম-কর্ত্তৃক নিহত হওয়ায় নবাব সীতারামকে দস্যু-তস্কর যাহা ইচ্ছা বলিয়া দিল্লীতে পত্রপ্রেরণ করিতে পারেন। দিল্লীর পারসিক গ্রন্থলেখক সীতারামের গুণগ্রাম

অপরিজ্ঞাত থাকায় নবাবের পত্র দৃষ্টেই সীতারাম কাহিনী বর্ণন করিয়াছেন। দ্বিতায়, তৃতীয় কিম্বদন্তী ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব শুনিয়া লিখিয়াছিলেন। তিনি আরও এক পত্রে লিখিয়াছেন[৩০] যে, এই সকল কিম্বদন্তীরই আরও অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় হইতে অপর সকল কিম্বদন্তীরই মূলে কিছু সত্য আছে। সময়ের দূরতায় ও লোকপরম্পরায় মুখে মুখে এই সকল কথা প্রচারিত হওয়ায় ঘটনা কল্পনায় মিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। সীতারামের পিতা ভুষণা অঞ্চলের সাঁজোয়াল ছিলেন। সীতারাম দিল্লী হইতে আবাদী সনন্দ পাইয়াছিলেন। বঙ্গের বারজন ডাকাইতকে সীতারাম দমন করিয়াছিলেন।

বারভূঁয়ার মধ্যে কাহারও কাহারও জমিদারী সীতারাম জয় করিয়া লইয়াছিলেন। সীতারাম অনেক দীঘী পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন। তিনি দুই এক স্থানে ভূগর্ভে গুপ্তধন পাইলেও পাইতে পারেন। তাঁহার মাতামহ গৃহে ডাকাইত পড়িয়াছিল। সীতারাম রাজা হইবার পূর্ব্বে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। কৃষ্ণবল্লভ গোস্বামী সীতারামের মন্ত্রদাতা নূতন গুরু হইয়াছিলেন। মহম্মদ আলি ফকির সীতারামের নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। পরম যত্নসহকারে সীতারাম মহম্মদপুরে ইষ্টকালয় নির্ম্মাণপূর্ব্বক লক্ষ্মীনারায়ণবিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন এই সকল সত্য ঘটনা কল্পনার সহিত মিশ্রিত হইয়া উল্লিখিত কিম্বদন্তী সকল এতদ্দেশে প্রচারিত হইয়াছে।

সীতারাম দিল্লী হইতে আবাদী সনন্দ আনিয়া স্বীয় বেলদার সৈন্যসংখ্যা দ্বাবিংশ সহস্র পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ইহারা সময়ে

সময়ে পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি কার্য্যও করিত। যুদ্ধ বাধিলে ইহারা পদাতিক সৈন্যের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। ইহারা ঢাল, সড়কি, অসি ধনুর্ব্বাণ ও গুলাল বাঁশ লইয়া যুদ্ধ করিতে পারিত। পূর্ব্বে যে দ্বাদশ জন দস্যু নিবারণের কথা লিখিত হইয়াছে, সেই কার্য্যেও এই সকল সৈন্যগণ বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। সীতারাম প্রথম প্রথম বেতনভোগী বেলদার সৈন্য রাখিতেন। যৎকালে সীতারামের শাসনাধীনে বিস্তীর্ণ জমিদারী আসিল, তখন তিনি আর বেতনভোগী বেলদার রাখিতেন না। অধিকাংশ বেলদার নমঃশূদ্র জাতীয় ছিল। এই সকল নমঃশূদ্রগণ সকলেই সীতারামের জমিদারী মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করিত। সীতারাম তাহাদিগকে কৃষিকার্য্যোপযোগী লাঙ্গল ও গরু ক্রয় করিয়া দিয়া চাকরাণ ভূমি দান করেন। পূর্ব্বের যে বেলদারকে ভ্রাতৃবিহীন অর্থাৎ একাকী দেখা গেল, সে কর দিয়া ভূমি লইয়া কেবল কৃষিকার্য্যই করিতে লাগিল। যে সকল বেলদারের একাধিক ভ্রাতা ছিল, তাহারা বেলদারী ও কৃষকের কার্য্য করিতে লাগিল। কোনও বেলদারকে উপর্য্যুপরি তিনমাসের অধিক বেলদারী করিতে হইত না। যে সকল বেলদারেরা দুই ভ্রাতা ছিল, তাহাদিগকে বৎসরে তিনমাস; যাহারা তিন ভ্রাতা তাহাদিগকে বৎসরে সাড়ে চারি মাস এবং যাহারা চারি ভ্রাতা, তাহাদিগকে বৎসরে ছয় মাস বেলদারী করিতে হইত। অর্থাৎ প্রত্যেক ভ্রাতার বৎসরে ১৷৷০ দেড়মাস কার্য্য করিতে হইত। প্রত্যেক বেলদার তাহার তিন মাসের কার্য্যের জন্য ২৪ চব্বিশ ইঞ্চি হাতের ৮১ একাশী হাতে যে বিঘা হয়, তাহার ৬/ বিঘা জমি নিষ্কর পাইত। এতদ্ব্যতীত তাহারা সীতারামের ব্যয়ে খোরাকী পাইত। তিন মাস অন্তর বাটী

যাইবার সময় প্রত্যেক বেলদারকে একখানা করিয়া নূতন বস্ত্র ও শীতকালে তাহাদের প্রত্যেককে দুইখানি করিয়া কম্বল দিবার ব্যবস্থা ছিল। অমাবস্যা ও পূর্ণিমার দিনে বর্ত্তমান সময়ের রবিবারের ছুটীর ন্যায় বেলদারগণ ছুটী পাইত। প্রত্যেক পর্ব্বের দিনে তাহাদিগকে এক বেলার অধিক কার্য্য করিতে হইত না।"

সীতারাম তাঁহার জমিদারীর জলশূন্য স্থানসমূহে দীঘী পুষ্করিণী খনন করাইতেন। নূতন রাস্তা ঘাট প্রস্তুত করাইতেন। যে সকল স্থানে গোলা, গঞ্জ, বাজার বা বন্দর না থাকিত, তিনি তথায় গোলা, গঞ্জ ও বাজার বসাইতেন। কোন স্থানে দেবালয় না থাকিলে অধিবাসীগণ বৈষ্ণব হইলে, রাধাকৃষ্ণের কোন মূর্ত্তি, শাক্ত হইলে শক্তিমূর্ত্তি ও মুসলমান মান হইলে দরগা বা মসজিদ স্থাপন করিতেন। ব্যাঘ্র, বরাহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুপূর্ণ বন থাকিলে, তাহাদিগকে বধ করিয়া বন পরিষ্কার করিয়া দিতেন। পর্ত্তুগীজ, মঘ বা আসামীগণের আক্রমণের ভয় থাকিলে তাহা নিবারণের সুবন্দোবস্ত করিতেন। এইরূপে সীতারাম প্রজার সকল অভাব দূর করিতেন। কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যের সুবিধা করিয়া দিতেন। কোন গ্রামে নাপিত, ধোপা, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, স্বর্ণকার প্রভৃতির অভাব থাকিলে, তাহা ভিন্ন গ্রাম হইতে আনাইয়া বসবাস করাইতেন।

সীতারাম আবওয়াব বা উচ্চহারে কর আদায়ের চেষ্টা করিতেন না। প্রজার অবস্থা বুঝিয়া প্রজাগণকে বিপদাপদে কর হইতে নিষ্কৃতি দিতেন। তিনি তাহাদিগের পুত্রকন্যার বিবাহ, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন ও পিতৃমাতৃ-শ্রাদ্ধে প্রয়োজন মত সাহায্য করিতেন। প্রজাগণের ইচ্ছানুসারে তিনি কর নগদ টাকায় বা শস্য দ্বারা আদায় করিতেন। দুর্ভিক্ষাদির

আশঙ্কায় বহু স্থানে তাঁহার সর্ব্বপ্রকার শস্য সঞ্চিত থাকিত। তিনি স্বয়ং তাঁহার জমিদারীর সর্ব্বত্র পর্য্যটন পূর্ব্বক প্রকৃতিপুঞ্জের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতেন। নানাগুণে তাঁহার প্রজাগণ তাঁহাকে ভালবাসিত, শ্রদ্ধা করিত এবং অন্য জমিদারের জমিদারীর মধ্যে কুটুম্বাদির গৃহে গমন করিলে তাঁহার অশেষ প্রশংসা করিত। তিনি তাঁহার প্রজাগণের মধ্যে গুণী, জ্ঞানী এবং শিল্পী প্রভৃতি দেখিলে তাঁহাদিগকে যথেষ্ট পুরস্কার দিয়া উৎসাহিত করিতেন।

সীতারামের প্রকৃতিপুঞ্জের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি দেখিয়া অন্য জমিদারগণেব প্রজাপুঞ্জ সীতারামের প্রজা হইতে ইচ্ছা করিত। তাহাদিগের জমিদার অত্যাচারী অথবা উৎপীড়নকারী হইলে তাহারা আসিয়া সীতারাম মেনাহাতী ও কর্ম্মচারীগণের নিকট তাহাদের দুঃখ জানাইত। কোন কোন জমিদারের প্রজাগণ অত্যধিক উৎপীড়িত হইলে সীতারামের কর্ম্মচারীগণের সহিত ষড়্যন্ত্র করিবার প্রয়াস পাইত। স্থূলকথা, সীতারামের জমিদারীর চতুর্দ্দিকে অত্যাচার, উৎপীড়ন, অবিচার, অন্যায়-পূর্ব্বক রাজস্ব আদায় এবং অন্যের আক্রমণ প্রভৃতির অনল ধূধূ করিয়া জ্বলিতেছিল। সেই সকল প্রজাপুঞ্জ সীতারামকে শান্তির স্নিগ্ধ সলিলের উৎপত্তিস্থানস্বরূপ পর্ব্বতরাজ হিমালয় বোধে তাঁহার শরণাপন্ন হইতে অভিলাষী হইত। বুদ্ধিমান প্রজামাত্রই সগরবংশীয় ভগীরথের ন্যায় শান্তির গঙ্গার ধারা লইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া সীতারামের তপস্যা করিত। কাল সহকারে তাহাদের তপস্যার ফল ফলিল। সীতারামের সুনিয়ম ও সুপালন গুণে তাঁহার জমিদারী-বৃদ্ধির সুন্দর পন্থা সহজেই আবিষ্কৃত হইয়া পড়িল। বলে অর্জ্জিত অপেক্ষা গুণে

অৰ্জ্জিত রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ় হয়। ভয়ের বন্ধন অপেক্ষা ভক্তির বন্ধন বড় কঠিন। অশেষ গুণে সীতারাম চতুর্দ্দিক্ হইতে ভক্তির আন্তরিক পুষ্পাঞ্জলি লাভ করিতে লাগিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সীতারামের রাজ্যবিস্তার, পরিমাণ, রাজস্ব ইত্যাদি

যৎকালে সীতারাম অকাতরে নির্ভয়ে কঠোর পরিশ্রম করিয়া দীর্ঘকালে নিম্নবঙ্গের পাপস্বরূপ দ্বাদশদস্যুর পৈশাচিক অত্যাচার নিবারণ করিয়া নবাব সকাশে ও দেশে অতুলনীয় যশোলাভ করিলেন ;—তাঁহার নিজের জমিদারীর সর্ব্বত্র তাঁহার প্রকৃতিপুঞ্জের অভাব ও অসুবিধা দূর করিয়া তাহাদিগের সুখসমৃদ্ধি ও শিক্ষার সুব্যবস্থা করিলেন,—তাঁহার প্রজাপুঞ্জ সুনিয়মে ও সুশাসনে থাকিয়া বংশে, যশে ও ধনৈশ্বর্য্যে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাঁহার জমিদারীর মধ্যে শান্তির সুরভি, সুবিমল মলয়ানিল প্রবাহিত হওয়ায় প্রকৃতিপুঞ্জের প্রফুল্লতার চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। তখন পার্শ্ববর্ত্তী জমিদারগণের উৎপীড়নে শত্রুর আক্রমণে উৎকণ্ঠিত হৃতসর্ব্বস্ব বিবাদকালিমা-কলঙ্কিত নিরাশাহৃদয় সংক্ষুব্ধ শ্রীহীন প্রজাগণ সীতারামের প্রতি ঘন ঘন সতৃষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিত লাগিল। তাহাদিগের প্রতিবেশীর দিন দিন উন্নতিশীল অবস্থা ও তাহাদিগের দুরবস্থা তুলনা করিয়া তাহাদিগের বিষাদ গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে লাগিল। তাহাদিগের নৈশ সভায় সীতারামের গুণগ্রাম পর্য্যালোচিত হইতে লাগিল। নদীতীরে বা পুষ্করিণীর স্নান ঘাটে, ঢেকিশালায়, বিবাহভবনে, অপরাহ্লিক শিল্পানুষ্ঠানের

অধিবেশনগৃহে, নারীসভায় সীতারামের প্রজাপুঞ্জের সুখসমৃদ্ধি বর্ণিত হইতে লাগিল। কৃষিক্ষেত্রে কৃষকদল উচ্চরবে সীতারামের কীর্ত্তিসঙ্গীত উন্মুক্ত বায়ুতে বিমিশ্রিত করিতে লাগিল। পল্লীস্থ বালকদল করতালি দিয়া সীতারামের কীর্ত্তিগাথা গাইতে লাগিল। বৈরাগিগণ বৈষ্ণবী সঙ্গে সীতারাম সম্বন্ধে নূতন নূতন সঙ্গীত প্রণয়ন করিয়া ও তাহা গাইয়া অধিক ভিক্ষা লাভ করিতে লাগিল।

ফকিরদল সীতারামের প্রশংসাসূচক নূতন নূতন ছড়া প্রস্তুত করিয়া উপার্জ্জনের পথ পরিষ্কৃত করিতে লাগিল। প্রজাগণ দলে দলে সীতা-রামকে ভূস্বামিরূপে পাইবার জন্য কল্পনা করিতে লাগিল। কোথায় বা কল্পনা সদুপায়ে উঠিতে লাগিল এবং কোথাও কল্পনা ষড়যন্ত্রে অবতরণ করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিক্ হইতে সীতারামকে জমিদাররূপে গ্রহণ করি-বার আহ্বানের সুসংবাদ আসিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে দলে দলে প্রজা-গণও সীতারামের করুণ কটাক্ষের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। পরিশেষে তাহারা জিদ করিয়া সীতারামকে ভূস্বামিত্বে বরণ করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের দুঃখের কাহিনী বর্ণন করিয়া সীতারামের করুণ হৃদয় দ্রবীভূত করিয়া ফেলিল।

সর্ব্বপ্রথমেই ভূষণার মুকুন্দ রায়ের ছয় পুত্রের বংশধরগণের জমিদারীর প্রতি সীতারামকে হস্তক্ষেপ করিতে হইল। মুকুন্দরামের ছয় পুত্রের বংশধরগণের মধ্যে সর্ব্বদাই বিবাদ হইত। প্রজাগণ এক শরীকের বাধ্য হইলে অপর শরীক তাহাদিগকে নির্য্যাতন করিত। শরীকদিগের মধ্যেও দুর্ব্বল প্রবল উভয়ই ছিল। সে সময়ে আইন আদালতের আশ্রয় লওয়া হইত না। নবাব ও ফৌজদারের সহায়তা প্রবলপক্ষই পাইতেন।

মুকুন্দ রায়ের উত্তর-পুরুষের দুর্ব্বল পক্ষ শরীকগণ সীতারামের সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। সীতারাম দুর্ব্বলপক্ষের সহায়তা করিলে প্রবল পক্ষের সহিত তুমুল বিবাদ বাধিল। প্রবল পক্ষের লোকেরা কেহ পলায়ন করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন, কেহ বা সীতারামের অধীনতা স্বীকার করিয়া মহম্মদপুরে থাকিয়া গেলেন। কেহ বা ভূষণার ফৌজদারের নিকটে যাইয়া পদাতিক ঢালী সৈন্যের পদ ও সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিলেন। ইহাদের নিকট হইতে সীতারাম পোক্তানি, রোকণপুর, রূপাপাত এবং রশুলপুর পরগণা প্রাপ্ত হইলেন। তিনি উক্ত বংশীয় পরমানন্দ নামক এক ব্যক্তির নিকট হইতে মকিমপুর পরগণা লাভ করেন। পরমানন্দের বংশধরগণ এক্ষণে যশোহর জেলার অন্তঃপাতী নড়াল মহকুমার অধীন ইতনা গ্রামে বাস করিতেছেন। দৌলত খাঁ পাঠানের নশিব ও নসরৎ নামে দুই পুত্র ছিল। তিনি মৃত্যুকালে তাঁহার জমিদারীর অর্দ্ধেক নশিবকে নসীবসাহি পরগণা নামে দিয়া ও অপরার্দ্ধ নসরৎকে নসরৎসাহী পরগণা নাম দিয়া প্রদান করেন। এই দুই পরগণা পরে নশিব ও নসরতের উত্তরাধিকারীর মধ্যে নশিব সাহী ও বেলগাছি এবং নসরৎ সাহী ও মহিমসাহী পরগণায় বিভক্ত হয়। দৌলতের উত্তরাধিকারিগণের মধ্যেও বহু শরীক হইয়া তাঁহারা গৃহবিবাদে প্রবৃত্ত হন। গৃহবিবাদসূত্রে উক্ত চারি পরগণাও সীতারামের হস্তগত হয়। সাহা উজিয়াল পরগণা সমাদ্দার উপাধিধারী এক ব্রাহ্মণের দখলে ছিল। জনার্দ্দন সমাদ্দারের মৃত্যু হইলে তদীয় পত্নীর সহিত জ্ঞাতি-ভ্রাতা ভগবানের বিবাদ বাধে। এই বিবাদসূত্রে বিধবার আহ্বানে সাহা উজিয়াল পরগণা সীতারামের শাসনাধীনে আইসে। জনার্দ্দনের অধীনস্থ মিঠাপুকুর ও

সান-পুকুর নামে দুইটী পুষ্করিণী এখন আমতৈল গ্রামে রহিয়াছে। তেলি-হাটী পরগণা এক নাবালকের সম্পত্তি ছিল। মগ ও পর্ত্তুগীজ আক্রমণে উৎপীড়িত হইয়া প্রজাগণ সীতারামের সহায়তা গ্রহণ করে এবং তদুপলক্ষে এই পরগণা সীতারামের তত্ত্বাবধানে আইসে।

খড়েরা পরগণায় ব্যাঘ্র ও কুম্ভীরের ভয়ে অল্প লোকে বাস করিত। এই পরগণা পূর্ব্বে যশোহরের স্বাধীন রাজা প্রতাপ-আদিত্যের ছিল। তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার কর্ম্মচারী সম্ভ্রান্ত বৈদ্যবংশীয় রায়চৌধুরী উপাধিধারী জানকীবল্লভ নামক এক ব্যক্তি প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের সময়ে এই পরগণার অবস্থা অতি শোচনীয় হইলে সীতারাম ইহার উন্নতি করেন ও বৈদ্যবংশীয় রায়চৌধুরিগণ ও নলদার কায়স্থজাতীয় জমিদারগণ সীতা-রামের অধীনে এই পরগণার মালেক থাকেন। সে সময় গৃহনির্ম্মানের বাঁশ ও খড় এস্থানে জন্মিত না। সীতারাম এ স্থানে প্রজা পত্তন করিয়া করিয়া মহম্মদপুর হইতে বাঁশ ও খড় যোগাইয়া ছিলেন। যাহারা খড় লইয়া গিয়াছিল, তাহাদিগকে লোকে খড়োরা বলিত। তদবধি তাহারা সীতারামকে বলিয়া পরগণার নাম খড়োরা রাখে। বর্ত্তমান সময়ে স্থানীয় লোকে এই পরগণাকে খড়োড়ি ও। বলে। খড়োরা পরগণা সীতা-রামের নিজের পত্তন। এই সময়ে এই পরগণার পূর্ব্বনাম সুলতানপুর ছিল, পরিবর্ত্তিত হইয়া খড়েরা হয়। খড়েরার অনেক দক্ষিণে চিরুলিয়া পরগণায় দেবকীনন্দন বসু নামক একজন জমিদার ছিলেন। প্রজাপীড়ন দোষে সীতারাম তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করেন। দেবকীনন্দন স্বীয় জমিদারী পুনরায় বন্দোবস্ত করিয়া লইবার জন্য মহম্মদপুরে আসিলেন। তিনি মহম্মদপুরের নিকটবর্ত্তী ধূলঝুড়ি গ্রামে থাকিয়া

যান। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার উত্তর পুরুষগণ ধুলঝুড়িতে বাস করিতেছেন। এই বংশে ইন্দুভূষণ, তারাপ্রসন্ন, হরলাল ও হরিচরণ বসু প্রভৃতি ব্যক্তি অদ্যাপি জীবিত আছেন। নলডাঙ্গার রাজবংশের মহম্মদসাহী পরগণার কিয়দংশ সীতারাম হস্তগত করিলে পর, এই রাজবংশের সহিত সীতারামের সদ্ভাব হয়। মহম্মদপুর পরগণার মধ্যে একাধিক সীতারামপুর গ্রাম আছে। অনেকে বলেন নন্দাইলের শচীপতির স্বাধীনতা-অবলম্বন সীতারামের পরামর্শ-ক্রমেই হইয়াছিল। সমুদ্র-তীরবর্ত্তী রামপাল নামক স্থান সীতারাম জয় করিতে গেলে যশোহরের চাঁচড়ার রাজা ভবেশ রায়ের বংশীয় মনোহর রায় সীতারামের রাজধানী মহম্মদপুব আক্রমণ করিতে আসেন। এই মনোহর রায়ের সহিত কৃষ্ণনগরের রাজা রামচন্দ্রের বিবাদ হয়। রামচন্দ্র ইংরাজ বণিকের সহায়তা গ্রহণ করেন। সীতারামের অনুপস্থিতির সুযোগ অবলম্বনে মনোহর মহম্মদপুরনগর আক্রমণার্থ বুনাগাতি পর্য্যন্ত আসিয়া ছাউনি করিলেন। সীতারামের দেওয়ান যদুনাথ মজুমদার বহু সৈন্য ও কালে খাঁ, ঝুম্‌ঝুম্ খাঁ নামক দুইটী বড় কামান ও ৩০টী পুরাতন কামান লইয়া কুল্লে পর্য্যন্ত গমন করেন। তিনি কটকী নদী হইতে চিত্রা নদী পর্য্যন্ত এক বৃহৎ খাল কাটাইয়া উভয় সৈন্যের মধ্যে এক বৃহৎ পয়ঃপ্রণালী ব্যবধান করেন। মনোহর যোগাড়যন্ত্র দেখিয়া স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যা-বর্ত্তন করেন। সীতারাম দেওয়ান যদুনাথের নামানুসারে এই খালের নাম যদুখালী রাখেন। যদুখালীর খাল ও বুনাগাতির কেল্লার মাঠ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। এই আক্রমণে মির্জ্জানগরের ফৌজদার নুর

উল্লা মনোহরের সাহায্য করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, সীতারাম ২২টী এবং কাহারও মতে ৪৪টী পরগণার রাজা ছিলেন।

তাঁহার বিজিত পরগণার যে যে জমীদার তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে তিনি স্ব স্ব জমিদারীতে করদ রাজার স্বরূপ পুনঃ স্থাপন করিয়াছিলেন। ভাস্কর বাগীশের কবিতার "গুণেন্দ্র রাজেন্দ্র তথি" শ্লোকাংশ হইতে তাহা প্রতিপন্ন হয়। আমরা সীতারামের অধিকারভুক্ত ৪৪ পরগণার নাম পাই নাই, কিন্তু তাঁহার অধিকারভুক্ত বাইসের অধিক পরগণার নাম পাইয়াছি। সীতারামের অধিকারভুক্ত পরগণাগুলির নাম এই :—

পরগণার নাম			যে জেলা বা মহকুমার মধ্যে
১ নল্‌দী	...	...	যশোহর, নড়াল ও মাগুরা
২ সাঁতৈর	...	...	যশোহর ও ফরিদপুর
৩ মকিমপুর	...	...	ঐ
৪ তেলিহাটী	...	...	ফরিদপুর
৫ রশুলপুর	...	...	যশোহর ও নড়াল
৬ ইসুপপুর	...	...	খুলনা ও যশোহর
৭ সাহা উজিয়াল	...		নদিয়া, কুষ্টিয়া, যশোহর, মাগুরা ও ঝিনাইদহ
৮ এম্‌দাদ্‌পুর	...	...	যশোহর ও বনগ্রাম
৯ নসরৎসাহী	...	...	যশোহর, ফরিদপুর ও নদীয়া
১০ নশিবসাহী	...	...	ফরিদপুর ও নদীয়া
১১ মহিমসাহী	...	...	যশোহর ও ফরিদপুর
১২ বেলগাছি	...	...	ফরিদপুর, নদীয়া, কুষ্টিয়া

পরগণার নাম			যে জেলা বা মহকুমার মধ্যে
১৩ ধুলদি	...	...	ফরিদপুর
১৪ হাউলি	...	...	ঐ
১৫ হাকিমপুর	...	...	ঐ
১৬ তপ-বিনোদপুর	...	...	ঐ
১৭ সাহপুর	...	...	ঐ
১৮ পোকৃতানি	...	..	ফরিদপুর ও খুলনা
১৯ রোকনপুর	...	...	যশোহর ও ফরিদপুর
২০ খড়েরা	...	...	খুলনা
২১ চিরুলিয়া	...	...	খুলনা, বরিশাল
২২ আকুযানি	....	..	ফরিদপুর
২৩ রামপাল	...	...	বরিশাল ও খুলনা
২৪ জয়পুর	...	...	যশোহর ও বনগ্রাম
২৫ মকৃজাইগীর	...	...	নদীয়া, কুষ্টিয়া
২৬ হিংলি	...	...	নদীয় ও যশোহর
২৭ ভড় ফতেজঙ্গপুর	...	...	যশোহর, মাগুরা, নদীয়া, কুষ্টিয়া
২৮ ফতেয়াবাদ	...	...	বরিশাল
২৯ রূপাপাত	...	...	ফরিদপুর, বরিশাল

এই সকল পরগণা ও যে যে পরগণার আমরা নাম পাই নাই, সর্ব্ব-সমেত পরিমাণে ৭০০০ বর্গমাইল হইবে। বর্ত্তমান সময়ের ৩৷৷০ টী জেলার পরিমাণের সমান।

নাটোরাধিপতি রঘুনন্দনের জমিদারীর যখন বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক

রাণী ভবানীর আমলে রাজস্ব নির্দ্ধারিত হয়, তখন তাঁহার জমিদারীর গভর্ণমেণ্ট রাজস্ব ৫২৫৩০০০৲ হয়। সীতারামের সমস্ত জমিদারী রঘুনন্দন পান নাই। অর্দ্ধেক পরিমাণে সীতারামের জমিদারী রঘুনন্দনের হস্তগত হইয়াছিল সীতারামের অর্দ্ধেক জমিদারী রঘুনন্দনের মোট জমিদারীর মধুবাবুর অনুমানানুযায়ী ⅔ অংশ হইবে। সুতরাং সীতারামের অর্দ্ধাংশ জমিদারীর গভর্ণমেণ্ট রাজস্ব প্রায় ৩৫০০০০০৲ টাকা; এ মতে সীতারামের মোট জমীদারীর গভর্ণমেণ্ট রাজস্ব ৭০০০০০০৲ টাকা। আমরা জামদারের গভর্ণমেণ্ট রাজস্ব মোট জমিদারীর আদায়ী টাকার ⅓ অংশ দেখিতে পাই। অতএব সীতারামের মোট আদায় বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের আমলে হইলে এক কোটী একুশ লক্ষ টাকা হইত। আমরা সীতারামের দেওয়ান যদুনাথ মজুমদারের বংশীয় ৺ দুর্গাচরণ মজুমদারের মুখে শুনিয়াছি, সীতারামের রাজস্ব ৭৮ লক্ষ ছিল। ইহারই সঙ্গে বনকর ও জলকর ৯ লক্ষ টাকা আদায় হইত। সীতারামের জমিদারীর পরিমাণ যশহর জেলায় ১৪০০ বর্গমাইল, ফরিদপুর জেলায় ১৪০০ বর্গ-মাইল, খুলনা জেলায় ১৬০০ বর্গমাইল, বরিশাল জেলায় ৩০০ বর্গমাইল, নদীয়া জেলায় ১১০০ বর্গমাইল ও পাবনা জেলায় ২০০ বর্গমাইল। সীতারামের জমিদারীর চারি সীমানা সমানভাবে করা যায় না। তাঁহার জমিদারীর উত্তর সীমায় পাবনা জেলার দক্ষিণাংশ, ৩২ দক্ষিণসীমায় বঙ্গোপসাগর, পূর্ব্বসীমায় আঁড়িয়াল খাঁ নদী ও বরিশাল জেলার কিয়দংশ, পশ্চিম সীমার দক্ষিণাংশে যশোহর জেলার সদর এবং উত্তরাংশে মহম্মদ-সাহী পরগণা বাদে নদীয়া জেলার পূর্ব্বাংশ।

মনোহর সীতারামের রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন, এই

ক্রোধে সীতারামও মনোহরের রাজ্য আক্রমণ করিতে গমন করিলেন। বর্ত্তমান সময়ে যশোহর জেলার পূর্ব্বাংশে নীলগঞ্জপাড়ার নিকটস্থ ভৈরব-নদের পূর্ব্বতীরে সীতারাম সৈন্যসহ উপস্থিত হইলে মনোহর সীতারামের সহিত সন্ধি করেন এবং সন্ধিতে স্থিরীকৃত হয় যে, উভয়ে উভয়ের বিপদে সহায়তা করিবেন।[৩৩] কথিত আছে, সীতারাম নদীয়ার রাজা রামচন্দ্রও নাটোরে রাজা রামজীবন এবং পুঁটীয়া, তাহেরপুর ও দিনাজপুরের রাজার সহিত দূতের দ্বারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহায়তা করায় অঙ্গীকারপত্র আনাইয়াছিলেন। বিক্রমপুরের চাঁদ ও কেদার রায়ের ধ্বংসের পর তাহার রাজ্যের নবোত্থিত ছয় ঘর জমিদার ও চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্রের উত্তরপুরুষগণ ও সীতারাম তাঁহাদের বিপদে সহায়তা দান করিবেন, এইরূপ পরস্পর অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

---o---

নবম পরিচ্ছেদ

সীতারামের কীর্ত্তি

সর্ব্বসংহারিণী শক্তিসম্পন্ন কালের বিশাল উদরে কত মহাত্মার কত লোক শিক্ষণীয়া কীর্ত্তি লোপ পাইতেছে, তাহার সংখ্যা করা মানব শক্তির অতীত। কত নেনিভি, কত বেবিলন, কত কার্থেজ কালের বিশাল উদরে লীন হইয়াছে। কত গ্রীসীয়ান ও কত রোমান সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়াছে। জগতের সপ্ত আশ্চর্য্য কাণ্ডের ন্যায় কত আশ্চর্য্য কাণ্ড কাল উদরসাৎ করিয়া বসিয়া আছেন, তাহা ক্ষুদ্র মানব কি প্রকারে নিরূপণ করিবে? গত সহস্র বৎসরের মধ্যে ক্ষুদ্র, বৃহৎ কত উদারচেতা সদাশয় রাজার লোকহিতকর কীর্ত্তি করাল কাল চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ধূলিসাৎ বা ভীষণ অরণ্যে সমাচ্ছাদিত করিয়াছেন, তাহাও আমরা বলিতে পারি না। কিম্বদন্তীরূপ দীপিকার ক্ষীণালোক অবলম্বন করিয়া আমরা উদারচরিত কর্ম্মবীর মহাত্মা সীতারামের কীর্ত্তিসমূহ এই অধ্যায়ে পর্য্যালোচনা করিব। পুণ্যশীল সীতারামের কীর্ত্তি ত্রিবিধ—লোকহিতকর কীর্ত্তি, লোকশিক্ষাকর কীর্ত্তি ও ধর্ম্ম-শিক্ষাকর-কীর্ত্তি।

আমরা সীতারামের লোকহিতকরী কীর্ত্তি আবার কয়েক ভাগে বিভক্ত করিতে পারি। (ক) বহিঃশত্রুনিবারণ, (খ) অন্তঃশত্রু প্রশমন

(গ সাধারণের অভাবমোচন, ও ঘ) প্রকৃতিপুঞ্জকে একতাসূত্রে বন্ধন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সীতারামের সময়ে নিম্নবঙ্গে আসামী, আরাকানী (মগ) ও পর্ত্তুগীজগণ পুনঃ পুনঃ দেশ আক্রমণ করিত। পৈশাচিক অত্যাচারে অধিবাসিগণের হৃৎকম্প উপস্থিত করিত। তাহারা রমণীকুলের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিত, গ্রাম অগ্নিসাৎ করিত, নরহত্যা করিত ও গৃহস্থগণের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত। এদেশে আসামীগণের নৌকাপথে আসিবার প্রধান পথ চন্দনানদী ছিল। এই চন্দনানদীতটে আধুনিক পাংশা ষ্টেসনের নিকট নারায়ণপুরে ও কামারখালির নিকট গন্ধখালিতে ক্ষত্রিয় ও চন্দনার বামতীরে অনেক স্থানে পাঠানসৈন্য রাখিয়া সীতারাম আসামী আক্রমণ নিবারণ করিয়াছিলেন। অধুনা পাংশার পূর্ব্বপারে কালিকাপুর নামে যে গ্রাম আছে ঐ গ্রামে বাসাবাড়ী নামক একটী স্থান আছে। বর্ত্তমান সময়ে বাসাবাড়ীতে কয়েক ঘর বারেন্দ্রশ্রেণী ব্রাহ্মণের বাস আছে। এই বাসাবাড়ীতে সীতারামের সেনানায়ক ও সৈনিকগণ অবস্থিতি করিয়া আসামীগণের আক্রমণ নিবারণ করিতেন।

এইরূপে দক্ষিণদিক্ হইতে মগ আক্রমণ নিবারণের নিমিত্ত সীতারাম দুর্দ্ধর্ষ পাঠান ও ক্ষত্রিয়দিগকে রাখিয়া দক্ষিণের দিকে নবগঙ্গা-নদীতীরে নহাটা ও সিংহড়ার পত্তন করিয়াছিলেন। পর্ত্তুগীজ অত্যাচার নিবারণ জন্য তিনি পূর্ব্বদিকে মাদারীপুর মহকুমার উত্তর সীমায় যুদ্ধনিপুণ বহু-সংখ্যক পাঠানসৈন্য রাখিয়া দিয়াছিলেন। এইরূপে তাঁহার রাজ্যে উক্ত তিন জাতীয় আক্রমণকারী কাহারও আসিবার অধিকার ছিল না। আমরা এই তিন স্থানের ক্ষত্রিয় ও পাঠান সৈনিক স্থাপনের সংবাদ

পাইয়াছি। তিনি আর কত স্থানে এইরূপ সৈন্য রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে নিরূপণ করা যত্ন সাপেক্ষ।

অন্তঃশত্রু প্রশমন সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সীতারাম দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করিয়া দেশীয় ডাকাইতগণকে দমন করিয়াছিলেন। চৌর্য্যও তাঁহার সময়ে নিবারিত হইয়াছিল। তিনি গ্রাম্য চৌকিদারগণের অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কার্য্যে উপলক্ষে অতিরিক্ত পাওনার বন্দোবস্ত করিয়া তাহাদিগাক কার্য্যে অধিকতর মনোযোগী করিয়াছিলেন। তিনি তস্করদিগকে প্রথম কঠোর দণ্ড দিয়া চৌর্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হওয়ায় শেষে তিনি তাহাদিগের সহিত সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি চোরদিগকে নগদ টাকা ও নৌকা দিয়া নৌকাপথে বাণিজ্য করিতে পাঠাইতেন। কথিত আছে, কালু নামে একটী চোর আর পাঁচটী চোরের সহিত একখানি বৃহৎ নৌকায় সর্ষপ ক্রয়বিক্রয় করিত। একদা কালু কোন চোরের গ্রামের নিকট নৌকায় বসিয়া সরিষা বিক্রয় করিতেছিল। তাহাদের সর্ষপ-বিক্রয়ের টাকা তাহারা থলিয়ায় করিয়া সর্ষপের মধ্যে রাখিত। কালুর হাতে তহবিল থাকিত। কালু রাত্রে দুই তিন বার তহবিল দেখিত। একদিন রাত্রে কালু তহবিল দেখিতে গিয়া দেখিল, নৌকার উপর জলকর্দ্দমের পদাঙ্ক সকল অঙ্কিত রহিয়াছে। সে সর্ষপের মধ্যে তহবিলের টাকাও পাইল না সে ভাবিল, গ্রাম হইতে কোন তস্কর আসিয়া অর্থ অপহরণ করিয়াছে। সে যে পথে তৃণের উপর কম শিশির দেখিল, সেই পথেই গ্রামে প্রবেশ করিল। গ্রামের মধ্যে যে গৃহে আলোক দেখিল, সেই গৃহের পশ্চাতে দাঁড়াইল,

গৃহস্থ সুপ্ত হইলে সে গৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহমধ্যে অনুসন্ধানে আদ্র বসন পাইল। সে তখন ক্ষিপ্রগতিতে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া জলাশয়ের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। জলাশয় পাইয়া তাহার চতুর্দ্দিক্ ভ্রমণ করত যে দিকে জল চিহ্ন দেখিল ও যে দিকে ভেক লম্ফ দিল না, সেই দিক্ দিয়া জলে অবতরণ করিল। জল অনুসন্ধান করিয়া কর্দ্দম মধ্যে স্বীয় অর্থ পাইয়া কালু প্রফুল্লমনে নৌকায় আসিয়া শয়ন করিয়া থাকিল। পরদিন তস্কর নৌকার প্রতি তৃষিত দৃষ্টি করিলে কালু বলিল, "যাহা ভাবিতেছ তাহা নয়"। তস্কর গৃহে যাইয়া জলমধ্যে অনুসন্ধানে অর্থ না পাইয়া প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক নৌকায় কালুর পদতলে পড়িয়া শিষ্যত্ব স্বীকার করিল। এইরূপ নানা উপায়ে সীতারাম দেশীয় শত্রু প্রশমিত করিয়াছিলেন।

প্রজাগণের অভাব দূরীকরণের নিমিত্ত লোকহিতকর ব্রতে চিন্তাশীল মহাত্মা সীতারাম কত পুষ্করিণী, কত রাস্তা, কত বাজার, কত বন্দর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাহা নিরূপণ করা কঠিন। অনেকেই বলেন, চন্দনা তীরে মাধবপুর, রামদিয়া, বেলেকান্দি, জামালপুর, মধুখালি; ফটকী-তীরে ভাবনহাটী; চিত্রাতীরে বুনাগাতি ও ধলগ্রাম; নবগঙ্গাতীরে বিনোদপুর পলতীয়া, লক্ষ্মীপাশা, লোহাগড়া ও ভৈরবতীরে বসুন্দিয়া, ফুলতলা; নওয়াপাড়া, দৌলতপুর, খুলনা ও বাগেরহাট; বলেশ্বরতীরে বনগ্রাম; বারাসিয়াতীরে বোয়ালমারি ও সৈদপুর এবং কুমারতীরে চাঁদপুর কানইপুর, মান্দারীপুর প্রভৃতি বাজার ও বন্দর সীতারাম প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। সীতারামের সময়ে রাস্তাকে জাঙ্গাল বলিত। বর্ত্তমান সময়ে অনেক জাঙ্গাল রাস্তায় পরিণত হইয়াছে। সীতার জাঙ্গাল,

বলাধ জাঙ্গাল, রামের জাঙ্গাল প্রভৃতি অনেক জাঙ্গালের নাম শুনিয়াছি। সম্ভবতঃ ঐ সকল জাঙ্গাল সীতারামের প্রস্তুত হইতে পারে। মজুমদারের জাঙ্গাল ও কাওয়ালিপাড়ার জাঙ্গাল বোধ হয় যদু মজুমদারের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হইয়াছিল। মজুমদারের জাঙ্গাল দৌলতপুর হইতে ডুমুরিয়া পর্য্যন্ত অবস্থিত এবং কাওয়ালিপাড়ার জাঙ্গাল বাগের হাট হইতে বনগ্রাম হইয়া বরিশাল পর্য্যন্ত গিয়াছে।

লোকহিতকর কীর্ত্তির মধ্যে জলকীর্ত্তি সম্বন্ধে সীতারামের বহুল কিম্বদন্তী আছে। তাহার প্রথম কিম্বদন্তী এই যে, সীতারাম কোনও ব্রাহ্মণকে তাঁহার অভ্যুদয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি গণনা করিয়া বলেন, সীতারাম পূর্ব্বজন্মে পুণ্ডরীক (পুঁড়ুয়া=তরকারী প্রস্তুতকারক) ছিলেন ও তিনি এক ব্রাহ্মণকে পিপাসায় তরমুজ খাইতে দিয়াছিলেন, এই কারণে তাঁহার অভ্যুদয়।[৩১] (২) সীতারাম তাঁহার গুরুদেবকে উন্নতির কারণ জিজ্ঞাসা করায় কৃষ্ণবল্লভ গোস্বামী একটী কুমারী আনাইয়া নখদর্পণ করিয়া গণনা করিয়া বলেন, পূর্ব্বজন্মের জলদান তাহার উন্নতির মূল। (৩) ধন সীতারামকে ডাকিত, অথবা ডাকমন্ত্র বলে ভূগর্ভে গুপ্ত অর্থ সীতারাম জানিতে পারিতেন। সেই টাকা উত্তোলন করার জন্য সীতারাম পুষ্করিণী কাটাইতেন। (৪) সীতারামের নিয়ম ছিল, তিনি প্রতিদিন নূতন পুষ্করিণীতে স্নান করিবেন, এই কারণ বাইশ হাজার বেলদার সৈন্য সর্ব্বদা তাহার সঙ্গে থাকিত। তিনি যেখানে যাইতেন, সেখানেই নূতন পুষ্করিণী কাটাইয়া তাহাতে স্নান করিতেন। (৫) সীতারামের উন্নতির প্রথম সময়ে যখন সীতারাম রাজ্যবিস্তারের বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন,

তখন তিনি এক দিন রাত্রে স্বপ্ন দেখেন, এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী সীতারামকে বলিতেছেন, যদি জলের মত রাজ্য বৃদ্ধি করিতে চাও, তবে জলকীর্ত্তি কর।

এই সকল কিম্বদন্তীর মূলে কি আছে, আমরা জানি না, তবে এই মাত্র বলিতে পারি, তিনি বহুসংখ্যক পুষ্করিণী খনন করাইয়াছেন। পাবনা, যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর, নদীয়া ও বরিশাল জেলার মধ্যে অনেক স্থানে সীতারামের পুষ্করিণী আছে। অর্থ এত সুলভ দ্রব্য নহে যে, ভূগর্ভের প্রত্যেক স্থানেই রাশি রাশি অর্থ পাওয়া যাইবে। ঈর্ষাপরবশ দুষ্টলোকেরা চিরকালই উপকারী, গুণীলোকের গুণ স্বীকার না করিয়া তাহার কার্য্যের একটা অসৎ কারণ স্থির করিয়া থাকে। সীতারাম অসংখ্য জলকীর্ত্তিদ্বারা অসীম পুণ্যসঞ্চয় করিতেছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার অতুলনীয় যশঃ প্রকাশিত হইতেছিল; এই যশঃ লাঘব করিবার মানসে ঈর্ষাপরবশ লোকেরা অর্থপ্রাপ্তির অপবাদ রটনা করিয়াছে।

উত্তরে পাবনা জেলার অন্তর্গত দোগাছী হইতে দক্ষিণে বরিশাল জেলার অন্তঃপাতী কাশীপুর গ্রাম পর্য্যন্ত বহুগ্রামে আমরা সীতারামের খনন-করান পাঁচ শতের অধিক পুষ্করিণীর সংবাদ পাইয়াছি। মহম্মদপুরের নিকটবর্ত্তী কয়েকটী জলাশয়ের বিবরণ আমরা কিছু বলিব।

সীতারামের আদিনিবাস হরিহরনগর গ্রামে 'ধনভাঙ্গার দোহা' নামে যে জলাশয় আছে, তাহাই সীতারামের প্রথম জলকীর্ত্তি বলিয়া কথিত হয়। এই জলাশয় সম্বন্ধে এক কিম্বদন্তী আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, এতৎ সম্বন্ধে দ্বিতীয় কিম্বদন্তী এই যে, এক বৃদ্ধার এক

অলাবু-লতিকার নিম্নস্থ ভূগর্ভে প্রচুর অর্থ প্রোথিত ছিল। এই অলাবু-লতিকা সীতারাম ক্রয় করিয়া তন্নিম্ন হইতে অর্থ উঠাইয়া লন। সেই অর্থ উত্তোলন করিতে যে পরিমাণে মৃত্তিকা খনন করা হইয়াছিল, তাহাতেই এই দোহার উৎপত্তি হয়।

সীতারামের দ্বিতীয় কীর্ত্তি মহম্মদপুরের রামসাগর নামক সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা। এই দীর্ঘিকা ১৬৫৫ হাত দীর্ঘ ও ৬২৫ হাত প্রস্থ। এই দীর্ঘিকা সম্বন্ধে অনেক আখ্যায়িকা প্রচারিত আছে। আখ্যায়িকাগুলি এই—

১। এক বৃদ্ধার সীতা নামে এক কন্যা ছিল। সীতা কালীগঙ্গা হইতে জল আনিতে যায়। পিপাসাকুলা বৃদ্ধা সীতা সীতা করিয়া ডাকিতেছিল। সীতারাম সেই সময়ে তথায় উপস্থিত ছিলেন। সীতারাম উত্তর করিলেন—"মা ডাকিতেছেন কেন ?"

ইত্যবসরে বৃদ্ধার তনয়া জল লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। বৃদ্ধা উত্তর করিল ;—শীঘ্র জল দে, আমার বড় পিপাসা হইয়াছে, পোড়া রাজা কত পুকুর কাটে, কিন্তু আমার জলকষ্ট দূর হইল না। সীতারাম বৃদ্ধার এই উক্তি শুনিয়া সেই রাত্রেই এই দীর্ঘ জলাশয় খনন করান।

২। ঐ বৃদ্ধের অলাবুতলায় অর্থের অনুসন্ধান পাইয়া সীতারাম অলাবুলতা ক্রয় করেন এবং অর্থ উত্তোলনপূর্ব্বক মেনাহাতী বা রামরূপ ঘোষের হস্তে দেন; তৎকালে এস্থানে একটী জলাশয় খনন করা হয়। মেনাহাতী বা রামরূপের নাম অনুসারে এই দীর্ঘিকার নাম রামসাগর হইয়াছে।

৩। সীতারাম দীঘী কাটীতে অভিলাষী হইলে দীঘীর উত্তর তীর হইতে মেনাহাতীকে এক তীর ছাড়িতে বলেন। তীর এতদূরে গিয়া

পড়ে যে, ততদূর লইয়া দীঘী কাটিলে রায়পাশা বা নৈহাটী গ্রামের সীতারামের পুরোহিত ও অন্যান্য অনেক ব্রাহ্মণের ভদ্রাসনবাটী নষ্ট হয়। ব্রাহ্মণদিগের অনুরোধে সীতারাম শেষে দীঘিকার আকার ক্ষুদ্রতর করেন। মেনাহাতীর নিক্ষিপ্ত শরের দূরত্বের তিনভাগের একভাগ স্থানে দীর্ঘিকা খনন করা হয়।

৪। সীতারাম দীর্ঘিকা কাটিয়া, চারিধার বাঁধিয়া ও নানা দিগ্‌দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে আনাইয়া মহাসমারোহে দীর্ঘিকা প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যোগী হয়েন। সীতারাম পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিতে ব্রতী হইবেন এমন সময়ে তাঁহার গুরু, পুরোহিত ও অপরাপর ব্রাহ্মণগণ জানিলেন যে, সীতারামের সেই সময়ে একটী পুত্র জন্মিল। যখন গুরু পুরোহিত সকলেই অশৌচের কথা শুনিলেন, তখন আর প্রতিষ্ঠা কার্য্য করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। এক ব্রাহ্মণ মলিনমুখে সীতারামকে পুত্রের জন্মসংবাদ জানাইলেন। সীতারাম ব্রাহ্মণকে পারিতোষিক দিয়া ক্ষুণ্ণ মনে বলিলেন যে, এই পুত্র হইতে সমারোহের কার্য্যে বিঘ্ন হইল, ইহার অদৃষ্ট বড় মন্দ। এই পুত্র হইতে আমার রাজ্য লোপ হইবে। সীতারামের এই পুত্রের নমে শ্যামসুন্দর রায়। ব্রাহ্মণভোজনাদি ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হইল, কিন্তু পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা হইল না। রামসাগর যে প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহা আমরা পরে যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিতেছি।

রামসাগর এমন দীর্ঘ দীর্ঘিকা যে, তাহার উত্তর তীরে দাঁড়াইয়া তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ভয়ের সঞ্চার হয়। এক্ষণে আর রামসাগরের একটী ঘাটও বাঁধা নাই। এখনও চৈত্র বৈশাখ মাসে রামসাগরে ১২।১৪ হাত গভীর জল থাকে। কেহ কেহ বলেন, রাম-

সাগরের উত্তরপশ্চিম কোণে একটী স্থানে জল বিশ হাতেরও অধিক গভীর। রামসাগরের জল অদ্যাপি উত্তম পরিষ্কার আছে। ইহাতে পানা বা শেওলার লেশমাত্র নাই। কেহ কেহ বলেন, সীতারাম একটী বৃহৎ তালগাছের মধ্য খুঁদিয়া তাহা পারদপূর্ণ করত এই দীর্ঘিকায় ডুবাইয়া দেওয়ান। সেই জন্য ইহার জল এত ভাল থাকে। এখনও সহস্র সহস্র লোকে ইহার জল ব্যবহার করে। যত্নাভাবে এক্ষণে এই দীঘিকায় বহু গো, মহিষাদি পশুর স্নানে ও মলমূত্র পরিত্যাগে জল খারাপ হইতেছে। প্র.ত বৎসর দশহরার দিনে এস্থানে বহুসংখ্যক লোক সমাগত হয়। রামসাগরতীরে গঙ্গাপূজা হয় এবং বহুসংখ্যক লোক এই দীর্ঘিকায় চিনি, লবণ ও ডাবনারিকেল নিক্ষেপ করে। রামসাগরে মৎস্য-ধরার জন্য প্রতি বৎসর জেলেগণ ৩৫০ হইতে ৫০০ টাকা জলকর দিয়া থাকে।

সীতারাম কায়স্থ ছিলেন, তিনি পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠার কোন কার্য্য স্বহস্তে করিতে পারিতেন না। পুরোহিত যাজ্ঞিকদিগকে কার্য্যে বরণ করামাত্র তাঁহার কর্ম্ম। এই কার্য্য করা রাজ্ঞীর প্রসববেদনা উপস্থিত হওয়ার পরেও হইতে পারে। হয় ত তিনি গুরু, পুরোহিত, ঠাকুর-বাড়ীর বিগ্রহ প্রভৃতি যাহার তাহার নামে দীঘী প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেন। যখন বহুসংখ্যক পণ্ডিত সমাগত হইয়াছিলেন, তখন প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে কোন না কোন ব্যবস্থা হইয়াছিল। তৃতীয়তঃ—এই রামসাগরের জল যখন বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত স্নানতর্পণে ব্যবহার করেন এবং ইহার জল সাধারণ লোকে দশহরার দিনে গঙ্গাজল স্বরূপে ব্যবহার করে, তখন এই দীর্ঘিকা প্রতিষ্ঠা না হইলে ইহার জলের এত মাহাত্ম্য

হইত না। সীতারামের শত্রুপক্ষগণ এইরূপ একটী সাধু ও মহতী কীর্ত্তিতে কলঙ্কারোপ করিবার জন্য ঐরূপ মিথ্যা কিম্বদন্তী রটনা করিয়াছিল। রামসাগরের ন্যায় দীর্ঘ জলাশয় যশোহর জেলায় আর নাই এবং বঙ্গদেশেও অধিক আছে কিনা সন্দেহ। মহম্মদপুরের কাহার কাহার গৃহে রামসাগরের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটী কবিতা ছিল। সে কবিতা গৃহদাহে নষ্ট হইয়াছে! এই দীঘিকা মেনাহাতী বা রামরূপ ঘোষের ইচ্ছানুসারে কর্ত্তন ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। কবিতার যে অংশ আমরা লোকমুখে পাইয়াছি তাহা এই :—

রামরূপ-ইচ্ছা ক'রে কবে জলাশয়।
রাজার নিকটে গিয়া সবিনয়ে কয়॥
যতদূর যাবে মোর ধনুকের শর।
ততদূর লয়ে কাট দীঘিকা সুন্দর॥
দীঘিকার চারি ধারে এনে দ্বিজগণ।
বাড়ী ঘর ভূমি দিয়া করহ স্থাপন॥

কিংবদন্তী বলে ও দীর্ঘিকার নাম অনুসারে আমাদের বিশ্বাস সেনাপতি রামরূপ ঘোষ মেনাহাতীর ইচ্ছানুসারে ও তত্ত্বাবধানে এই দীঘিকা কর্ত্তিত হইয়াছিল। সেনাপতি স্বয়ং এই দীর্ঘিকা প্রতিষ্ঠা করেন। পণ্ডিত তাঁহার নামানুসারে ইহার নাম রামসাগর রাখেন।

সুখসাগর সীতারামের অপর কীর্ত্তি। ইহা একটী বৃত্তাকার পুষ্করিণী ছিল। ব্যাস ৬৬৪ হাত ও পরিধি প্রায় ২০০০ হাত। ইহার মধ্যে চতুষ্কোণ ভূখণ্ডে রাজার গ্রীষ্মাবাস ছিল। এক্ষণে গ্রীষ্মাবাসের ভগ্নাবশেষ জঙ্গলাবৃত হইয়াছে এবং উহার জলও এক্ষণে অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে।

সীতারামের বাড়ীর অর্থাৎ দুর্গের মধ্যে অনেকগুলি পুষ্করিণী ছিল। তন্মধ্যে পদ্মপুকুর, চুণাপুকুর, রাজকোষপুকুর ও অন্তঃপুর-পুকুর এখনও বর্ত্তমান আছে, রাজকোষপুকুর তলদেশ হইতে চারিদিক্ ইষ্টক দ্বারা বাঁধান ছিল। এই পুষ্করিণীতে সীতারাম গোপনে ধনরাশি

রাখিতেন। এই পুষ্করিণীর ধন পাইবার লোভে নড়াইলের জমিদার বাবু কালীশঙ্কর রায় নাটোরের দেওয়ান থাকিবার কালে দুই তিনবার জল সেচাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার সুগভীর জল সেচিয়া কমাইতে পারেন নাই৩৩ এবং কোন ধনও পান নাই। অদ্যাপি এই পুষ্করিণীতে মধ্যে মধ্যে ধন পাইবার সংবাদও পাওয়া যায়। কথিত আছে, সীতারামের পুত্র সুরনারায়ণ কি শ্যামসুন্দর পিতার পতনের পর অভাবে পড়িয়া এই পুষ্করিণী হইতে কিছু অর্থ লইতে অভিলাষী হন। তিনি দেবতাদিগের অর্চনা করিয়া স্বপ্নে দেখিলেন যে, এই পুষ্করিণীতে যে দ্রব্য তিনি প্রথম স্পর্শ করিবেন তাহাই তাঁহার প্রাপ্য। অতএব এক পিত্তলের জালাপূর্ণ স্বর্ণমুদ্রা ও একখানি স্বর্ণেরবাসন তাহার সম্মুখে আসিল। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি স্বর্ণ বাসনখানি স্পর্শ করায় তাহাই তাঁহার প্রাপ্য হইল। ১২৪৭ সালে (১৮৪১খৃঃ) নলদীর নায়েবের পাচক রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী এক বাক্স স্বর্ণমুদ্রা পায়। তাহার প্রত্যেক মুদ্রা ২০ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইয়াছিল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে একটী তেলিজাতীয় বালক একঘটী টাকা পাইয়াছিল। দাননাথ মুন্সী নামক একব্যক্তি একদিন এক বহু গুণা স্বর্ণমুদ্রা পাইয়াছিলেন। সেই মুদ্রাগুলির আকার তেঁতুলের বীজের ন্যায় ছিল। গত বৎসর সীতারাম উৎসব উপলক্ষে যখন এক মুচীকে দুর্গের মধ্যে বন জঙ্গল কাটাতে দেওয়া হয়, তখন সে একাকী অনেক সময় কার্য্য করিত। শুনা যায়, ঐ মুচি একটী ভগ্ন প্রাচীরের মধ্যে ১ ঘটি টাকা পাইয়াছে। চুনাপুকুর সীতারামে চুণ প্রস্তুত করিবার গর্ত্তের উপর প্রস্তুত হয়। পদ্মিনী নাম্নী সীতারামের পিতামহীর স্বর্গকামনায় পদ্মপুকুর খনিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

হরেকৃষ্ণপুরের কৃষ্ণসাগরও বেশ বড় পুষ্করিণী। এই পুষ্করিণী ৮৭৫ হাত দীর্ঘ ও ৩৫৫ হাত প্রস্থ। ইহার জল অদ্যাপি বহুসংখ্যক লোকে ব্যবহার করিয়া থাকে ও ইহার জলে স্নান করে। কৃষ্ণসাগরের জলকরেও বার্ষিক ৩৫০ টাকা হইতে ৩০০ শত টাকা আদায় হইয়া থাকে। সীতারামের আয়ত-ক্ষেত্রাকার দুর্গের অন্য তিনদিকের গড়ের চিহ্নমাত্র আছে। দক্ষিণ দিকের গড় স্পষ্টরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই গড় কিঞ্চিদধিক ১ মাইল দীর্ঘ ও ২০০ শত হাত প্রস্থ। কথিত আছে, এই গড় স্বনামখ্যাতা রাণী ভবাণী কর্ত্তৃক একবার সংস্কৃত হইয়াছিল। এই গড়েও অপর্য্যাপ্ত মৎস্য থাকে এবং ইহার জলকরও বৎসর-ভেদে ৪০০ টাকা হইতে ৬০০ টাকা পর্য্যন্ত আদায় হইয়া থাকে।

সীতারামের ৪র্থ লোকহিতকর কার্য্য বিবিধ জাতীয় প্রকৃতিপুঞ্জের মধ্যে শান্তি ও একতাস্থাপন। তাঁহার সময়েই প্রতি গ্রামে নিরীহ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ এবং চণ্ডাল, বিন্দী প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ ও দুর্দ্ধর্ষ পাঠানগণ একমত হইয়া বাস করিতে শিক্ষা করেন। সীতারাম তাঁহার পাঠান সেনাগণকে ভাই বলিতেন এবং তাঁহার প্রকৃতিপুঞ্জের মধ্যেও হিন্দু-মুসলমানে মিত্রভাব স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে মুসলমান ফকিরগণ ভিক্ষাকালে নিম্নলিখিত কবিতা বলিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত—

শুন সবে ভক্তি ভাবে করি নিবেদন।
দেশ গাঁয়েতে যা হইল শুন দিয়া মন॥
রাজাদেশে হিন্দু বলে মুসলমানে ভাই।
কাজে লড়াই কাটাকাটির নাহিক বালাই॥

হিন্দুর বাড়ীর পিঠে কাশন মুসলমানে খায়।
মুসলমানের নস্পাটালী হিন্দুব বাড়ী যায়॥
রাজা বলে আল্লা হরি নহে দুই জন।
ভজন পূজন যেমন ইচ্ছা করুক্‌গে তেমন॥
মিলেমিসে থাকা সুখ তাতে বাড়ে বল।
ডরেতে পলায় মগ ফিরিঙ্গীরা খল॥
চুলে ধরি নাড়ী লয়ে চড়্‌তে নারে নায়।
সীতারামের নাম শুনিয়ে পলাইয়া যায়॥

সীতারাম সত্যসত্যই দেশের শক্তিসঞ্চয় করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। হিন্দু মুসলমানের একতায়, নিম্নশ্রেণী ও উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর মিলনে দেশে যে কিরূপ বলসঞ্চয় হয়, দেশবৈরী কিরূপে প্রশমিত হয়, মগ, পর্ত্তুগীজ ও আসামী কিরূপে ভয়ে দস্যুতা হইতে নিবৃত্ত হয়, তিনি তাহা আমাদিগের নয়নে অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক প্রদর্শন করিতেছেন। তাঁহার ভদ্রতা, বিনয় ও বিশ্বাসে দুর্দ্দমনীয় পাঠানগণ তাঁহার আজ্ঞাবহ কিঙ্কর হইয়াছিল।

অকর্ম্মণ্য, ঘৃণিত, ইতর সম্প্রদায়ের হিন্দুগণ কার্য্য শিক্ষা করিয়া তাঁহার পদাতিক সৈন্যদলে প্রবেশ পূর্ব্বক কার্য্য দেখাইবার সুযোগ ও ক্ষেত্র পাইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালীর একতা যে কল্পনার বিষয় হইয়াছে, তাহা সীতারাম কার্য্যে পরিণত করিয়া সামান্য তালুকদারের পুত্র হইতে এক বিশাল স্বাধীন রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। যদি বিশ্বাসঘাতকতা তাঁহার উন্নতি-সোপানের অন্তরায় না হইত, যদি বঙ্গের ভূম্যধিকারিগণ স্ব স্ব স্বার্থমোহে মুগ্ধ হইয়া স্ব স্ব

অঙ্গীকার বিস্মৃত না হইতেন, অন্যায় ও অধর্ম্ম যুদ্ধে যদি নবাব ও জমিদারসৈন্য সীতারামকে পরাস্ত করিতে চেষ্টা না পাইত, তবে আমরা বেশ বলিতে পারি, যে মহারাষ্ট্র-গৌরবরবি শিবাজীর ন্যায়, অথবা পঞ্চনদ প্রদেশের শিখগুরু—শিখদিগের সমরনৈপুণ্যের গুরু, গুরু গোবিন্দের ন্যায় সীতারামও বঙ্গদেশে এমন একটী স্বাধীন হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন করিয়া যাইতে পারিতেন, যাহা পদানত করিতে বৃটিশ শক্তির ন্যায় প্রবল পরাক্রান্ত অনেক শক্তিকেও লাসোয়ারী, আসাই, মুদকী, ফিরোজসহর, আলিওয়াল, সোব্রাউন, গুজরাট ও চিলিয়নবালা সমরাঙ্গনে সমবেত হইতে হইত।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, সীতরাম বাঙ্গালা ও সংস্কৃত জানিতেন। তিনি আরবী ও পারসিক ভাষা শিক্ষার নিমিত্ত চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তিনি নিজে বিশেষ শিক্ষিত হউন বা না হউন, তিনি যে বিদ্যানুরাগী ছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহার সভাতে অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি মনোযোগের সহিত পণ্ডিতগণের শাস্ত্রালাপ শুনিতেন। তাঁহার সময়ে এক মহম্মদপুরেই সংস্কৃত ব্যাকরণ, সাহিত্য, স্মৃতি ও ন্যায়শিক্ষার বাইশটী চতুষ্পাঠী ছিল। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রশিক্ষার জন্য পাঁচটী কবিরাজের চতুষ্পাঠী ছিল। সীতারামের সমগ্র জমিদারীতে দ্বিশতাধিক চতুষ্পাঠী ছিল।[৩৬] তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ-সমাজকে রাজসমাজ বলিত। তাঁহার জমিদারীর অন্তর্গত পণ্ডিতগণকে মধ্যদেশের পণ্ডিত বলিত। সীতারামের সময়ে মধ্যদেশের পণ্ডিতগণ জ্ঞানগরিমায় এতদূর উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা নিমন্ত্রণের বিদায়ে নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ অপেক্ষা এক টাকা মাত্র কম

পাইতেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ অপেক্ষা এক টাকা কম বিদায় পাইবার কারণ শিক্ষা অভিজ্ঞতার হীনতায় নহে। নবদ্বীপ প্রাচীন সংস্কৃত শিক্ষার স্থান বলিয়া সেই স্থানের সম্মানার্থ নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ এক টাকা অধিক বিদায় পাইতেন। মহম্মদপুর রাজধানীতে বাইশটি টোলবাড়ীর চিহ্ন পাওয়া যায়।

সীতারাম আরবী ও পারসিক শিক্ষার প্রতিও অমনোযোগ করিতেন না। এক মহম্মদপুরেই আরবী ও পারসিক শিক্ষার নিমিত্ত ৩টি মোকতাব ছিল। কথিত আছে,—যদুনাথ মজুমদারের তিন ভ্রাতুষ্পুত্র পরমেশ্বর, নিত্যানন্দ ও গঙ্গাগোবিন্দ, তিন ভাই তিন মোক্তাবে পারসিক ভাষা পড়িতেন। সীতারাম তিন ভ্রাতার পারসিক বিদ্যার আলাপে পরমেশ্বরকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করিয়া তাঁহার মৌলবীকে পঞ্চাশ আসরপি পুরস্কার দান করিয়াছিলেন। যদুনাথ মজুমদারের গৃহে একখানি হস্তলিখিত পারসিক পুস্তকে একটি কবিতা ছিল। তাহার মর্ম্ম এই যে, "মৌলবী সামসুদ্দীন পারসি ভাষায় তেমন পণ্ডিত না হইয়াও ছাত্রের গুণে ৫০ মুদ্রা পুরস্কার পাইল। মৌলবী তোফেলবেগ ও আহম্মদ গাজী সুপণ্ডিত হইয়াও মূর্খ ছাত্রের দোষে রাজসম্মানে সম্মানিত হইতে পারিলেন না।" আমরা তিনটী মোকতাব ও তিন মোক্তাবের মৌলবীর নাম পাইয়াছি। আরও মৌলবী ও মোক্তাব ছিল কি না, নির্ণয় করা কঠিন!

বর্ত্তমান সময়ে মহম্মদপুরের পার্শ্ববর্ত্তী বাউইজানিতে যে উমাচরণ ও মহাদেব চক্রবর্ত্তী আছেন, তাঁহারা বৈদ্যগুরু সর্ব্ববিদ্যায় সন্তানদিগের গুরুবংশ। তাঁহাদিগের পরিবারের কোন স্ত্রীলোক সীতারামের

রাজত্বকালে পীড়িতা হইলে ৮২টী কবিরাজ উপস্থিত হইয়াছিলেন। বিরাশিটী কবিরাজের যত্নেও সেই রমণীর পীড়া আরোগ্য হয় নাই। কবিরাজগণের মধ্যে অভিরাম কবিরাজ বলিয়াছিলেন যে, স্বয়ং ধন্বন্তরি আসিলেও সেই রমণীর ক্ষয়রোগ আরোগ্য হইবে না।

এতদ্ভিন্ন সীতারামের জমিদারীর মধ্যে বহুসংখ্যক পাঠশালা ছিল। পাঠশালার গুরুগণ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বংশীয় ছিলেন। পাঠশালাসমূহে নিত্য প্রয়োজনীয় বিদ্যার শিক্ষা দেওয়া হইত।

সীতারামের ধর্ম্মশিক্ষাবিষয়ক কীর্ত্তি দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম দেবালয় ও দেবদেবী মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা এবং দ্বিতীয় দেবত্র সম্পত্তি দানপূর্ব্বক সাময়িক দেবকার্য্যের অনুষ্ঠানসমূহ স্থায়ীকরণ। সীতারামের পুরোহিতবংশের তালপত্রের কোন পুস্তকে এই বিষয় লিখিত ছিল। সীতারামের সময়ে মহম্মদপুরে সাত শত দুর্গোৎসব ও দুই শত কালী পূজা হইত। ২২১ বাটীতে দোল, ৫৭ বাটীতে ঝুলান, ৫৫ বাটিতে জন্মাষ্টমী ও ৬৩ বাটীতে রাসযাত্রা সমারোহে নির্ব্বাহ হইত। সীতারামের পুরোহিতেরা সর্ব্বত্র কিছু কিছু বার্ষিক পাইতেন। মাদারপুরের রাজরাজেশ্বর, দক্ষিণবাড়ীর কালী, লক্ষ্মীপাশার কালী, বরিশালের কাশীপুরের শ্রীধর ঠাকুর প্রভৃতি অনেক বিগ্রহ ও দেবদেবীর নামে সীতারাম নিষ্কর সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। দক্ষিণবাড়ী ও লক্ষ্মীপাশার কালী সীতারামের স্থাপিত নহে; তথাপি তিনি দক্ষিণবাড়ীর কালীমাতাকে ৭০০ শত বিঘা ও লক্ষ্মীপাশার কালীমাতাকে অনেক নিষ্কর জমি দান করেন। কুমরুলের দত্ত, নহাটার রায়, আমতৈলের চক্রবর্ত্তী, ইন্দুরদির দত্ত প্রভৃতিকেও দেল-(চড়ক) পূজার জন্য তিনি

কিছু কিছু নিষ্কর জমি দিয়াছিলেন।[৩৭] দানপত্রের অনুসন্ধানে আমরা যাহা পাইয়াছি তাহাই উল্লেখ করিলাম। ইহা ভিন্ন তাঁহার আরও অনেক দেবত্র ও নিষ্কর দান ছিল, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। জাতীয়-একতা ও সদ্ভাব-বৃদ্ধির উপায়স্বরূপ লোকসমাগম বাসনায় সীতারাম পূজাপর্ব্বে উৎসাহ-বর্দ্ধনার্থ অনেক নিষ্কর জমি দান করিয়াছিলেন।

সীতারামের রাজধানীতেই অনেকগুলি দেবালয় ও দেবদেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই সকল দেবতার নামে তিনি যে নিষ্কর সম্পত্তি দান করিয়া যান, তাহা অদ্যাপি রহিয়াছে। নাটোরের বড় তরপের মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় সেবাইতরূপে সেই সকল সম্পত্তি দখল ও রক্ষা করিয়া দেবসেবা চালাইয়া আসিতেছেন।

অদ্যাপি লক্ষ্মীনারায়ণের অষ্টপল দ্বিতল গৃহ বর্ত্তমান আছে। ইহাতে এখনও ঠাকুর আছেন। দিবাভাগে ঠাকুর নিম্নতলে ও রাত্রিতে দ্বিতলে অবস্থিতি করেন। অনেকে বলেন, লক্ষ্মীনারায়ণ যাঁহার গৃহে থাকেন, তাঁহার রাজশ্রী কখনও নষ্ট হয় না। ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব লিখিয়াছেন, নড়াইলের জমিদার বাবু কালীশঙ্কর প্রকৃত লক্ষ্মীনারায়ণ অপহরণ করিয়া নড়াইলে রাখিয়াছেন এবং কৃত্রিম লক্ষ্মীনারায়ণ মহম্মদপুরে আছেন। এই ঠাকুরের এখনও সেবা ও তদুপলক্ষে অতিথিভোজন হইয়া থাকে। মধ্যাহ্নে অন্নভোজন ও রাত্রে রুটি, চিড়া, দুগ্ধ, দধি প্রভৃতি ভোগ দিবার নিয়ম আছে। লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরে নিম্নলিখিত কবিতা লিখিত ছিল :—

"লক্ষ্মীনারায়ণস্থিত্যৈ তর্কাক্ষিরসভূমিতে।
নির্ম্মিতং পিতৃপুণ্যার্থে সীতারামেণ মন্দিরম্॥"

অর্থ—১৬২৬ শাকে (১৭০৫ খৃষ্টাব্দে) লক্ষ্মীনারায়ণ নামক শিলাচক্র-সংস্থাপনের জন্য পিতৃপুণ্যার্থে সীতারাম রায় কর্ত্তৃক এই মন্দির নির্ম্মিত হয়।

লক্ষ্মীনারায়ণের বাটীর নিকটে জোড়বাঙ্গালার ভগ্নাবশেষ আছে। জোড়বাঙ্গালা দুই চাল বিশিষ্ট বাঙ্গালা গৃহের ন্যায় ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ। এই জোড়বাঙ্গালার একখানিতে একটী কৃষ্ণ শিব ও অপর খানিতে একটী শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত শিবলিঙ্গ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই দুই মূর্ত্তি এখন নাই। শ্বেতপ্রস্তর-মূর্ত্তির এখন ভগ্নাবশেষ আছে।

দশভুজার মন্দির চতুষ্কোণ। ইহার ছাদ খিলান করা ও বাড়ীটী একতল। দশভুজানির্ম্মাণ সম্বন্ধে একটা কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। ভবানী কর্ম্মকার নামক এক কর্ম্মকার প্রকাশ করে যে, তাহার পুত্র উত্তম দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে পারে। সীতারাম সেই কর্ম্মকারের পুত্র দ্বারা এক স্বর্ণময়ী দশভুজা গড়াইতে আদেশ করেন। ভবানী চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্যক্তি সীতারামের পেস্কার ছিলেন। যাহাতে স্বর্ণ চুরি না যায়, তাহার তত্ত্বাবধানের ভার তাঁহার উপর থাকে। কর্ম্মকার-পুত্র বাটীতে অষ্টধাতুর দশভুজা ও রাজভবনে স্বর্ণময়ী দশভুজা নির্ম্মাণ করে। সে প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বদিন অষ্টধাতুর দশভুজা পদ্মপুকুরে ডুবাইয়া রাখে। এবং প্রতিষ্ঠার দিনে দশভুজা স্নান করাইতে যাইয়া স্বর্ণময়ী দশভুজার পরিবর্ত্তে অষ্টধাতুর দশভুজা লইয়া আইসে; সুতরাং অষ্টধাতুর দশভুজারই প্রতিষ্ঠা হয়। পরে কর্ম্মকার প্রকাশ করে যে, অষ্টধাতুর দশভুজা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, স্বর্ণময়ী দশভুজার প্রতিষ্ঠা হয় নাই, তাহা কর্ম্মকারের নিজের বাড়ীতে আছে। স্বর্ণময়ী

দশভুজা নির্ম্মাণকালে কড়া-পাহারার বন্দোবস্ত হইলে কর্ম্মকার প্রকাশ করে যে, তাহাদের উপর ধর্ম্মভার দিলে তাহারা অর্দ্ধেক চুরি করে এবং তাহাদের কার্য্যের প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখিলে তাহারা ষোলআনা চুরি করিয়া থাকে। সীতারাম কিছুমাত্র চুরি করিতে দিবেন না এবং ষোল আনা চুরি করিতে পারিলে বিশেষ পুরস্কার দিবেন, অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। যখন প্রতিষ্ঠিতা দশভুজা মূর্ত্তি অষ্টধাতু নির্ম্মিতা প্রমাণিত হয়, তখন সীতারাম কর্ম্মকারের তস্করতার চাতুর্য্যের জন্য স্বর্ণময়ী দশভুজা তাহাকে পুরস্কার দেন। এই স্বর্ণময়ী দশভুজা পেস্কার ভবানীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ক্রয় করিয়া নলীয়াগ্রামে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং তাঁহার সেই দশভুজা মূর্ত্তি অদ্যাপি পূজিত হইতেছেন। এই কিম্বদন্তী অন্যভাবেও প্রচলিত আছে। ভবানীপ্রসাদ কর্ম্মকারের পুত্র কমলা রাণীর জন্য এক ছড়া হীরক-খচিত স্বর্ণহার প্রস্তুত করে। ভবানী পুত্রকে সঙ্গে করিয়া হারসহ রাজদরবারে উপস্থিত হয়। রাজা সীতারাম হার দেখিয়া কর্ম্মকারপুত্র স্বর্ণাভরণগঠনে উত্তম শিল্পী বলিয়া প্রশংসা করেন। এই প্রশংসাবাদে ভবানী প্রতিবাদ করিয়া বলে:—ছোঁড়া গড়্‌তে শিখেছে বটে, কিন্তু চুরি শিখে নাই। চুরিতেই ব্যবসায়ে লাভ। রাজা এই কথা শুনিয়া ভবানীকে জিজ্ঞাসা করেন:—তোমার পুত্র কি কিছুই চুরি শিখে নাই? ভবানী তদুত্তরে বলে—শিখেছে বটে, টাকায় অর্দ্ধেক। অনন্তর রাজা আবার জিজ্ঞাসা করেন:—ভবানী! তোমার পুত্র অর্দ্ধেক চুরি করিতে পারে তাহাতেও তুমি তুষ্ট নহ। তুমি কি পরিমাণে চুরি করিতে পার? তদুত্তরে ভবানী নিবেদন করিল:—মহারাজ! ক্ষমা করিবেন, আমি ষোলআনা চুরি করিতে

পারি। অতঃপর ভবানীকে স্বর্ণময়ী দশভুজা গঠন করিতে আদেশ করা হয়। ভবানী প্রহরি কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া স্বর্ণময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করে। ভবানী উল্লিখিত উপায়ে স্বর্ণময়ী দশভুজার পরিবর্ত্তে পিত্তলময়ী দশভুজা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা-মন্দিরে উপস্থিত করে। দশভুজা প্রথমে ইষ্টকনির্ম্মিত বাঙ্গালা ঘরের ন্যায় বারান্দাযুক্ত গৃহে সংস্থাপিত হইয়া ছিলেন। দশভুজা-মন্দিরে নিম্নলিখিত কবিতাটী লিখিত ছিল :—

"মহীভুজরসক্ষৌণীশকে দশভুজালয়ং।
অকারি শ্রীমতা সীতারামরায়েণ মন্দিরং॥"

অর্থ—১৬২১ শকে (১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে) সীতারাম কর্ত্তৃক দশভুজালয় নামক মন্দির নির্ম্মিত হয়। সীতারামের দুর্গমধ্যেই অপর মন্দিরে কৃষ্ণবিগ্রহ ছিলেন। এই বিগ্রহ এখন দীঘাপতিয়া রাজভবনে আছেন।

কানাইপুরে সীতারামে দ্বিতীয় বিগ্রহ-ভবন। তিনি কানাইপুরকে যশোদানন্দবর্দ্ধন কংসারি কৃষ্ণের নিকেতন বৃন্দাবন কল্পনা করিয়া কৃষ্ণ-বলরাম বিগ্রহ সংস্থাপিত উক্ত গ্রামের নাম কানাইপুর রাখিয়াছিলেন। তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের গোকুলনগর, গোপালপুর, হরেকৃষ্ণপুর প্রভৃতি নাম দিয়াছিলেন। কানাইপুরের কৃষ্ণবলরামের ভবনে শিল্প-নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখান হইয়াছে। অনুমান হয় এই দেবালয় সীতারামের চরম উন্নতির সময় নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই বিগ্রহের অট্টালিকায় যেরূপ কারুকার্য্য ও শিল্পনৈপুণ্য আছে, সেরূপ অট্টালিকা আর এতদ্দেশে পরিলক্ষিত হয় না। ইহার ছাদ খিলান করা ছিল। ছাদের মধ্যস্থলে একটী উচ্চচুড়া ও চারি পার্শ্বে চারিটী অপেক্ষাকৃত

ক্ষুদ্রচূড়া নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই পঞ্চচূড়ার জন্য ইহাকে পঞ্চরত্নের মন্দির কহে। কালের কঠোর করস্পর্শে ইহার দুইটী চূড়া এক্ষণে ভগ্ন হইয়াছে। এই মন্দিরের দ্বার ও গবাক্ষ সকল চন্দনকাষ্ঠ নির্ম্মিত; তাহাতে দারুময় কৃষ্ণবলরাম ও রাধামূর্ত্তি সংস্থাপিত আছেন। মন্দিরগাত্রে নিম্ন-লিখিত শ্লোক লিখিত হইয়াছিল,—

"বাণদ্বন্দ্বাঙ্গচন্দ্রে পরিগণিতশকে কৃষ্ণতোষাভিলাষঃ
শ্রীমদ্বিশ্বাসখাসোদ্ভবকুলকমলে ভাসকো ভানুতুল্যঃ।
ভ্রাজৎস্নেহোপযুক্তং রুচিররুচিহরো কৃষ্ণগেহং বিচিত্রং
শ্রীসীতারামরায়ো যদুপতিনগরে ভক্তিমত্তঃ সসর্জ॥"

১৬২৫ শকে (১৭০৩ খৃঃ) কৃষ্ণে সন্তোষের জন্য রুচিররুচিহর শ্রীমদ্-বিশ্বাস-খাসোদ্ভব কুলকমলে স্নিগ্ধ কিরণবিশিষ্ট রবিসদৃশ শ্রীসীতারাম রায় ভক্তিমত্ত হইয়া যদুপতিনগরে মনোরম বিচিত্র কৃষ্ণগেহ নির্ম্মাণ করেন।

এই অট্টালিকা উত্তরের পোতায়, তাহার দক্ষিণে সুন্দর নাটমন্দির। নাটমন্দিরের দক্ষিণদিকে ইষ্টকনির্ম্মিত জোড়বাঙ্গালা। নাটমন্দিরের পশ্চিম ও পূর্ব্বপার্শ্বে দুইটী অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ আছে। শুনা যায়, তাহার একটী ভাণ্ডারগৃহ ও অপরটী ভোগগৃহ ছিল। এই বিগ্রহের স্বর্ণ-রৌপ্যনির্ম্মিত বহুসংখ্যক ভাণ্ড (বাসন) ছিল।

সীতারাম দুর্গোৎসব, শ্যামা, জগদ্ধাত্রী, রাস, দোল, চড়ক, রথযাত্রা, ঝুলান, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি পূজা উৎসবে মহা সমারোহ করিতেন। এই সকল দেবসেবা ও পূজাপার্ব্বণের জন্য বহুসংখ্যক দেবত্র সম্পত্তি সীতারাম দিয়াছিলেন। তিনি নিজের দেবসেবার জন্য যেমন দেবত্র সম্পত্তি রাখিয়াছিলেন, সেইরূপ তাঁহার রাজ্যের মধ্যে সকল দেবালয়ের

দেবসেবার জন্য ও পূজাপর্ব্বের জন্য প্রচুর পরিমাণে দেবত্র ভূমিদান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই দেবত্র সম্পত্তি দৃষ্টে বোধ হয়, হিন্দু-ক্রিয়াকলাপ প্রচার করিবার জন্য তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল। সীতারামের দুর্গস্থিত লক্ষ্মীনারায়ণ, দশভুজা ও কানাইপুরের কৃষ্ণ-বলরামের পূজা ও উৎসব এখনও নাটোরের বড় তরপের রাজার তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত হইতেছে। মহম্মদপুর অঞ্চলে সাধারণের বিশ্বাস এই যে, সকল দেবদেবীই বিলক্ষণ জাগ্রত আছেন। এই সব দেবদেবী-গণের সেবায় ও তৎপ্রসাদে অতিথিগণের ভোজনে ত্রুটী করায় এই সব দেবত্র সম্পত্তির নায়েব, ভৃত্য, পাচক প্রভৃতির বংশ থাকে না। কথিত আছে, জারডিন স্কিনার কোম্পানি সীতারামের কোন সম্পত্তি ক্রয় করিয়া কৃষ্ণবলরামের সম্পত্তি লইবার জন্য পাবনার জজ আদালতে এক মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। বিগ্রহের পক্ষ হইতে দেবত্র রক্ষার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়। মোকদ্দমা শেষ হইয়াছে এবং উভয়পক্ষের উকিলগণের বক্তৃতা শেষ হইয়া গিয়াছে। ঠাকুরের পক্ষের উকিল বাবু অসুস্থ থাকায় এবং মোকদ্দমাটী হারিবেন, এই আশঙ্কায় বাসায় শয়ন করিয়া আছেন। তিনি সামান্য নিদ্রায় স্বপ্ন দেখিলেন, এক ব্রাহ্মণ লাঠি হস্তে তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে পদাঘাত করিতেছেন এবং বলিতেছেন, শীঘ্র উঠিয়া কাছারিতে যা। আমার মোকদ্দমা যায়, তুই সুখে ঘুমাইতেছিস, আবার সওয়াল জবাব করিস্, আমার মোকদ্দমা যাইবে না।" উকীল বাবু স্বপ্নদর্শনের পর আবার কাছারীতে গমন করিলেন। জজসাহেব লিখিত রায় ছিঁড়িয়া ফেলিয়া উকীল বাবুগণের বাদানুবাদ পুনরায় শ্রবণ করিলেন। বলাবাহুল্য, মোকদ্দমা বিগ্রহের অনুকূলে নিষ্পত্তি হইয়াছিল।

সীতারাম হিন্দু দেবদেবীর যেরূপ প্রতিষ্ঠা ও পূজা-অর্চ্চনা করিয়াছেন, সেইরূপ মুসলমানদিগের মসজিদ্ ও মুসলমান ধর্ম্মানুমোদিত উৎসবাদির রক্ষার জন্যও চেষ্টা পাইয়াছেন। এতদুদ্দেশ্যে দুই একটী মসজিদ সীতারামের নির্ম্মিত বলিয়া পরিচিত আছে। সীতারামের প্রতিষ্ঠিত অনেক পাঠান গ্রামের পাঠানদিগের ধর্ম্মোদ্দেশে কিছু কিছু লাখেরাজও দেওয়া আছে।

সীতারামের যে বিস্তীর্ণ দুর্গে চতুর্দ্দিক্ হইতে সমবেত ক্ষত্রিয়, পাঠান ও দেশীয় সৈনিকগণ স্থানলাভ করিয়াছে, অস্ত্রশস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছে, যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছে, একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে, বহিঃশত্রু ও অন্তঃশত্রু দমন করিয়া লোকহিতকর ও ধর্ম্মশিক্ষাপ্রদ নানা সদনুষ্ঠান করিতে পুণ্যশ্লোক, অতুলনীয় প্রতিভাসম্পন্ন, উদারচেতা সীতারামকে সমর্থ করিয়াছে, সীতারামের সেই দুর্গের ভগ্নাবশেষের অবস্থা বর্ণন তাঁহার ত্রিবিধ সাধুকার্য্যের মূল বলিতে হইবে। এক্ষণে আমরা সীতারামের দুর্গের ভগ্নাবশেষ বর্ণন করিব।

১। সিংহদ্বার। চাকলার কাছারী পার হইলেই সিংহদ্বার। এই সিংহদ্বার অন্তঃপুরে যাইবার পথে অবস্থিত। পূর্ব্বে একটী প্রকাণ্ড তোরণ ছিল, এক্ষণে কেবল মাত্র থাম আছে। পূর্ব্বে এই দ্বারের খিলান অর্দ্ধচন্দ্রাকার ছিল।

২। পুণ্যাহ গৃহ। এই তোরণের অনতিদূরে পুণ্যাহ গৃহ ছিল। পূর্ব্বে ইহা একটী এককক্ষবিশিষ্ট বহুদূর বিস্তৃত একতল গৃহ ছিল। ইহাতে পুণ্যাহ অর্থাৎ বৎসরের প্রথম দিনের কর আদায়ের উৎসব হইত। এক্ষণে ইহার ভগ্নাবশেষ ইষ্টকরাশি জঙ্গলে আবৃত আছে।

৩ মালখানা। সিংহদ্বার পার হইয়া উত্তরের দিকে গেলে তিনখানা বাঙ্গালা গৃহের ন্যায় তিনটী অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যাইত। এই ঘর সকলের দুইটী গৃহ মালখানা (ধনাগার) স্বরূপে ব্যবহৃত হইত এবং পশ্চিম পার্শ্বের গৃহে প্রহরিগণ থাকিত। এই তিন গৃহের ভগ্নাবশেষ ইষ্টকস্তূপ মাত্র আছে।

৪ তোষাখানা। মালখানার একটু পশ্চিমে তোষাখানা। ইহাও একটী সুবৃহৎ অট্টালিকা। ইহার সম্মুখে এক প্রকাণ্ড বারাণ্ডা ছিল। এই গৃহে তৈজসপত্র ও বহু দ্রব্যাদি থাকিত। এই গৃহের স্তম্ভ ও খিলান-গুলি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

৫ অন্তঃপুর। সীতারামের অন্তঃপুর ধনাগার পুষ্করিণীর পার্শ্বে অবস্থিত ছিল। সেই সকল অট্টালিকার জঙ্গলাবৃত-ইষ্টকরাশি পতিত রহিয়াছে। কোন অট্টালিকার ভিত্তি, কোন অট্টালিকার একটী স্তম্ভমাত্র বিদ্যমান আছে। ইষ্টকরাশি দৃষ্টে অনুমিত হয়, এখানে বহুসংখ্যক বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা ছিল। একটী অট্টালিকার কিয়দংশ এক্ষণেও দৃষ্ট হয়। লোকে বলে সেইটীই সীতারামের শয়নগৃহ ছিল।

৬ সেনাবারিক। স্থানে স্থানে অট্টালিকার বৃহৎ বৃহৎ ভিত্তি লক্ষিত হয়। সেইগুলি দ্বিতল বা ত্রিতল সেনানিবাস ছিল।

৭ দোলমঞ্চ। ফাল্গুন মাসে দোলপূর্ণিমায় এই স্থানে লক্ষ্মীনারায়ণ, কৃষ্ণবলরাম প্রভৃতির দোলপূজা হইত। দোলমঞ্চ সীতারামের সময়ে নির্ম্মিত। এই মঞ্চ মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত হওয়ায় অদ্যাপি সম্পূর্ণ অবস্থায় আছে। দোলমঞ্চ ৩২ হাত দীর্ঘ ও ২৪ হাত প্রস্থ। ইহার ছাদ প্রায় ২৪ হাত উচ্চ।

৮ কাছারী ও জেল। দক্ষিণ গড়ের উত্তর দিকের রাস্তার মধ্যস্থলে একটু দূরে সীতারামের কাছারী ও জেলখানা। কাছারিটী রাস্তার একটু নিকটে। জেলখানা ঐ রাস্তা হইতে কিছু বেশী উত্তরে অবস্থিত ছিল। কাছারীতে বসিয়া সীতারাম রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন ও তাঁহার জেলে অপরাধী বন্দিগণ থাকিত। এই দুই অট্টালিকার কোন কোন প্রাচীর অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

৯ কাননগো কাছারী। দক্ষিণ পার্শ্বের রাস্তার পূর্ব্ব কোণে কাননগো কাছারীর ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। কাননগো জমিদারী মাপ ও তাহার রাজস্ব নির্দ্ধারিত করিতেন।

রামসাগরের উত্তরদিকে বর্ত্তমানে যে রাস্তা আছে, সেই রাস্তা দিয়া গমনকালে প্রথমে বাজার, তার পর যে স্থান হইতে রাস্তা পশ্চিমাভিমুখী হইয়াছে, সেইস্থানে কাননগো কাছারী, তৎপরে পদ্ম ও চূণাপুকুর, তাহার কিঞ্চিৎ পশ্চিমে তারামণি ঠাকুরাণীর রামচন্দ্র-বিগ্রহালয়, তাহার উত্তরে দোলমঞ্চ। অনন্তর পরবর্ত্তী জমিদারগণের কাছারী বাড়ী, তার পর সীতারামের কাছারী ও জেল। তার পর সীতারামের রাজকোষ-পুষ্করিণী, তৎপর সীতারামের বাড়ী, তৎপর সীতারামের সিংহদ্বার, তৎপর পুণ্যাহ-গৃহ, তৎপর ধনাগার, তৎপর নাটোররাজের শিবমন্দির, তৎপর দশভুজা-মন্দির, তৎপর তোষাখানা ও তৎপর লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির। ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব বলিয়াছেন, বাজার ও গণিকাপাড়া সীতারামের দুর্গমধ্যে ছিল। বাজারের কিয়দংশ এক্ষণে দুর্গ সংলগ্ন বটে, কিন্তু দুর্গ মধ্যে বারবিলাসিনী-গণের বাস ছিল, তাহা কি প্রকারে ওয়েষ্টল্যাণ্ড নিরূপণ করিলেন বুঝি না। বোধ হয়, ছবিলার ভিটা দৃষ্টে সাহেবের এই ভ্রমবিশ্বাস জন্মিয়াছে।

ছবিলা অন্তঃপুর-প্রহরীর উত্তরাধিকারী পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ১৮৮৬ খৃঃ একজন মুচি বেতসলতা কর্ত্তন করিতে যাইয়া সীতারামের ভগ্ন অট্টালিকার ইষ্টক মধ্যে এক বাক্স রৌপ্যমুদ্রা পাইয়াছিল। এই টাকাগুলি অকবর বাদশাহের আমলের টাকা, ইহার প্রত্যেক টাকা সে সতর আনা মূল্যে বিক্রয় করিয়াছে। মুচির বাড়ী ফুলবাড়ী গ্রামে ছিল। এই স্থানেই বলিয়া রাখি, সীতারামের কর্ম্মচারীর কীর্ত্তি ও সীতারামের কীর্ত্তি মধ্যে গণ্য সীতারামের উকিল মুনিরামের ধূলজুড়ির বাড়ীতে দেবালয়ে নিম্নলিখিত কবিতা লিখিত ছিল:—

"শূন্যচন্দ্ররসইন্দৌ কৃষ্ণচন্দ্রস্য মন্দিরং।
ইদং কৃতিমুনীরামো রামভদ্রস্য নন্দনঃ॥"

অর্থ। ১৬১০ শকে (১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে) রামভদ্রের পুত্র মুনিরাম কৃষ্ণচন্দ্র নামক বিগ্রহের মন্দির নির্ম্মাণ করেন।

লক্ষ্মীনারায়ণ-ঠাকুর-প্রাপ্তি সম্বন্ধে চারিটী কিংবদন্তীর কতকাংশ আমরা পুর্ব্বেই বলিয়াছি। (১) সীতারামের নিজের অশ্বক্ষুরে ত্রিশূল বিদ্ধ হওয়ায় লক্ষ্মীনারায়ণ দেখা দেন। (২) তাঁহার পিতার অশ্বক্ষুরে ত্রিশূল বিদ্ধ হওয়ায় তাঁহাকে ভূগর্ভে পাওয়া যায়। (৩) সীতারাম প্রাতঃকৃত্য করিতে যাইয়া মৃত্তিকা মধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণ প্রাপ্ত হন। (৪) লক্ষ্মীনারায়ণ সীতারামকে আদেশ করায় তিনি তাঁহাকে ভূগর্ভ হইতে উঠাইয়া আনেন। এই চারি কিংবদন্তীর মধ্যে সীতারামের পিতা উদয়নারায়ণ যে লক্ষ্মীনারায়ণ প্রাপ্ত হন, এই কিংবদন্তীই আমরা সত্য মনে করি। সীতারামের পিতা লক্ষ্মীনারায়ণ পাইলেও প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইতে পারেন নাই। সীতারাম তাই উক্ত দেবালয়ের মন্দিরে "পিতৃ-

পুণ্যার্থে” এই কথা লিখিয়াছেন। কানাইপুরের কৃষ্ণবলরাম সীতারাম গুরুদেব কৃষ্ণবল্লভের পরামর্শক্রমে স্থাপন করিয়াছিলেন, একথা কৃষ্ণ বলরামের মন্দিরের শ্লোকের “কৃষ্ণতোষাভিলাষঃ” শব্দে প্রতিপন্ন হয়। এই কৃষ্ণ সীতারামের গুরু কৃষ্ণবল্লভ।

সীতারামের মহম্মদপুর দুর্গ ও তন্নিকটস্থ কীর্ত্তিসমূহের একখানা ক্ষুদ্র মানচিত্র পর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইল এবং সেই চিত্রে অঙ্কিত ১, ২, প্রভৃতির সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট স্থানের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১ রামসাগর। ২ গড়। ৩ রাজপথ। ৪ চুণাপুকুর। ৫ মেনাহাতীর কবর। ৬ পদ্মপুকুর। ৭ অজ্ঞাত। ৮ জেলখানা। ৯ দোলমঞ্চ। ১০ দশভুজার মন্দির। ১১ লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির। ১২ জোড়বাঙ্গালা। ১৩ রাজকোষপুকুর। ১৪ সীতারামের বাস করিবার দ্বিতল ভবন। ১৫ অন্দরমহল। ১৬ তোষাখানা। ১৭ সাবুখাঁর পুকুর (সদরপুকুর) ১৮ শিবমন্দির। ১৯ সুখসাগর। ২০ সিংহদ্বার।

মহম্মদপুরের ভগ্ন দুর্গ ও নিকটস্থ কীর্ত্তিসমূহের মানচিত্র।
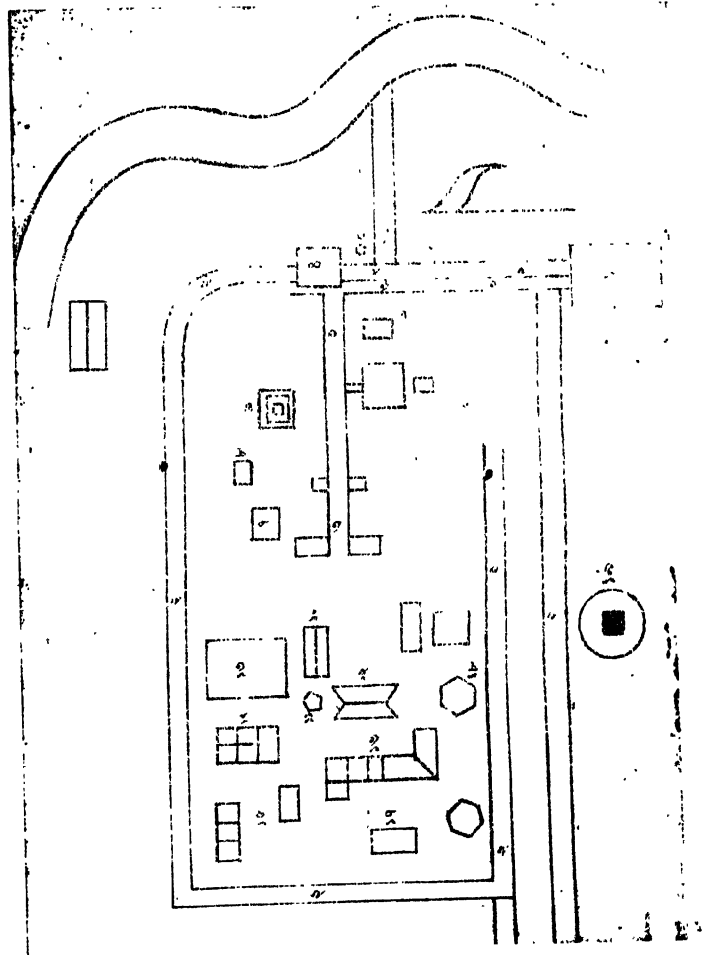
দশম পরিচ্ছেদ

সীতারামের ধর্ম্ম ও সমাজনীতি।

যদিও পুণ্যাত্মা সীতারাম বর্ত্তমান সময় হইতে সার্দ্ধ দ্বিশত বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যদিও সে সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিমল আলোক ও পাশ্চাত্য বিকৃতভাব বঙ্গীয় সমাজে প্রবেশপূর্ব্বক বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজকে অণুমাত্রও কলুষিত করে নাই, যদিও তৎকালে এদেশে সংস্কৃত, আরবী এবং পারসীক শিক্ষা ব্যতীত উচ্চ অঙ্গের বাঙ্গালা শিক্ষার পদ্ধতি ছিল না, তথাপি তৎকালে সীতারাম যেরূপ উদার ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, সেরূপ উদার নীতির পরিচয় আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ উপাধিধারী সম্ভ্রান্তবংশীয় মান্যগণ্য ব্যক্তির কার্য্যেও পরিলক্ষিত হয় না। হতভাগ্য বঙ্গদেশ! হতভাগ্য বঙ্গমাতঃ! তোমার হিন্দুসমাজে—তোমার মুসলমান সমাজে ক্ষুদ্রাশয়তা, স্বার্থপরতা, অদূরদর্শিতা, পক্ষপাতিতা প্রভৃতি এরূপ ভাবে প্রবেশ করিয়াছে এবং এই ঘৃণিত দোষ প্রক্ষালন করিতে হিন্দু-মুসলমান বঙ্গসন্তানগণ এরূপ ভাবে উদাসীন আছেন যে, তাহা স্মরণ করিলে হৃতসর্ব্বস্ব ভগ্নপোত বণিকের ন্যায় করমর্দ্দনকরত উচ্চরবে ক্রন্দন করিতে ইচ্ছা হয়। এদেশীয় অধিকাংশ মুসলমান হিন্দু হইতেই ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। হিন্দু-মুসলমান এক্ষণে এক গ্রামে বাস করিতেছেন, হিন্দুর প্রজা মুসলমান হইতেছেন এবং মুসলমানের প্রজা

হিন্দু হইতেছেন। ধর্ম্মেই বা পার্থক্য কি আছে; মুসলমান বলিতেছেন, "লায় লাহে হেলেল্লা মহম্মদ রসুল আল্লা" অর্থাৎ একমাত্র ঈশ্বর এবং মহম্মদ তাহার ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক; হিন্দু বলিতেছেন "একমেবাদ্বিতীয়ম্" অতএব মোটের উপর হিন্দু মুসলমানের একই ধর্ম্ম, উভয়েই এক ঈশ্বরের উপাসক। সাধারণের ধর্ম্মশিক্ষার নিমিত্ত দেবদেবীর মূর্ত্তি পূজা এবং উৎসব হিন্দুগণের অনুষ্ঠেয় হইয়াছে। অন্যদিকে মাণিকপীর, গাজী, সত্যপীর প্রভৃতির নিমিত্ত সাধারণ মুসলমানগণ সিন্নি প্রভৃতি দিয়া থাকেন। সাধারণ লোকের ধর্ম্ম যাহাই হউক, উচ্চ শিক্ষিত হিন্দু মুসলমানের ধর্ম্ম এক, তবে প্রভেদ কিসে? প্রভেদ এক খাদ্যাখাদ্যের। খাদ্যের প্রভেদ কি প্রভেদ? দেশভেদে, কালভেদে, কার্য্যভেদে হিন্দু যে সকল খাদ্য পরিত্যাগ করিয়াছেন, মুসলমান অল্পদিন শীতপ্রধানদেশ হইতে এদেশে আগত বলিয়া সে খাদ্য ছাড়েন নাই। হিন্দুর মধ্যে গোমেধ যজ্ঞ ছিল। উত্তরচরিতে দেখা যায়, জানকী তপোবনে যাইয়া শ্মশ্রুল মুনিগণকে এক বৃহৎ ভোজ দিতেছেন এবং মুনিগণ শ্মশ্রু আলোড়ন করিয়া গো মাংস পরম হর্ষে ভক্ষণ করিতেছেন। অতএব হিন্দু মুসলমানে প্রভেদ কি? আমরা হিন্দু মুসলমানে—প্রভেদ দেখি, পরস্পর মিশিতে পারি না ও মিশিতে জানি না।

এই হিন্দু মুসলমানগণের পার্থক্য-পয়োধির জোয়ার ভাটা নাই—একটানা স্রোতে প্রবাহিত হইতেছে, কেবল মধ্যে মধ্যে ধর্ম্ম-সংঘর্ষণরূপ ঘূর্ণা বায়ু উপস্থিত হইয়া এক স্থানে মহরম লইয়া দাঙ্গা ও অপর স্থানে দোলের হুলি লইয়া কাজিয়া হইতেছে। ধর্ম্মবিষয়ে শাক্ত-বৈষ্ণবে যে প্রভেদ, সৌর-গাণপত্যে যে প্রভেদ, মুসলমান হিন্দুতে তদপেক্ষা অধিক

পার্থক্য নহে। এই ধর্ম্মপার্থক্যরূপ পয়োধি বিরাজিত থাকে থাকুক! এদেশে কি আর ভগীরথের জন্ম হয় না যে, পবিত্রসলিলা স্নিগ্ধতোয়া শত শত জাহ্নবী আনিয়া উত্তরপুরুষের উন্নতিকামনায় এই সমুদ্রের কটুত্ব ও লবণত্ব দোষ বিদূরিত করে? হিন্দুমুসলমান একই আর্য্য জাতির বিভিন্ন শাখা, একই ঈশ্বরের উপাসক, এক গ্রামে বাস করিয়া হয় ত সকলেই এক কৃষিক্ষেত্রে কার্য্য করিতেছেন, অথবা এক ইংরাজের অফিসে কর্ম্মচারী হইয়াছেন। এক্ষণে দ্বেষাদ্বেষী ও পার্থক্যের ক্ষুদ্রাশয়তা কি থাকা ভাল? মন বড় না হইলে বড় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা যায় না। ক্ষুদ্রাশয়তার ক্ষুদ্র কূপে দণ্ডয়েমান থাকিলে হিমাদ্রিশিখরে দণ্ডায়মান হইয়া নিরপেক্ষ-পাতিতার দূরবীক্ষণ নয়নে যে মনোরম সুদৃশ্য দৃশ্য অবলোকন করা যায়, তাহা কূপস্থিত ব্যক্তি স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারে না। আমরা সকলেই ক্ষুদ্রাশয়তার কূপে পতিত। আমরা স্বার্থপরতার ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে হাস্যরোদনশীল তিরস্কারের প্রবাহময়ী প্রণয়িনী, দেহি-দেহি-বরসম্পন্ন নন্দন-নন্দনী, আকাঙ্ক্ষাময় ভ্রাতাভগিনী, বাৎসল্যময় জনক-জননী ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাই না। আধুনিক শিক্ষায় এই স্বার্থপরতার দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ হইয়া কেবল স্ত্রী-পুত্রেই নিবদ্ধ রহিয়াছে। মাতর্ব্বঙ্গভূমি! হতভাগ্য বঙ্গীয় ভ্রাতৃগণ! একবার চতুর্দ্দিকের ভিন্ন দেশীয় লোকদিগের কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি কর। তোমার অবস্থার সহিত একবার তাহাদের অবস্থা তুলনা কর। একবার তোমার জাপানি ভ্রাতা ও বৃটনীয় রাজপুরুষের প্রতি দৃষ্টি কর। তোমাদের গৃহে একতার বিন্দুমাত্র নাই, জাতীয় উন্নতির অনুষ্ঠানমাত্র নাই, তোমরা পাঁচজনে মিলিয়া একটী সিলায়ের কল কিনিতে পার না! ঐ দেখ তোমার ভ্রাতা ও রাজপুরুষগণ কি

অমানুসিক কার্য্য সকল সম্পাদন করিতেছেন। শত শত যুবক স্বদেশের কল্যাণে সমরানলে জীবন আহুতি দিবার জন্য সোৎসাহে প্রফুল্ল মনে অগ্রসর হইতেছেন।

এখন হইতে সার্দ্ধ দ্বিশত বর্ষ পূর্ব্বে যখন কতলু খাঁ, দায়ুদ খাঁ. সোলেমান কররাণী প্রভৃতি পাঠান নবাব ও কালাপাহাড় প্রভৃতি হিন্দু-ধর্ম্মভ্রষ্ট মুসলমানধর্ম্ম দীক্ষিত পাঠান সেনাপতিগণের লোমহর্ষণ অত্যাচার লোকের স্মৃতিপথে জাগ্রত ছিল এবং মোগলজাতীয় মুসলমানগণের অত্যাচারে হিন্দুগণের হৃৎকম্প উপস্থিত হইতেছিল, তখন সীতারাম প্রকৃত বলসঞ্চয়ের জন্য সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য সংস্থাপনের জন্য ভস্মাবৃত পাঠান-সৈনিকবহ্নি উদ্দীপ্ত করিয়া মোগলতেজ ক্ষীণতর করিবার জন্য পাঠানদিগকে ভাই বলিয়া ও তাহাদিগের সহিত অতি সাধু ব্যবহার করিয়া এবং মোগল অত্যাচারে উৎপীড়িত পাঠানদিগকে আশ্রয় দিয়া প্রবল হিন্দু-পাঠানমিশ্রিত সৈন্যদল গঠন ও স্নেহসদাশয়তার মূলে তাহাদিগকে দৃঢ় একতাবন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস উদার ও উন্নত ছিল। তিনি হিন্দু-মুসলমান বুঝিতেন না; তিনি নিম্নশ্রেণীর হিন্দু বা উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু জানিতেন না; জাতীয়-পার্থক্য—সাম্প্রদায়িক-পার্থক্য প্রভৃতি তিনি বুঝিতেন না। তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টির লক্ষ্য উচ্চতর ধর্ম্মের দিকে ও উচ্চতর কার্য্যের দিকে নিয়োজিত হইয়াছিল। তাঁহার দয়া, মমতা, স্নেহ সদাশয়তাগুণে তিনি ক্ষত্রিয়-পাঠানে, চণ্ডাল-ডোমে, বাগদী কাওরায়, বঙ্গীয় কায়স্থ-ব্রাহ্মণে এক দৃঢ় স্বাধীনরাজ্য সংস্থাপন-সমর্থ অনীকিনী সংগঠন করিয়া ছিলেন। সীতারাম যেমন হিন্দুমুসলমানে, চণ্ডালে ব্রাহ্মণে, জাতীয়

বা সাম্প্রদায়িক পার্থক্য গ্রাহ্য না করিয়া সকলকেই একতাসূত্রে বন্ধন-পূর্ব্বক একদেশীয় মহাবলের সঞ্চয় করিতেছিলেন, তদ্রূপ শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য প্রভৃতি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিভিন্নতা গ্রাহ্য না করিয়া, তিনি লক্ষ্মীনারায়ণের পার্শ্বে শিব এবং দশভুজার পার্শ্বে রাধার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য্য সীতারামের বংশের শাক্তগুরু ও কৃষ্ণবল্লভ গোস্বামী তাঁহার বৈষ্ণবগুরু ছিলেন, তিনি উভয় গুরুর উপর তুল্য ভক্তি প্রদর্শন করিতেন। তিনি বৈষ্ণব-গুরুকে শান্তিসুখ ও দৈবকার্য্যের উপদেষ্টা এবং শাক্তগুরুকে সমরাদি কার্য্যের পরামর্শদাতা করিয়া উভয় গুরুদেবের আজ্ঞাবহ কিঙ্কর-স্বরূপ থাকিয়া হিন্দুমুসলমান-বিদ্বেষ-রহিত, ব্রাহ্মণচণ্ডালে পার্থক্য-বর্জ্জিত সুদৃঢ়ভিত্তিতে শান্তিময় সুখময় সনাতন ধর্ম্মরাজ্য-প্রতিষ্ঠায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বেলগাছী পরগণার অন্তর্গত নারায়ণপুরের রায়, মহিমসাহী পরগণার ইন্দুরদির দত্ত, সাহা-উজিয়াল পরগণার আমতৈলের চক্রবর্ত্তী, সাঁতৈর পরগণার কুমরুলের দত্ত ও আমগ্রামের সরকার, নলদী পরগণার নহাটার রায় প্রভৃতির শিবত্রসম্পত্তি দৃষ্টে আমরা অনুমান করিতে পারি, ভস্ম-চন্দনে, শ্মশান স্বর্গে, ভেদজ্ঞানবর্জ্জিত ভূতপ্রেত, পিশাচ, যক্ষ, কিন্নর প্রভৃতি নামধেয় অনার্য্যগণের উপাস্যগুরু দেবদেব মহাদেবের বাসন্তী চড়ক উৎসব করিয়া নিম্ন ও উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে একতা ও সদ্ভাবস্থাপনই এইরূপ শিবত্রসম্পত্তি দানের উদ্দেশ্য ছিল। সীতারাম রাজ্যের সর্ব্বস্থানে ধর্ম্মমূলে উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু একমতে সদ্ভাবে পরস্পর পরস্পরের সহায় ও সুহৃদ্ হইয়া অবস্থিতি করেন, ইহাও সীতারামের ধর্ম্মের অঙ্গ ছিল। পারিবারিক শান্তিসুখ

বৃদ্ধি হইয়া প্রত্যেক পরিবারের স্বামী-স্ত্রী লক্ষ্মীনারায়ণরূপে বাস করেন; প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহ ভাণ্ডার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারস্বরূপ হয়, অতিথি অভ্যাগত ব্যক্তি প্রতি গৃহস্থের নিকট সাদরে গৃহীত হয়, এই ধর্ম্মনীতি শিক্ষার নিমিত্ত সাঁতৈর পরগণার আমগ্রামের সরকার, মুন্সী, বিশ্বাস, শিকদার প্রভৃতি কায়স্থ-পরিবার হইতে আরম্ভ করিয়া সীতারামের জমিদারীর প্রত্যেক হিন্দুর জন্য গ্রামের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও কায়স্থদিগকে দেবত্র সম্পত্তি দিয়া তিনি নারায়ণশিলা, গোপীনাথ, গোপাল প্রভৃতি বিগ্রহ স্থাপন করাইয়া দিয়াছিলেন এবং অদ্যাপি অনেক স্থলে উক্ত দেবসমূহের সেবা চলিতেছে। রামাত, আচার্য্য, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি ভিক্ষুক সম্প্রদায়ের লোকদিগকে সমাজে উপকার করিবার ও ভিক্ষাবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত করিবার মানসে তিনি কুঠীয়া তাম্বুলখানা, খড়েরা, লাউজান ও মল্লিকপুরের রামাতগণকে নিষ্কর দেবত্র দিয়া শীতলা বিগ্রহ স্থাপন করিয়া দেন। এই শীতলার সম্পত্তি ভোগ করিতে করিতে তাহারা সম্পত্তির আদর বুঝিয়া সম্পত্তিশালী হইয়া ভিক্ষারূপ হীনবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছে এবং হিন্দুসমাজের পাদদেশে ইতর সম্প্রদায়ের হিন্দুর মধ্যে ধর্ম্মের ক্ষীণালোক প্রবেশ করাইয়া শীতলা উৎসবে তাহাদিগকে সমবেত করিয়া রামাতগণ নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণকে একতাসূত্রে বন্ধন করিতেছিলেন। আচার্য্যগণ সামান্য জ্যোতিষের আলোচনা করিয়া ভিক্ষাবৃত্তিতে কালাতিপাত করিতেন। সীতারাম তাঁহাদিগকে দেবমূর্ত্তি গঠন ও চিত্রপট অঙ্কন শিক্ষা দিয়া তাঁহাদের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ না করিয়া তাঁহাদিগকে নূতন ব্যবসায় অবলম্বন করাইয়াছেন।

পাপময় সংসারে পিচ্ছিল ও পঙ্কিল বর্ত্মে পাদস্খলন হওয়া দুর্ব্বল নরনারীর পক্ষে অসম্ভব নহে। হিন্দুধর্ম্মের অনুদারতার অসারাংশ সীতারামের সময়েই হিন্দুধর্ম্মের পবিত্র অঙ্গ স্পর্শ করিয়াছিল। এই সময়ে সেই অসার কলঙ্ক হিন্দুধর্ম্মের বিমল জ্যোতিঃ সমাচ্ছাদিত করিয়া ফেলিয়াছিল। হিন্দুসমাজপথে যে সকল নরনারীর একবার পদস্খলন হইয়াছে, তাহারা মহাপাপী ও নারকী বোধে হিন্দুসমাজ-প্রান্তে দাঁড়াইতে পারিত না। ভক্তির পূর্ণ অবতার দয়াল শ্রীচৈতন্য এই পাপীদিগকে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন। সীতারাম তাঁহার রাজ্যের মধ্যে সমাজ বিতাড়িত পাপীতাপীদিগকে আশ্রয় দিবার জন্য আমগ্রাম, শিবপুর, কেঁছেডুবি, গোপালপুর, রামনগর, জগন্নাথদি, ঘোষপুর, পয়াবী, বাধাযোড় প্রভৃতি স্থানে বৈষ্ণব মোহন্ত আনিয়া তাঁহাদিগকে দেবত্র নিষ্কর সম্পত্তি দিয়া রাধাকৃষ্ণের নানামূর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক সেই পাপী ও পাপিনীদিগের দাঁড়াইবার আশ্রয় করিয়াছেন। এই সকল সমাজচ্যুত লোক সমাজের বাহিরে থাকিয়া সংসারের পাপস্রোত প্রবলতরবেগে প্রবাহিত করিতে না পারে, এই নিমিত্ত সীতারাম মোহন্তদিগকে এই সকল পাপীদিগের প্রতি সদয় দৃষ্টি রাখিতে বলিতেন এবং তাহারা যাহাতে পুনরায় বৈষ্ণবমতে পরস্পর বিবাহিত হইয়া শান্তিময় পরিবাররূপে বাস করে, তাহাও সীতারামের অভিপ্রায় ছিল। ধর্ম্মমতের সঙ্গে সঙ্গে প্রজার শান্তি ও সুখ-সমৃদ্ধির প্রতিও সীতারামের বিলক্ষণ দৃষ্টি ছিল। লোকে ধর্ম্মপথে থাকিয়া যাহাতে সমাজের, দেশের ও নরনারীর উপকার করিতে পারে, ইহাই তাহার ধর্ম্মপথের মূলমন্ত্র ছিল। সমাজ পতিত হউক, আচার ভ্রষ্ট হউক, সকলেরই পতন নিবারণ

করা এবং দুষ্ট অবস্থা হইতে লোককে লজ্জাশূন্য সদবস্থায় উন্নীত করাও সীতারামের মূল ধর্ম্মনীতি ছিল। অতএব দেখা যাইতেছে, আধুনিক পাশ্চাত্যশিক্ষার আলোকে আলোকিত বঙ্গে আমরা ধর্ম্মমত অনুসরণ করিতে ভীত ও সঙ্কুচিত হই, কিন্তু সীতারাম এখন হইতে দুই শত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গের অন্ধকারযুগে স্নিগ্ধরশ্মি প্রাতঃসূর্য্যের ন্যায় বঙ্গাকাশে সমুদিত হইয়া বঙ্গের পাপপঙ্কে পতিত কম্পিত কলেবর নরনারীদিগকে স্বীয় স্নিগ্ধ করে উত্তপ্ত করিয়া সমাজপথে গমনের শক্তি সম্পন্ন করিয়াছেন। বঙ্গের শাক্তবৈষ্ণববিরোধ দূরীভূত করিয়া মস্তিষ্কশক্তির পূর্ণমূর্ত্তি ব্রাহ্মণগণকে রাজ্যের কল্যাণকামনায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন, হিন্দুর সাম্প্রদায়িক ও জাতীয় পার্থক্য অবহেলা করিয়া উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমান-গণকে কাহারও ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ না করিয়া তিনি একতাসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছিলেন এবং অসংখ্য একতার উপায় ও শান্তি সুখের পথ রক্ষার নিমিত্ত অকাতরে মুক্তহস্তে নিষ্কর দেবত্র সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন।

সীতারাম যেরূপ উচ্চ প্রকৃতির সদাশয় বীর ছিলেন, তাঁহার ধর্ম্মমতও সেইরূপ উদার ও সর্ব্বজনহিতকর ছিল। বর্ত্তমান সময়ে দক্ষিণরাঢ়ীয়, উত্তররাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র শ্রেণীর কায়স্থগণ পরস্পর এক হইয়া পর-স্পরের কন্যা আদানপ্রদান করিতে সভাসমিতির উদ্যোগ ও আয়ো-জনের মহা আড়ম্বর করিতেছেন। সীতারাম এই সাধু চেষ্টা দুই শত বৎসর পূর্ব্বে করিয়া গিয়াছেন। মুনিরাম রায় অগ্রে সীতারামের বাটীতে শুমারনবিস ও পরে মুর্শিদাবাদে উকিল ছিলেন। মুনিরাম বঙ্গজ শ্রেণীর কায়স্থ। মুনিরামও সীতারামের ন্যায় উচ্চাভিলাষী, চতুর ও বাক্‌পটু

লোক ছিলেন, মুনিরামও বিস্তৃত জমিদারী করিবার আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেন। মুনিরামের বংশের জগবন্ধু রায় নামক এক ব্যক্তি এখনও ধুলজুড়ী গ্রামে জীবিত আছেন। মুনিরামের কৃষ্ণ-মন্দিরে আমরা যে কবিতা পাইয়াছি, তাহা পূর্ব্ব অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে।

যখন সীতারামের জমিদারী পাবনা জেলার দক্ষিণভাগ হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত ও নদীয়া জেলায় পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে বরিশাল জেলার মধ্যভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল, সীতারামের শৌর্য্য বীর্য্য সর্ব্বত্র গীত হইতে লাগিল, সীতারামের সুখের কথা সর্ব্বত্র প্রকাশিত হইতে লাগিল, সীতারামের জল-কীর্ত্তির কথা বঙ্গে অভিনব যশোরূপে প্রচারিত হইল, সীতারামের অশেষ যশঃসৌরভে বঙ্গদেশ পরিপূর্ণ হইল, তখন মুনিরামের হৃদয়ে ঈর্ষা-সর্পিণী জাগিয়া উঠিল। যখন সীতারাম মহম্মদপুরে স্বাধীন পতাকা উড্ডীন করিলেন, তখন ভীরু মুনিরামের হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল। সীতারাম কখনও নবাব-সরকারে রীতিমত কর দিতেন না। তিনি আবাদি সনন্দের বলে জমিদারী সমূহ নিষ্কর ভোগ করিতেছিলেন, তিনি মধ্যে মধ্যে নবাব সরকারে নজর সেলামী কিছু কিছু দিতেন। যখন সীতারাম এই নবাব সেলামীর অর্থ ও উপঢৌকন সামগ্রী অল্প পরিমাণে প্রেরণ করিতে লাগিলেন, তখন শঙ্কিতহৃদয় মুনিরাম সীতা-রামের বৈরতা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বুদ্ধিমান্ সীতারাম অল্পদিন মধ্যে মুনিরামের অবস্থা বুঝিলেন। মুনিরামের ন্যায় একজন বিচক্ষণ লোক সীতারামের করভ্রষ্ট হয়, ইহা কদাচ সীতারামের অভিপ্রেত হইতে পারে না। মুনিরামের সহিত ঘনিষ্ঠতার কোন সম্বন্ধ হইলে মুনিরাম সীতারামের শুভাকাঙ্ক্ষী থাকিবেন, এই ইচ্ছায় ও কায়স্থ

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্রতা-দূরীকরণ মানসে সীতারাম উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ হইয়া বঙ্গজ মুনিরামের কন্যা বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিলেন।

মুনিরাম ও তদ্বংশীয় লোকদিগের সমাজনীতি অতি সঙ্কীর্ণ ছিল, সাম্প্রদায়িক অভিমানে তাঁহাদিগের মন অভিমানে পূর্ণ ছিল। মুনিরামের পুত্র প্রকাশ্যে পিতার মত লইয়া সহোদরার সহিত সীতারামের বিবাহ দিবেন বলিলেন, কিন্তু গোপনে বিষপ্রয়োগে ভগিনীর নিধন-সাধন করিয়া পিতার নিকট পত্র লিখিলেন। হতভাগ্য বঙ্গসমাজ! দুর্ভাগ্য বঙ্গের আভিজাত্য সম্মান! অনুতপ্ত বঙ্গের অনুদার সঙ্কীর্ণ সমাজ-নীতি! সীতারামের সাধু ও মহৎ প্রস্তাবে গরল উঠিল। মুনিরাম মনে মনে সীতারামের বৈরী হইয়া উঠিলেন; মুনিরাম পুত্রের কার্য্যের প্রশংসা করিয়া পত্র লিখিলেন। সীতারামের সদাশয় প্রস্তাব ও উচ্চ সমাজ-নীতি মুনিরামের ন্যায় বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি বুঝিলেন না। হতভাগ্য বঙ্গে এই অনুদারতা আর কত কাল লক্ষিত হইবে জানি না। মহামান্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রস্তাবের বিপক্ষে বিচক্ষণ স্যার রাজা রাধাকান্ত দেবও দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। রাজা বাহাদুর যদি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রস্তাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন, তবে আমরা এক্ষণে অনেক বালবিধবার বিষাদ-মলিন-মুখ দেখিতাম না এবং সীতা-রামের প্রস্তাব মুনিরাম বুঝিলে সম্ভবতঃ কায়স্থ-সমাজে বর্ত্তমান সময়ের কন্যাদায়ের ঘোর আতঙ্ক ও আর্ত্তনাদ উপস্থিত হইত না।

পীতাম্বর দত্ত গদখালী থানার নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে বাস করি-তেন, তাঁহার গৃহের এক রমণী মুসলমান কর্ত্তৃক অপহৃতা ও মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিতা হন। পীতাম্বর সে কামিনীকে আর গৃহে আনিলেন না।

পীতাম্বর যশোহর চাঁচড়ার রাজার প্রজা ও সমাজস্থ লোক ছিলেন। উল্লিখিত দোষে পীতাম্বর সমাজচ্যুত হইয়া সীতারামের শরণাগত হন। সীতারাম তাঁহার সভাসদ্ পণ্ডিতগণের সহিত পরামর্শ করিয়া দেখিলেন, পীতাম্বরের কোন দোষ হয় নাই। সেই মুসলমান অপহৃতা ললনাকে গৃহে আনিলে পীতাম্বরের ধর্ম্মহানি হইত। সীতারাম পীতাম্বরকে আপন সমাজে উঠাইয়া লইতে সম্মত হইলেন। পীতাম্বর সীতারাম ও তাঁহার সমাজস্থ ব্যক্তিগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তখন আষাঢ় মাস, ঘনঘটায় দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন—মুষলধারে বৃষ্টিপাত হইতেছে, সৌদামিনী নীলবসন হইতে বসনান্তর গ্রহণ করিয়া নভোমণ্ডলে ক্রীড়া করিতেছেন, নীরদনাদে দিঙ্মণ্ডল কম্পিত হইতেছে, এই দুর্দ্দিনে উদারচরিত সীতারাম সদলবলে রাজা মনোহর রায়ের জমিদারীর মধ্য দিয়া পীতাম্বরগৃহে উপনীত হইলেন। পীতাম্বরের গৃহপ্রাঙ্গণ জল-কর্দ্দম পরিপূর্ণ ছিল, তিনি গোলা ছুটাইয়া ধান্য ছড়াইয়া উঠানের জল কর্দ্দম নিবারণ করিলেন। এই হইতে পীতাম্বরের নাম ধেনো পীতাম্বর হইল। সীতারাম মনোহরকে অগ্রাহ্য করিয়া পীতাম্বরের বাটীতে ভোজন পূর্ব্বক তাঁহাকে সমাজে উঠাইয়া লইলেন।

প্রথমা রাজমহিষীর পিতার নাম সরল খাঁ (ঘোষ) ছিল। সরল খাঁ কুলমর্য্যাদায় বিশেষ সম্ভ্রান্ত ও সমাজপতি ছিলেন। সীতারাম সরল খাঁর সহিত কতিপয় সম্ভ্রান্ত উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ মুর্শিদাবাদ অঞ্চল হইতে আনাইয়া মহম্মদপুর হইতে সাত মাইল পশ্চিমে ঘুল্লিয়া গ্রামে বাস করান। সরল খাঁর বাটীর ভগ্নাবশেষ ও দুইটী পুষ্করিণী অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। সরল খাঁ এত বড় কুলীন ছিলেন যে কথিত আছে, তিনি

কমলাকে ওজন করিয়া সীতারামের নিকট হইতে কন্যাশুল্ক আদায় করিয়াছিলেন। সরলের জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র গোপেশ্বর খাঁ সীতারামের ভগিনী রাই-রঙ্গিণীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সরল খাঁ ও গোপেশ্বর খাঁ একই ভবনে বাস করিতেন। এক্ষণে ঘুল্লিয়ার তালপুকুর নামে যে প্রকাণ্ড পুষ্করিণী আছে, তাহাই খাঁদিগের বাটীর সদর পুষ্করিণী ছিল। সীতারামের বাটীর সন্নিকটে ভবানীপুর নামে একখানি পুরাতন গ্রাম ছিল, সীতারাম নানা দিগ্‌দেশ হইতে নানা রকমের সুমিষ্ট আম্রের কলম আনাইয়া ঐ গ্রামের নিকটবর্ত্তী বহু বিস্তীর্ণ এক উচ্চ ভূমিখণ্ডে রোপণ করাইয়াছিলেন। যথাসময়ে ঐ স্থান সুমিষ্ট আম্র-কাননে পরিণত হয়। সীতারাম কর্ত্তৃক আনীত উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ ঐ আম্রকানন মধ্যে বাসভবন করার অভিপ্রায় করেন; কিন্তু রাজার বহু যত্নে, আদরে এবং বহুব্যয়ে প্রস্তুত প্রভূত আম্রবাগান নষ্ট করিয়া বাসভবন করিবেন, এ বিষয় কেহই রাজার নিকট বলিতে সাহসী হন নাই। পরে সীতারাম ঐ বিষয় লোকপরম্পরায় অবগত হইয়া উক্ত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণকে ডাকিলেন এবং তাঁহাদের এ বাসনা প্রকৃত জানিতে পারিয়া তাঁহাদিগকে ঐ আম্রকাননে বাসভবন নির্ম্মাণ করিতে ও ঐ নবপ্রতিষ্ঠিত গ্রামের নাম "আমগ্রাম" রাখিতে আদেশ করেন। তদনুসারে ঐ গ্রামের নাম আমগ্রাম হয়। কালের কুটিলগতি-প্রভাবে স্রোতস্বতী মধুমতী-নদীগর্ভে সীতারামের এই নবপ্রতিষ্ঠিত সাধের গ্রামখানি লীন হইয়া যায়। পরে গ্রামবাসিগণ সুবিধানুসারে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাসভবন নির্ম্মাণ করেন এবং সীতারামের আদেশানু-ক্রমে নিজ নিজ বাসগ্রামের নাম "আমগ্রাম" রাখিলেন। যশোহর

জেলার মহম্মদপুরের পূর্ব্বপারে বর্ণীআমগ্রাম এবং ফরিদপুর জেলার সোতাসী আমগ্রাম ও খালিয়া আমগ্রাম বিদ্যমান আছে। অনেকে অনুমান করেন, এই গ্রামত্রয় পূর্ব্বে সীতারামের প্রতিষ্ঠিত একই আমগ্রাম ছিল। ইহা জানিয়া আমগ্রামের ব্রাহ্মণ-সমাজ এবং বর্ণী আমগ্রামের কায়স্থ-সমাজ বঙ্গের কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ-সমাজে সুপরিচিত। এই বর্ণী আমগ্রামের বর্ত্তমান সরকার, বিশ্বাস, মুন্সী ও সিকদারগণ এক জাতি হইয়াও তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের সীতারাম-সরকারে কার্য্যের উপাধি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই আমগ্রাম বহুবার নদীসিকস্তি হইয়াও সীতারামরক্ষিত আমগ্রাম নাম বিস্মৃত হয় নাই, কিন্তু অনেকে স্থানভ্রষ্ট হইয়া নানাস্থানে বাটী নির্ম্মাণ করায় সংখ্যাল্পতাবশতঃ ঐ নাম রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। এইরূপে ঐ স্থানভ্রষ্ট অধিবাসিগণ এখনও শত্রুজিৎপুর, মিনাকপুর ও রাইতপাড়া প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন।

সীতারামের একটী কুলীন ব্রাহ্মণ নায়েব ছিলেন। সেই ব্রাহ্মণের ছয়টী ব্রাহ্মণী। তিনি ব্রাহ্মণীগণকে তত যত্ন করিতেন না। তিনি তাহার কোন এক ব্রাহ্মণীর ব্যভিচার দোষ জানিতে পারিয়া গঙ্গাস্নানে লইবার ব্যপদেশে বাদার মধ্যে বিষপ্রয়োগে তাহার বধসাধন করেন। সীতারাম এই দুর্ঘটনা জানিতে পারিয়া নায়েব মহাশয়কে পদচ্যুত ও সমাজচ্যুত করিয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মণের উত্তরপুরুষে অনেক লোক জীবিত আছেন, সুতরাং তাঁহার নাম করিলাম না।

সীতারাম নানাদেশ হইতে অনেক উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য আনাইয়া তাঁহার রাজ্যমধ্যে বাস করাইয়াছিলেন। এই সকল

ভদ্রলোকদিগের প্রতি সীতারাম বিশেষ যত্ন ও শ্রদ্ধা করিতেন। এই সকল ভদ্রলোকের যাহাতে উত্তরোত্তর উন্নতি হয়, তদ্বিষয়ে সীতারাম বিলক্ষণ চেষ্টা করিতেন।

কথিত আছে, সীতারাম কুলীনব্রাহ্মণ কন্যাদায়ে অর্থপ্রার্থী হইলে তাঁহাকে কপর্দ্দকও সাহায্য করিতেন না। কিন্তু বংশজ ও শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণ বিবাহার্থ অর্থপ্রার্থী হইলে তাঁহাদিগকে প্রচুর অর্থ দান করিতেন। তিনি কুলীন-ব্রাহ্মণগণকে তাঁহাদের কন্যা সম্ভ্রান্ত পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে দান করিতে বলিতেন। তিনি কৌলীন্য কুপ্রথায় কুলীন-কুমারীগণের নিদারুণ ক্লেশ দেখিয়া আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিতেন। তিনি বহুসংখ্যক অনূঢ়া কুলীনকুমারীকে আপন গৃহে রাখিয়া মাতৃজ্ঞানে গ্রাসাচ্ছাদন দিয়া প্রতিপালন করিতেন।

মুনিরামের কন্যাকে সীতারামের বিবাহ করিবার প্রস্তাব, ধেনো পীতাম্বরের জাতিদান, গোপেশ্বর, সরল খাঁ ও অন্যান্য ভদ্রলোকের বাসভবন-নির্ম্মাণ, কুলীনকুমারীগণকে প্রতিপালন ও কুলীনের কন্যাদায়ে অর্থসাহায্য না করা প্রভৃতি ঘটনা হইতে আমরা সীতারামের সমাজ-নীতি কিরূপ মনে করিতে পারি? সীতারামের সমাজনীতি উচ্চ ও উদার ছিল। তিনি উত্তররাঢ়, দক্ষিণরাঢ়, বঙ্গ ও বরেন্দ্র এই চারি প্রদেশ-ভেদে চারি কায়স্থ সমাজকে একতাসূত্রে বদ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়াই সাম্প্রদায়িক পার্থক্যের মূলে কুঠারাঘাত করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন।

তিনি অকারণে বা সামান্য কারণে জাতিপাত হওয়ার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু প্রকৃত দোষী সমাজচ্যুত হইবার উপযুক্ত ব্যক্তিকে বিহিত দণ্ডবিধান করিতে যত্নবান্ ছিলেন। কৌলীন্য কুপ্রথা তাঁহার

জ্ঞানদীপ্ত উচ্চ সমাজনীতির চক্ষে বিষদিগ্ধ শলাকাবৎ প্রতীয়মান হইত। জ্ঞানগৌরবে মণ্ডিত, উচ্চ আচার-ব্যবহারে ভূষিত, ধর্ম্মজ্ঞ, ধর্ম্মনিষ্ঠ ভদ্রলোকদিগকে তিনি অনন্ত সমাদর এবং সযত্নে রক্ষা ও পালন করিতেন। অতএব আধুনিক বাঙ্গালী যুবক! বর্ত্তমান সময় হইতে দুই শত বৎসর পূর্ব্বে সীতারামের সমাজনীতি পর্য্যালোচনা করিয়া বঙ্গের কলঙ্ককালিমায় কলুষিত সমাজমার্গে পাদবিক্ষেপের পথ নির্দ্ধারণ করিয়া লও। সাম্প্রদায়িক পার্থক্যের মূলে কুঠারাঘাত কর। কৌলিন্য-কুপ্রথাবিষবল্লরী সমূলে বিনাশ কর। বঙ্গের দগ্ধ-ললাট, মলিনমুখী কুলীন-কুমারীগণের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। আপন ভগিনী, পিতৃস্বসা ও মাতৃস্বসার দুঃখ দূর করিয়া, সমাজ-কালিমা প্রক্ষালন করিয়া নৈতিক সাহসের পরিচয় দাও। উন্নতির প্রথম সোপানে আরোহণ কর, পরে উচ্চ হইতে উচ্চতর কর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বঙ্গমাতার প্রতি দৃষ্টি কর।

একাদশ পরিচ্ছেদ

—o—

সীতারামের সময় শিল্প ও বাণিজ্য

বর্ত্তমান সময়ে বিজ্ঞানালোকে আলোকিত জগতে উত্তম প্রণালীতে উত্তম বর্ণের নানাবিধ কাগজ প্রস্তুত হইতেছে। সীতারামের সময়ে ইংলণ্ডেও কাগজের কল প্রস্তুত হয় নাই, এদেশেও কাগজের কল ছিল না। পাট, কাপড় ও পুরাতন কাগজ পচাইয়া এদেশে একরূপ কাগজ প্রস্তুত হইত। ঐ কাগজকে ভূষণাই কাগজ বলিত। এই কাগজ সীতারামের রাজ্যে সর্ব্বত্র প্রস্তুত ও ব্যবহৃত হইত। কাগজগুলি ২০।২২ ইঞ্চি দীর্ঘ ও ১২।১৩ ইঞ্চি প্রস্ত ছিল। এই সকল কাগজ দুই বর্ণের ছিল। ঈষৎ সবুজ শ্বেতবর্ণের ও হরিদ্রা বর্ণের কাগজ প্রস্তুত হইত। সবুজবর্ণের কাগজে হরিতালের রঙ লাগাইলেই হরিদ্রা বর্ণের কাগজ হইত। এই কাগজকে তুলট কাগজ বলিত। এই কাগজের লম্বা পুঁথি এতদঞ্চলের ব্রাহ্মণগৃহে বহুল পরিমাণে লক্ষিত হয়। এই কাগজ স্থায়ী ও পুরু। এই কাগজ সর্ব্বাগ্রে সীতারামের জমিদারী ভূষণায় প্রস্তুত হইত বলিয়া ভূষণাই-কাগজ নাম হইয়াছিল। আমি বাল্যকালে এই কাগজ নলদীপরগণায় তল্লাবেড়ে, বিনোদপুর, রামপুর, সাহা উজিয়ালের বরিসাট প্রভৃতি গ্রামে প্রস্তুত হইতে দেখিয়াছি। আমরা সীতারামের দত্ত যতগুলি সনন্দ পাইয়াছি, সকলই এই কাগজে

লিখিত। সীতারামের রাজ্য মধ্যে এই কাগজ সীতারামের যত্নে বহুল পরিমাণে প্রস্তুত হইত। এই সময়ে কাগজ ব্যবসায় আমাদের দেশ বিলাত অপেক্ষা কম ছিল না।

বস্ত্রবয়নকার্য্যও সীতারামের রাজ্যমধ্যে উত্তমরূপ হইত। তল্লাবেড়ের মিহি উড়ানি অদ্যাপি এ অঞ্চলে বিখ্যাত। সীতারামের রাজ্য মধ্যে অনেক জোলা, যুগী ও তন্তুবায়ের বাস আছে। ইহারা সকলেই বস্ত্রব্যবসায়ী ছিল। বিলাতী বস্ত্রের প্রতিযোগিতায় এ সকল বস্ত্রব্যবসায়ী দিগের ব্যবসা একেবারে মাটী হইয়াছে। আমি বাল্যকালে বিনোদপুর, তল্লাবেড়ে, আমতৈল, তালখড়ি, নলদী, চণ্ডীবরপুর, সাঁতৈর, কানাই-পুর, মকিমপুর প্রভৃতি গ্রামে উত্তম উত্তম ধুতি, সাড়ী ও উড়ানি প্রস্তুত হইতে দেখিয়াছি। বর্ত্তমান যশোহর জেলার সৈদপুর ও মুরলীর হাট হইতে ইউরোপীয় বণিকগণ এই সকল বস্ত্র বহুল পরিমাণে ক্রয় করিতেন। বালিসের খেরো ও ছিট, তোষকের খারুয়া ও লেপের খারুয়া প্রভৃতি পূর্ব্বেও হইত, এখনও স্থানে স্থানে প্রস্তুত হয়। এই সকল বস্ত্র বিশুদ্ধ কার্পাস সূত্রে প্রস্তুত হইত। সীতারামের রাজ্যে স্থানে স্থানে তুঁতের চাষ ছিল এবং কোন কোন স্থানে রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত হইত; কার্পাস বস্ত্র হইতেও নানাবিধ রঙ্গিণ বস্ত্র ও পাকা ছিট প্রস্তুত হইত।

সাঁতৈর পরগণার সাঁতৈর গ্রামে অদ্যাপি উত্তম পাটী প্রস্তুত হইয়া থাকে। পাতিয়া নামক এক জাতি এই পাটী প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করে। সীতারামের সময় এই পাটী প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত ও নানা দিগ্‌দেশে রপ্তানি হইত। সীতারামের জমিদারীর মধ্যে স্থানে স্থানে

কাপালী নামক এক জাতির বাস আছে। ইহারা পাটের চিক্কণ তন্তু প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা উত্তম থলিয়া (ছালা) ও চট প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া থাকে। পূর্ব্বে এই চট ও থলিয়া বহু পরিমাণে প্রস্তুত ও বিদেশে রপ্তানি হইত। এই চট ও থলিয়া কলের চট ও থলিয়া অপেক্ষা স্থায়ী ও সুন্দর।

সীতারামের রাজ্যে বহুসংখ্যক ছুতার মিস্ত্রীর বাস। ইহারা উত্তম-রূপ পিড়ি, খাট, তক্তপোষ, চৌকী, বাক্স, সিন্দুক, গাড়ী, পাল্কী, নৌকা প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে জানিত এবং এখনও জানে। সৈদপুরে পানসী এ অঞ্চলের বিখ্যাত ব্যবসায়ী মহাজনী নৌকা। তেলিহাটীর বাঙ্গালা দূরদেশে মালবহনের উপযোগী। এ সব কারিকরগণ এ সকল কাষ্ঠের কার্য্য সীতারামের সময় হইতেই করিয়া আসিতেছে। ইহারা দেবমূর্ত্তি ও রথ প্রভৃতি নির্ম্মাণেও পূর্ব্বে বিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছিল। সাতারামের রাজধানীতে কামারপটী নামক একটী স্থান আছে। কিন্তু এখন মহম্মদপুরে কর্ম্মকার নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কথিত আছে, সীতারামের পতনের পর মুসলমান-সৈন্যগণ যখন মহম্মদপুর লুণ্ঠন করে, তখন এই সকল কর্ম্মকারগণ পলায়নপূর্ব্বক কানুটীয়া, বাটাজোড়, লোহাগড়া, লক্ষ্মীপাশা, নল্‌দী, মাচপাড়া, নড়াইল, পুলুম প্রভৃতি স্থানে যাইয়া বাস করে। কানুটিয়ার ক্ষুর, ছুরি, কাটারি, খড়্গ, বল্লম, শড়কী প্রভৃতি বহুকাল এতদঞ্চলে বিখ্যাত ছিল। বাটাজোড় প্রভৃতি অঞ্চলের কর্ম্মকার-গণও ঐরূপ সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যই উত্তমরূপে গড়িতে পারে। সীতারামের যুদ্ধাস্ত্র, কামান, বন্দুক, অসি, বল্লম, শড়কী প্রভৃতি তাঁহার রাজধানীতে প্রস্তুত হইত। কথিত আছে, সীতারাম এই সকল কর্ম্মকারদিগকে

ঢাকা অঞ্চল হইতে আনাইয়াছিলেন। কালে খাঁ ঝুম্‌ঝুম্ খাঁ নামক দুইটী কুম্ভীর এক্ষণে বাগেরহাটের অন্তর্গত খাঞ্জেয়ালীর দীঘীতে আছে। ঐ দুই নামে সীতারামের দুই বৃহৎ কামান ছিল। তদ্রূপ কামান তখন বঙ্গদেশে আর ছিল না। ঐ দুই কামানের সহিত কুম্ভীরের আকারের সাদৃশ্য থাকায় উহাদের নাম কালে খাঁ ও ঝুম্‌ঝুম্ খাঁ হইয়াছে।

উপরোক্ত কর্ম্মকারগণের মধ্যে, অনেকে উত্তমোত্তম স্বর্ণরৌপ্যের গহনা গঠনে বিচক্ষণতা দেখাইয়াছিল। ইহারা ধাতুময় দেবমূর্ত্তিও উত্তম রূপ গড়িতে পারিত। এক্ষণে কলিকাতার সিমলা, জানবাজার ও কালীঘাট অঞ্চলে যে সকল কর্ম্মকারগণ বাস করিয়া বঙ্গবিখ্যাত উত্তম উত্তম গহনা গঠন করিতেছে, তাহারা অনেকেই মহম্মদপুর রাজধানী ও সীতারামের রাজ্য হইতে গিয়াছে। মহম্মদপুর রাজধানীর কর্ম্মকারপূর্ণ কানুটীয়া আজ জঙ্গলাবৃত ও কর্ম্মকারশূন্য। মহম্মদপুরের বাজারের কর্ম্মকারপটী আজ মাঠে ও জঙ্গলে পরিণত। মহম্মদপুর রাজধানী ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে উত্তম উত্তম তাম্র, পিত্তল ও কাংস্যের দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইত। এখানকার কর্ম্মকারেরা উত্তম উত্তম পিতল-কাঁসার হুক্কাও গড়িতে জানিত। বাখরগঞ্জের বড় বড় ঘটা প্রথম মহম্মদপুরেই গঠিত হয়। মহম্মদপুরে বড় বড় পুষ্পপাত্র ও খাঞ্চিয়া প্রস্তুত হইত। মহম্মদ-পুরের কাংস্যবণিক্‌গণ বাটাজোড়, শৈলকুপা, দৌলতগঞ্জ, কলসকাটী প্রভৃতি স্থানে চলিয়া যায়। সীতারামের জমিদারী মধ্যে নলুয়া নামক এক মুসলমান-সম্প্রদায় আছে। ইহারা বাদাবন হইতে নল কাটিয়া আনিয়া উত্তম দড়্মা ও মলুয়া প্রস্তুত করিতে পারে। মলুয়া ম্যাটিংএর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। দরিদ্র লোকেরা গৃহমধ্যে কেবলমাত্র মলুয়া

বিস্তার করিয়া শুইয়া থাকিতে পারে। সীতারামের সময় এই মলুয়ার খুব উন্নতি হইয়াছিল ও এই মলুয়া নানাদেশে যাইত। সীতারামের রাজ্যে কোলা, জালা, কলসী, সানুক, ঘাঙ্গড়, পেচি, প্রদীপ, কলিকা, দেলুখা, টালি ও ছবিবিশিষ্ট ইষ্টক অতি উত্তম হইত। মৃন্ময় দ্রব্য পোড়াইয়া কাল প্রস্তরের ন্যায় করিতে পারিত ও পারে। অদ্যাপি বাবুখালিতে সামান্যরূপ টালির কারখানা আছে। ইংলণ্ডে পোর্সিলেন পাত্র আবিষ্কার হইবার পূর্ব্বে এই অঞ্চলের কাল রঙ্গের সানুক, জালা, কুজো বা সরাই ইউরোপীয় বণিকগণ ক্রয় করিয়া স্বদেশে লইয়া যাইত। আলাইপুরের জালা, ঠাকুরপুরার কোলা অদ্যাপি আদরে অনেক স্থানে গৃহীত হইয়া থাকে। সীতারামের রাজ্যে উভয় ইক্ষু ও খর্জ্জূরের উত্তম চিনি প্রস্তুত হইত। এদেশে গাজীপুরের ও কলের চিনির আমদানী হইবার পূর্ব্বে বেলগাছির ইক্ষু চিনি অতি প্রসিদ্ধ ছিল ও তাহা এদেশ হইতে নানাদেশে রপ্তানি হইত। খর্জ্জূরের চিনি, পাটালি ও গুড় বিলক্ষণ প্রসিদ্ধ ছিল। নারিকেলবাড়ে, বুনাগাঁতি, বিনোদপুর, নাওভাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে খর্জ্জূর চিনি প্রস্তুত করিবার অনেক কারখানা ছিল। নাওভাঙ্গার কুরিচৌধুরিপরিবার খর্জ্জূর চিনির কারখানা করিয়া বিশেষ সঙ্গতিপন্ন ও বিষয়ী লোক হইয়াছিলেন। চিনির কারবারে তখন এতই আয় হইত যে, অনেক ব্রাহ্মণকায়স্থও চিনির কারবার করিতেন। তখন খেজুরে চিনির নাম ছিল পাঁকা ও কাঁচা দলুয়া।

গব্যদধি, ক্ষীর, ছানা, ঘৃত, মাখন,সর প্রভৃতি সীতারামের রাজধানী ও জমিদারীতে যেরূপ উৎকৃষ্টরূপে প্রস্তুত হইত, এরূপ উৎকৃষ্ট গব্য দ্রব্য বঙ্গের আর কোথাও প্রস্তুত হয় না। অদ্যাপি মহম্মদপুরের অন্তর্গত

কানাইপুর, বিনোদপুর, নাওভাঙ্গা, নহাটা প্রভৃতি গ্রামে যেরূপ উৎকৃষ্ট উল্লিখিত দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়, অন্যত্র সেরূপ হয় না। তৎকালে ভয়সা ঘৃত, দধি প্রভৃতির এদেশে চলন ছিল না। কোন কোন স্থানে ভয়সা দুগ্ধে দধি প্রভৃতি প্রস্তুত হইত বটে, কিন্তু তাহা উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা ব্যবহার করিতেন না।"

মহম্মদপুরে মুড়কী ও মণ্ডা অতি উৎকৃষ্টরূপে প্রস্তুত হইত। মহম্মদপুরের কুরিগণ যাহারা সীতারামের পতনের পর নাওভাঙ্গা, নারায়ণপুর, শত্রুজিৎপুর প্রভৃতি গ্রামে বাস করিত, তাহাদের উত্তরপুরুষেরাও উৎকৃষ্ট সন্দেশ মুড়কি প্রস্তুত করিতে পারিত। এ অঞ্চলে সীতারামের সময় অনেক বিল ছিল। বিলের তীরে পঙ্কে এক প্রকার উদ্ভিজ্জ জন্মিত, তাহার নাম বলুঙ্গা বা শর-বলুঙ্গা। নমঃশূদ্র ও কাপালি-জাতীয় লোকেরা বলুঙ্গা কাটিয়া একরূপ মোটা মাদুর প্রস্তুত করিত। ঐ মাদুর বসিবার ও শয্যার নিম্নে পাতিবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী ছিল।

প্রাচীনকালে এ অঞ্চলে বহু সংখ্যক বেতস-লতার বন ও বেতস লতা ছিল। মুচিগণ ঐ সকল বেতস কর্ত্তনপূর্ব্বক উত্তম উত্তম ধামা, কাঠা, সের, পেটরা, ঝাপি, তুলাদণ্ডের পাল্লা, ঢাল প্রভৃতি প্রস্তুত করিত। পেটরা ও ঝাপি এদেশ হইতে দূরদেশে রপ্তানী হইত। বেত ও বাঁশের দ্বারা বড় বড় ছোট ছোট নানাবিধ মোড়া প্রস্তুত হইত। মুচি ও বাউতিগণ বংশ-শলাকার দ্বারা কুলা, ডালা, ধুচনি, ঝাকা, ঝুড়ি, চুপড়ী, চাঙ্গাড়ী, ঘুরণি প্রভৃতি প্রস্তুত করিত।

সীতারামের যুদ্ধে ব্যবহার্য্য বারুদ গোলাগুলি মহম্মদপুরে প্রস্তুত হইত। বারুদ মালাকার জাতীয় লোকে প্রস্তুত করিত। এই মালা-

করেরাই সুন্দর সুন্দর ডাকের সাজ প্রস্তুত করিয়া মধুখালি লোহাগড়া প্রভৃতি স্থানে বিক্রয় করিত। এক্ষণে সেই মালাকরগণের বংশধরগণ বাটাজোড়, কুলসুর, নলদী, সাঁতৈর প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছে। ইহারাও নানারকমের বাজি ও বারুদ প্রস্তুত করিতে পারে। সীতা-রামের সময় ইহারা নানাবিধ সোলার ফুল, পাখী ও জন্তুর ছবি প্রস্তুত করিত এবং তদ্বংশধরগণ এখনও পারে। দেশীয় চামারেরা চটি ও নাগরাই জুতা প্রস্তুত করিত।

সীতারামের রাজধানীতে উত্তমরূপ নানা দেবদেবী, নানাপ্রকার পশু ও নরমূর্ত্তি গঠন এবং চিত্রপট অঙ্কিত হইত। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, আচার্য্যগণ চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিল। তাহারা এ নূতন বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইয়াছিল। সীতারামের রাজধানীর প্রতিমাগঠন প্রণালীকে ভূষণাই ও বাটাজুড়ি গঠন বলে। এরূপ গঠন নদীয়ার গঠন অপেক্ষা মন্দ নহে। সীতারামের পতনের পর এই সকল প্রতিমাগঠন-কারী কারিকরের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তিকে পেশ্‌কার ভবানীপ্রসাদ গাজনায় লইয়া যান। গাজনার গঠনপ্রণালীকে ভূষণাই-গঠন কহে। যে সকল কারিকর বাটাজোড় আসিয়া বাস করে, তাহাদের গঠন-প্রণালীর নাম বাটাজুড়ী গঠন হয়। প্রকৃতপক্ষে ভূষণাই ও বাটাজুড়ী গঠনপদ্ধতিতে কোন পার্থক্য নাই। সীতারামের পরেও বাটাজোড়ের রামগতি পাল ও মধুপাল প্রভৃতি এ অঞ্চলে আসিয়া প্রতিমা গঠন করিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। আচার্য্য ও চিত্রকরগণ প্রথমে মুন্সী বলরাম দাসের সহিত কাদিরপাড়ার নিকটে কূপড়ীয়া গ্রামে পলায়ন করে। কালসহকারে তাহাদের বংশবৃদ্ধি হইলে কতক কুপড়ীয়ায় থাকে

ও কতক আড়কান্দি প্রভৃতি স্থানে চলিয়া যায়। অল্পদিন হইল আচার্য্যজাতির মধ্যে চিত্রকর রাধিকানাথ আচার্য্য চিত্রবিদ্যায় বিলক্ষণ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। বাকস্, বেল, তুলসী প্রভৃতি কাষ্ঠে এদেশে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানাবিধ উত্তম মালা প্রস্তুত হইত। এই মালা বৈরাগী ও নমঃশূদ্রগণ প্রস্তুত করিত। এখনও কাওয়ালীপাড়া প্রভৃতি গ্রামে অনেক মালা প্রস্তুত হইয়া থাকে। উক্ত মালা এদেশ হইতে নানাদেশে রপ্তানি হইত। মালাব্যবসায়ীগণ হাজার হাজার টাকা দাদন দিয়া এই মালা গড়াইয়া লইত। এ অঞ্চলে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ চিত্রিত ও রঞ্জিত নানাবিধ তালবৃন্ত প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা সীতারামের সময় হইতে প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে।

সীতারামের রাজ্যে দেশী যাঁতায় উৎকৃষ্ট ময়দা এবং চরকা ও টিপে উত্তম মিহি সূতা প্রস্তুত হইত। এই সূতা ও ময়দা বিদেশে রপ্তানি হইত। সীতারামের সময়ে এদেশে কৃষিকার্য্যের বিস্তার ও কৃষিজাত দ্রব্যের বৃদ্ধি হয়। কৃষিকার্য্যে সেই সময় হইতে এদেশে ষষ্টিক বা বোরো, আশু ও হৈমন্তিক ধান্য; যব, গম, রাই, সর্ষপ, তিল, মসিনা, এরণ্ড, মুগ, মটর, ছোলা, মসুরি, খেসারী, অরহড়, ঠিকরি-কলাই ও মাসকলাই উৎপন্ন হইতে থাকে। বোরো ধান্যের আইলে মিটা কুমড়া, গেমি কুমড়া, ক্ষীরা, শশা প্রভৃতি উৎপন্ন হইতে থাকে। তরকারার মধ্যে পটল, উচ্ছে, ঝিঙ্গে, বেগুণ, কলা, নানাজাতীয় আলু, লাউ, কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি সমধিক উৎপন্ন হইত। তুলা, পাট ও ইক্ষু মন্দ জন্মিত না। ফলফুলারীর মধ্যে নারিকেল ও সুপারি যথেষ্ট জন্মিত। আম কাঁটাল প্রভৃতির বাগান নূতন প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।

পূর্ব্বে কতকগুলি কিম্বদন্তীর উল্লেখ করিয়াছি। গুপ্তধন সীতারামকে ডাকিত এবং ভূগর্ভের অর্থ সীতারাম যাক-মন্ত্রবলে জানিতে পারিতেন, ইহা অলঙ্কারপূর্ণ বাক্যমাত্র। সীতারামের শান্তিময় সুখময় দেশে কৃষি-শিল্পের উন্নতি হওয়ায় ও বাজার বন্দর উন্নতিশীল হওয়ায় সীতারাম যে কার্য্যে হস্তপ্রসারণ করিতে লাগিলেন, তাহাতে প্রচুর অর্থ হইতে লাগিল। বহুদিনের পতিত জঙ্গলাবৃত দেশ পরিষ্কৃত হইয়া জলকষ্ট পথকষ্ট বাজার ও দোকানের কষ্ট দূর হওয়ায় দেশ জনাকীর্ণ হইতে লাগিল এবং ক্ষেত্রে দশগুণ শস্য উৎপন্ন হইতে লাগিল। প্রকৃতপক্ষে সীতারাম ভূগর্ভে বা ডাকাইতদলনে এত অর্থ পান নাই যে, তদ্দ্বারা তাঁহার অনুষ্ঠিত বহু-সংখ্যক সাধু-কার্য্যের একটীরও কোন অংশ সম্পন্ন হইতে পারে। অর্থ ভূগর্ভে জন্মে না। এ অঞ্চলে কেহ বিশেষ বড়লোক ছিলেন না যে, যে সে স্থানে অর্থ প্রোথিত করিয়া রাখিবেন। দস্যুগণ অর্থ সহজে আয় ও সহজে ব্যয় করে। তাহারা পূজার ও পানদোষে অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া ফেলিত। বিশেষতঃ তাহারা কে কোন সময়ে ধরা পড়ে এবং কে তাহাদিগের দস্যুতালব্ধ অর্থ আবার দস্যুতা করিয়া লইয়া যায় এই আশঙ্কাও তাহাদিগের ছিল। দ্বিতীয়তঃ অনেক ডাকাইত অনেক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিত।

সীতারামের সময়ে মধুখালী, সৈদপুর, পাংশা, কুমারখালী, লোহা-গড়া, মুরলী প্রভৃতির হাট হইতে ইউরোপীয় বণিক্‌গণ যথেষ্ট তুলা, কাপড়, মেটেবাসন, চাউল, গোধূম ও ময়দা ক্রয় করিত। দেশীয় লোকেরা বড় বড় সৈদপুরে পান্‌সী ও তেলীহাটীর বাংলায় করিয়া চাউল, গোধূম, বস্ত্র, তৈল, মুগ, মাষ ও মটরকলাই প্রভৃতি লইয়া তাণ্ডা,

পাটনা, কাশী ও এলাহাবাদ প্রভৃতি সহরে বিক্রয় করিতে যাইত। নারিকেল, সুপারি, হরিদ্রা, লঙ্কা ও চিনি ঐরূপ নৌকাপথে পশ্চিম অঞ্চলে যাইত। দেশীয় সদাগরগণ নৌকাপথে চিনি, তৈল, মেটেবাসন জুতা, কাপড়, মুগ, মটর প্রভৃতি কলাই লইয়া পূর্ব্ব-উপদ্বীপ, মান্দ্রাজ, লঙ্কা, ও বঙ্গোপসাগরের দ্বীপপুঞ্জে যাতায়াত করিত। স্থূলকথা, সীতারামের সময় দেশীয় বাণিজ্যের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। বড় জাহাজ না থাকিলেও বড় বড় চারিহাজার পাঁচহাজার-মণি নৌকায় সমুদ্রের ধার দিয়া দেশীয় বণিক্‌গণ দূরদেশে যাইতে ভয় করিত না। সীতারাম বণিক্‌সম্প্রদায়কে দূরদেশে যাইয়া বাণিজ্য করিতে বিশেষ উৎসাহিত করিতেন এবং বিদেশীয় বণিক্‌গণের সহিত তিনি বাণিজ্যবিষয়ক আলাপ করিতেন। কথিত আছে, সীতারাম চিত্তবিশ্রামভবনে দেশীয় পণ্ডিত, বিদেশাগত দেশীয় বণিক্ ও বৈদেশিক বণিক্‌গণের সহিত কথোপকথন করিতেন। তিনি কোন নূতন দ্রব্য উপহার পাইলে বণিক্‌গণকে বিশেষ পারিতোষিক দিতেন। কোন সময়ে দক্ষিণ-সমুদ্রাগত এক দেশীয় বণিকের নিকট একজোড়া নারিকেলের হুকার খোল উপহার পাইয়া তিনি একসহস্র মুদ্রা পুরস্কার দিয়াছিলেন। কোন সময়ে এক শিকারী সীতারামকে একখানি সুবৃহৎ ব্যাঘ্রচর্ম্ম দেওয়ায় সীতারাম তাহাকে একজোড়া কাশ্মীরীশাল ও ৫৫০্ টাকা পুরস্কার দেন। ইহাতে সীতারামের মুন্সী বলরাম দাস দুঃখিত হইয়া মৃদুস্বরে তাঁহার পার্শ্বচরের নিকট কি বলিতেছিলেন, তাহাতে সীতারাম হাসিয়া বলিলেন—"এ সাহসের পুরস্কার। আমার একজন প্রজার জীবনের মূল্য ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক।" সীতারামের রাজ্যে পাণ যথেষ্ট জন্মিত। এখনও

মধ্যবঙ্গ রেলগাড়ীতে পাণই বেশী রপ্তানি হয়। সে সময়ে এ অঞ্চলে শ্রীহট্টের পাথর পোড়ার চূণ আসিত না। বাউতী ও চুলিয়া নামক জাতি বিল ঝিল হইতে শামুক ঝিনুক কুড়াইয়া ও পোড়াইয়া যে চূণ প্রস্তুত করিত, তাহাই তাম্বূলের সহিত ও অট্টালিকাদি নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হইত।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সীতারামের বিলাসিতা ও সীতারামী সুখ

সীতারামের প্রাদুর্ভাবকাল বঙ্গের অন্ধকার যুগ। এ যুগের রুচির পরিচয় দিতে হইলে যুগপৎ লজ্জা ঘৃণার উদয় হয়। পাঠকগণ এই অধ্যায় পাঠকালে মনে রাখিবেন, এই অন্ধকার যুগে বাঙ্গালীর কতদূর পতন হইয়াছিল। এক কথায় এই কালের রুচির পরিচয় দিতে হইলে, আমি পাঠকগণের নিকট লজ্জিতভাবে নিবেদন করি, তাঁহারা যেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় রচিত ও পঠিত বিদ্যাসুন্দর কাব্যের সর্গ বিশেষ মনে করেন। যখন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় সেই কাব্যের সেই সর্গ রচিত ও পঠিত হইয়াছে, তখন সাধারণের রুচির কতদূর বিকার জন্মিয়াছিল! কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় গোপাল ভাঁড় ও অন্যান্য পারিষদবর্গের রসিকতা-বিষয়ে অনেকেই অনেক গল্প জানেন। ভাঁড়-বধূর নিকটে মধু প্রার্থনা ও তদুত্তরে ভাঁড়প্রক্ষালিত জল পাইবার উক্তি, শান্তিপুরের রাসমেলায় রাজকুল-ললনাগণের যাইবার প্রস্তাবে গোপাল ভাঁড়ের থলিয়া পরিধান ও গলদেশ হইতে পাদদেশ পর্য্যন্ত কণ্টকে বেষ্টন করিয়া রাজপুর-স্ত্রীগণের সঙ্গী হওয়ার কথা ও তদুপলক্ষে গোপালের উক্তিবিষয়ক গল্প তৎকালের রুচির সম্পূর্ণ পরিচয় দিতেছে। এই কালে ইন্দ্রিয়সেবা ও বিলাসিতা বড়লোকদিগের কার্য্যের একটী অঙ্গ ছিল। যে যাহাকে যত বড় করিতে চাহিত, তাহার সম্বন্ধে কুরুচির পরিচায়ক, ঘৃণিত গল্পও তত রচনা করিত। এই সময়ে নবাবের

ফৌজদারগণও নবাব বলিয়া পরিচিত হইতেন। নবাব ফৌজদার ও কোন কোন জমিদার যে ইন্দ্রিয়সেবার জন্য অনেক ঘৃণিত কার্য্য করিতেন, তাহার সন্দেহ নাই। আইন আদালত-বর্জ্জিত কেবল অত্যাচার দ্বারা রাজ্যশাসনপ্রণালীতে রাজ্য ধর্ম্মহীন হইলে যে সকল দুষ্ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইতে পারে, তাহা এই সময়ে হইতেছিল।

সীতারাম শৌর্য্যবীর্য্যে বড়, সীতারাম দানধ্যানে বড়, সীতারাম দেবকীর্ত্তি ও জলকীর্ত্তিতে বড় জানিয়া যাহারা মূর্খ ও ইন্দ্রিয়দাস তাহারা সীতারামকে ইন্দ্রিয়সেবায় ও বিলাসিতায় বড় করিবার জন্য তাঁহার সম্বন্ধে কতকগুলি অলীক গল্প রচনা করিয়াছিল। তন্মধ্যে অশ্লীল গল্পগুলি বাদে অবশিষ্ট গল্পগুলি এই ঃ—

১। একটী ইষ্টকনির্ম্মিত বৃহৎ চৌবাচ্চা ছিল। প্রতিদিন এই চৌবাচ্চা সুশীতল গোলাপ জলে পূর্ণ করা হইত। সীতারাম সেই গোলাপ জলে স্নান করিতেন। স্নানান্তে গোলাপ জল ফেলিয়া দেওয়া হইত।

২। প্রতিদিন প্রাতে গাভী দোহন করিয়া যে দুগ্ধ হইত, তাহা হইতেই মধ্যাহ্ন ভোজনের ঘৃত, মাখন, ক্ষীর, সর ও মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইত। আবার ঐরূপে বৈকালিক গব্য আহার্য্য প্রস্তুত হইত।

৩। সীতারামের বৈঠকখানায় মর্ম্মর-প্রস্তরের চৌবাচ্চায় সুগন্ধি সুরা রক্ষা করা হইত এবং সেই চৌবাচ্চার নিকটে রৌপ্য ও স্বর্ণময় খঞ্চায় রাশি রাশি চাটনি রাখা হইত। যাহার ইচ্ছা সেই সুরা পান করিতে পারিত।

৪। সীতারাম বালকবালিকাদিগকে স্রোতস্বতী নদীতে ফেলিয়া তাহাদের মৃত্যুকালের আর্ত্তনাদ শুনিতেন ও কষ্ট দেখিতেন।

৫। অধুনা বিজ্ঞান-আলোকিত ইউরোপ খণ্ডের পারাবতের শিক্ষা ও কার্য্যের কথা শ্রবণ করিয়া আমরা চমৎকৃত ও বিস্মিত হই, কিন্তু আমরা আমাদিগের দেশের মহাত্মগণের কার্য্য কিছুমাত্র স্মরণ করি না। সীতারাম বহুসংখ্যক পারাবত পুষিয়াছিলেন। সীতারাম পারিষদগণের সহিত গমনকালে এই সকল পারাবত তাঁহাকে ছায়া করিয়া চলিত; তাঁহার আর ছত্র-ব্যবহারের প্রয়োজন হইত না। সীতারামের সভাস্থলেও এই সকল পারাবত পক্ষ-ব্যজন করিয়া তালবৃন্ত ব্যজনের কার্য্য করিত। এই সকল শিক্ষিত পারাবত সংবাদ-বাহকের কার্য্যও করিত।

৬। সীতারামের ত্রিশ চল্লিশ দাঁড়ের বজরা ও দেড়শত কি দুইশত বঠিয়ার ছিপ ছিল। তিনি এই সকল নৌকায় দশ দিনের পথ এক দিনে যাতায়াত করিতে পারিতেন। বজরাগুলি দেবী চৌধুরাণীর বজরা অপেক্ষা সুন্দররূপে সজ্জিত থাকিত।

৭। দেশীয় কার্পাসসূত্রবিনির্ম্মিত অতি সূক্ষ্ম ধোলাই বস্ত্র সীতারাম ব্যবহার করিতেন। এক দিনের বেশী একখানা বস্ত্র ব্যবহার করিতেন না।

৮। সীতারামের সহিত ২২ শত বেলদার সৈন্য সর্ব্বদাই থাকিত। তিনি যে দিন যে স্থানে যাইতেন, সেইদিন সেই স্থানে নূতন পুষ্করিণী খনন করাইয়া তাহাতে স্নান ও পূজা করিতেন। সীতারামের জমিদারী মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র বৃহৎ পুষ্করিণী দৃষ্ট হয় এবং সেগুলি সীতারামের ভ্রমণ উপলক্ষে খনন করা হইয়াছে বলিয়া লোকের বিশ্বাস।

৯। শীতকালে সীতারামের শয়নের নিমিত্ত প্রতিদিন তুলা ধুনিয়া

ধোলাই মোটা চাদর পাতিয়া ইস্ত্রী করিয়া দেওয়া হইত এবং পরদিন প্রাতে সেই তুলা অপসৃত করা হইত।

উল্লিখিত আরও ভালমন্দ অনেক কিম্বদন্তী সীতারামের বিলাসিতা সম্বন্ধে প্রচলিত আছে। এই সকল কিম্বদন্তীর কোন কোনটী অসার ও কাল্পনিক, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। যে মহাত্মা দীর্ঘকাল ইউরোপীয় নাইটের ন্যায় বনে জঙ্গলে, পথেপথে, অর্দ্ধাশনে,অনশনে থাকিয়া আষাঢ়ের বৃষ্টিধারা ও পৌষের শীত অনাবৃত মস্তকে ও দেহে সহ্য করিয়া দস্যু-দলন করিয়াছিলেন, যিনি পাবনা জেলার দক্ষিণাংশ হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত শান্তিময়, সুখময়, পুণ্যময়, স্বাধীন হিন্দুরাজ্য অত্যল্প সময়ের মধ্যে স্থাপন করিয়াছিলেন, যিনি জলকীর্ত্তি ও রাস্তানির্ম্মাণ দ্বারা নিম্নবঙ্গদেশ সুশোভিত করিয়াছিলেন, যিনি দেবালয় ও দেবমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠার দ্বারা সনাতনধর্ম্মের উত্তম শিক্ষার উপায় করিয়াছিলেন, যিনি অকাতরে নিষ্কর ভূমিদান করিয়া উচ্চশ্রেণীর লোক আনাইয়া এদেশে বাস করাইয়াছিলেন, যাঁহার রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ও নরহিতাকাঙ্ক্ষা উচ্চ হইতে উচ্চতর ছিল, তিনি কি কখন সুরাসক্ত রমণী-আসঙ্গলিপ্সু নিষ্ঠুর বিলাসী হইতে পারেন? পার্শ্ববর্ত্তী ভূস্বামিগণের কুক্রিয়াদর্শনে যাহারা মর্ম্মপীড়া পাইত না, যাহারা কালভেদে, রুচিভেদে কুক্রিয়াকে আস্পর্দ্ধার বিষয় মনে করিত ও যাহারা ইন্দ্রিয়সেবা একটী উচ্চ অঙ্গের কার্য্য মনে করিত, তাহারা তাহাদিগের কদর্য্য রুচির দোষে এই সকল মিথ্যা বিলাসিতার গল্প সীতারামে আরোপ করিয়াছে। সম্রাট্ হইতে ফৌজদার পর্য্যন্ত সকলকেই সীতারামকে ভয় করিয়া চলিতে হইত। চতুঃপার্শ্বস্থ ফৌজদারগণ, চাঁচড়ার রাজা মনোহর রায়, নলডাঙ্গার রাজা

রামদেব রায়, ভূষণায় অবস্থিত শত্রুজিতের বংশধরগণ, বিজিত ও বিদূরিত জমিদারবংশীয় জমিদারী আকাঙ্ক্ষীপ্রভৃতি ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেই সীতারামকে ভয় করিয়া চলিতেন। দেশীয় দস্যু, তস্কর, আরাকাণী, আসামী, পর্ত্তুগীজ প্রভৃতির অত্যাচার ও আক্রমণ সীতারামকে প্রতি-নিয়ত প্রতিরোধ করিতে হইত। প্রজার সুখ সমৃদ্ধি করিয়া শিক্ষার আলোকে তাহাদের মন বড় করিয়া তাহাদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে ও একাতাসূত্রে বন্ধন করিয়া ধীরে ধীরে সাবধানে ধর্ম্মরাজ্যসংস্থাপন ও অশেষ কল্যাণকর কার্য্যের চিন্তায় সীতরামকে অবিরত কালাতিপাত করিতে হইত। যাঁহার মনে উচ্চ আশা, যাঁহার হৃদয়ে ধর্ম্মরাজ্য-স্থাপনের লালসা, যাঁহার চিত্তে দেশ, সমাজ ও জাতীয় উন্নতির আকাঙ্ক্ষা, তাঁহার কি কখন বিলাসিতার স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া ইন্দ্রিয়সেবা করা সম্ভব? যিনি ১৪ বৎসরে ৪৪টী পরগণা জয় করিয়া শাসন ও পালনের সুব্যবস্থা করিয়াছেন; নূতন জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া দূরদেশ হইতে লোক আনাইয়া প্রজাপত্তন করিয়াছেন; দেশীয় কৃষি ও শিল্পের উন্নতি করিয়াছেন, তাঁহার বিলাসিতায় কালাতিপাত করার সময় কোথায়?

কোন কোন কিম্বদন্তী সীতারামের সদুদ্দেশ্য হইতেও প্রচারিত হইতে পারে। অনূঢ়া কুলীনকুমারীগণকে সীতারাম সযত্নে আপনগৃহে রাখিয়া লালনপালন করিতেন। তাঁহাদের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল। সীতা রামের গমনাগমন উপলক্ষে এই সকল কুলীনকুমারাগণ উলুধ্বনি করি তেন, শঙ্খ বাজাইতেন ও সীতারামের উপর লাজা ও সচন্দন শ্বেতপুষ্প বর্ষণ করিতেন। ইহা হইতেই সম্ভবতঃ কয়েকটী ঘৃণিত কিম্বদন্তী

প্রচারিত হইয়াছে। যাত্রাদি সঙ্গীত উপলক্ষে সীতারামের রাজভবনে গোলাপজলবৃষ্টি হইত এবং সুগন্ধি দ্রব্য বিতরিত হইত; এই হইতেই হয় ত গোলাপজলের চৌবাচ্চার গল্প উঠিয়াছে। জলমগ্ন বালকবালিকা ও নরনারীর উদ্ধারের জন্য সীতারাম যথেষ্ট পুরস্কার দিতেন। গবাদি পশুর বিপদুদ্ধারেও তাঁহার পুরস্কার ছিল। দয়াময়ীতলায় বারোয়ারী উপলক্ষে ভাল পশু দেখাইতে পারিলে সীতারাম উপহার দিতেন। সীতারামের এই যশঃ অপহরণের নিমিত্ত হয় ত তাঁহার বিপক্ষদল এই বালকবালিকাবধের কিম্বদন্তী রটনা করিয়াছে। মুসলমান নবাব ও ফৌজদারগণের কেহ কেহ জলে ফেলিয়া বালকবালিকা হত্যা ও গর্ভিণীর গর্ভবিদারণপূর্ব্বক গর্ভস্থ সন্তান দর্শন করিতেন। সীতারামকে তাহাদিগের সমকক্ষ ক্ষমতাশালী প্রচার করার জন্য কেহ হয় ত তাঁহার সম্বন্ধে মিথ্যা কিম্বদন্তী রটনা করিয়াছে।

সীতারামীসুখ ও রঘুনন্দনী বাড় বলিয়া এতদঞ্চলে দুইটি কথা প্রচলিত আছে। কেহ বাবুগিরি করিলে লোকে তাহাকে সীতারামী সুখভোগ করিতেছে বলে। সীতারামী সুখ অর্থে সীতারামের নিজের বিলাসিতা নহে। যে পুণ্যাত্মাকে মুসলমানাক্রান্ত দেশে সাবধান ও সতর্কতার সহিত হিন্দুর জাতিধর্ম্ম-রক্ষার নিমিত্ত পাঠান-বিদ্বেষ দূর করিয়া কঠোর চিন্তায় রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে হইত, যাঁহাকে চিন্তাবিঘূর্ণিত মস্তিষ্কের শান্তি দিবার জন্য প্রতিদিন অপরাহ্নে পল্লীবাস চিত্তবিশ্রামে ও মধ্যে মধ্যে বিনোদপুরের বিনোদন-গৃহের আশ্রয় লইতে হইত, তাঁহার পক্ষে বিলাসিতায় প্রমত্ত থাকা সম্ভবপর নহে। মুসলমান উৎপীড়নের পর, দ্বাদশ দস্যুর অত্যাচারনিবারণের পর, মগ, পর্ত্তুগীজ ও

আসামীআক্রমণ নিবারণের পর, মূর্খ অত্যাচারী জমিদার রাক্ষসগণের পৈশাচিকবৃত্তি নিবারণের পর, সীতারামের সময়ে প্রজাদিগের যে নিরাতঙ্ক অভাবরহিত ধর্ম্মভাব ও শান্তিসুখের অবস্থা হইয়াছিল, তাহারই নাম সীতারামী সুখ। প্রকৃতিপুঞ্জ সীতারামের সময়ে যে শান্তি ও সুখ স্বচ্ছন্দে বাস করিয়া সুপেয় পান, সুখাদ্য ভোজন, সুপথে গমন, সুন্দর বাস পরিধান, সৎশিক্ষালাভ, সদাচারের অনুষ্ঠান ও সুশীল প্রতিবেশিগণ মধ্যে বাস করিতে পারিত, তাহারই নাম সীতারামী সুখ ; বস্তুতঃ সীতারামের বিলাসিতা নহে।. ক্লেশের পর সুখ বড় প্রীতিপ্রদ, বহুদিন ক্লেশের পর সীতারামের সময়ে প্রজার সুখসূর্য্যের উদয় হইলে প্রজাগণ "ধন্য রাজা সীতারাম ! ধন্য রাণী কমলা ! ধন্য সেনাপতি মেনাহাতী ! ধন্য মন্ত্রী যদুনাথ !" বলিতে বলিতে তাঁহাদিগের সুখের উচ্ছ্বাস, উল্লাসের উচ্ছ্বাস, শান্তি-স্বাস্থ্যের উচ্ছ্বাস যে প্রকাশ করিতে লাগিল, তাহারই নাম সীতারামীসুখ। মুসলমান হিন্দুকে ও হিন্দু মুসলমানকে যে ভাই বলিতে লাগিল, নরনারীগণের যে তীর্থযাত্রায় দস্যুতস্করের ভয় দূর হইল, ক্রিয়াকর্ম্ম করিতে যে ভয়রহিত হইল, ধনসঞ্চয়ে যে আশঙ্কা তিরোহিত হইল, লোকে স্ত্রীপুত্র লইয়া যে সুখে বাস করিতে লাগিল, বাজার বন্দর বাণিজ্য-ব্যবসায়ের যে বিশেষ সুবিধা হইল, তাহারই নাম সীতারামী সুখ। দেশে যে ধর্ম্মভাব আসিল, শিক্ষার উপায় হইল, আদর্শ ভদ্রসন্তান প্রতিবেশী হইল, দেশে নূতন নূতন শস্য, ফল ও পুষ্প জন্মিতে লাগিল, নূতন নূতন কত উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রস্তুত হইতে লাগিল, কত সুগন্ধি দ্রব্য আসিতে লাগিল, কত যাত্রা, পাঁচালী, কবি, খেমটা, সঙ্গীত শুনিবার সুবিধা হইল, তাহারই নাম সীতারামীসুখ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

——— ০ ———

সীতারামের পতনের কারণ

বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ লেখকচূড়ামণি পরলোকগত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঝিনাইদহে ও মাগুরায় অবস্থিতিকালে কিম্বদন্তী শ্রবণে সীতারামের মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। বাবু মধুসূদন সরকারের ন্যায় গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় পরিদর্শন উপলক্ষে তাঁহার সীতারাম-জীবনী সংগ্রহ করিবার অবসর ছিল না। তিনি অসাধারণ প্রতিভা ও অত্যাশ্চর্য্য কল্পনাবলে সীতারামকে শুক্ল-কৃষ্ণমিশ্রিত বর্ণে রঞ্জিত করিলেও সীতারামের উদারতার পরিচয় দিয়াছেন। যে যত্নবান্ অধ্যয়নশীল অভিজ্ঞ পণ্ডিতপ্রবরের করে শ্রীকৃষ্ণের কলঙ্ক বিদূরিত হইয়াছে, যে কৃষ্ণ কল্পনার কৃষ্ণ হইতে ঐতিহাসিক কৃষ্ণে পরিণত হইয়াছেন ও সমাজসংস্কারক, দেশসংস্কারক ও উদার রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া যিনি প্রতিপন্ন হইয়াছেন, সেই বঙ্কিমের অনুসন্ধিৎসা, চেষ্টা, যত্ন ও পাণ্ডিত্য-পরিচয়ে তদীয় মধুর লেখনী হইতে সীতারামের ইতিহাস লিখিত হইলে বঙ্গের এক অভিনব আশ্চর্য্য বস্তু হইত। তাহাতে শিক্ষিত বাঙ্গালীর সবিস্ময়ে দেখিবার শিখিবার ও প্রশংসা করিবার অনেক বিষয় থাকিত। মাদৃশ জনের সীতারামের ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা একরূপ বামনের চন্দ্র ধরিবার চেষ্টা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মাতুল না থাকা অপেক্ষা অন্ধ মাতুলও ভাল, এই চলিত কথার উপকারিতার উপর নির্ভর করিয়া মাদৃশ জনের সীতারাম

লেখার যত্ন। বঙ্কিম বাবুর সীতারাম একেবারে কল্পনা নহে। ঐতিহাসিক সীতারামের যে সকল কিম্বদন্তী তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, অথবা যাহার ঐতিহাসিক মূল কিছু পান নাই, তাহা বঙ্কিমবাবু অলঙ্কার দ্বারা পূর্ণ করিয়াছেন। সীতারাম নিম্নবঙ্গের স্বাধীন রাজা। তিনি মুসলমানের সহিত বিবাদ করিতে করিতে হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার তিন মহিষী, শ্রী, রমা ও নন্দা। গঙ্গারাম শ্রীর ভ্রাতা। জ্যোতির্ব্বিদ্ গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন, শ্রী সীতারামের গৃহলক্ষ্মী হইলে তাঁহার অকল্যাণ হইবে। শ্রী রূপসী, সতী ও পতির চির সৌভাগ্যাকাঙ্ক্ষিণী। শ্রী এই গণনার কথা শুনিয়া এক ভৈরবীর সঙ্গে তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। সীতারাম শ্রীর উদ্দেশে দেশে দেশে সন্ন্যাসি-বেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। নির্দ্দোষ গঙ্গারামের প্রাণদণ্ড হইতেছিল, এই প্রাণদণ্ড হইতে গঙ্গারামকে উদ্ধার করা লইয়াই সীতারামের সহিত ফৌজদারের বিবাদ। সীতারামের গুরু ও প্রধান উপদেষ্টা চন্দ্রচূড়, মেনাহাতী তাঁহার প্রধান সেনাপতি, লক্ষ্মীনারায়ণ তাঁহার গৃহদেবতা। শ্রী ও ভৈরবীর একযোগে সীতারাম সমীপে আগমন, ভৈরবী হইতে শ্রীর অদৃশ্যভাবে অবস্থান, শ্রীকে স্থানান্তরিত করিবার পরামর্শদায়িনীবোধে সীতারাম কর্ত্তৃক উলঙ্গাবস্থায় ভৈরবীকে বেত্রাঘাত ও পরে মুসলমান করে সীতারামের পতন।

বঙ্কিমবাবুর সীতারাম উপন্যাসের সহিত ঐতিহাসিক সীতারামের ভাবগত পার্থক্য নাই। রমা ও নন্দা দুইটা বাঙ্গালী স্ত্রীর সাধারণ চরিত্র। একটীর স্বামীর মতেই মত, স্বামীর কার্য্যই কার্য্য। দ্বিতীয়টা যবনভয়ে ভীতা, পেন্‌পেনে, ভেন্‌ভেনে, বুদ্ধিহীনা, অথচ স্বামিপুত্রের

পরম শুভাকাঙ্ক্ষিণী। শ্রী সীতারামের রাজশ্রী, মহাপুরুষগণ জড়ময়ী স্ত্রী অপেক্ষা রাজশ্রীর জন্যই অধিকতর লালায়িত। সীতারাম সন্ন্যাসীর ন্যায় পবিত্রমনে পবিত্রভাবে স্বাধীন রাজশ্রীর জন্য ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। শ্রীর ভ্রাতা সুখ ও সম্পদ্। গঙ্গারামরূপ রাজ্যের সুখ-সম্পদ ফৌজদার অকারণে ভূগর্ভে জীবন্ত অবস্থায় প্রোথিত করিতেছিলেন। নিম্ন বঙ্গের সুখসম্পদের জন্যই সীতারামের ফৌজদারের সহিত বিবাদ। চন্দ্রচুড় গুরুপরিচালিত অর্থে সীতারাম গুরুস্থানীয় ব্রাহ্মণ কর্তৃক পরিচালিত হইতেন। ভৈরবী শ্রীর সহচরী অর্থাৎ রাজশ্রী ও শান্তি এক সঙ্গে থাকেন। রাজশ্রী সীতারামের সম্মুখে আসিয়াই অন্তরালে থাকিলেন। সীতারাম মনের শান্তিরূপ ভৈরবীকে উলঙ্গভাবে বেত্রাঘাত করিয়াছিলেন অর্থাৎ সীতারামের রাজ্য যায় যায় হইলে তাঁহার চিত্তে শান্তির লেশমাত্রও ছিল না। লক্ষ্মীনারায়ণ সীতারামের গৃহদেবতা ও মেনাহাতা সীতারামের সেনাপতি ছিলেন, ইহা প্রকৃত ঘটনা। সীতারামের পতন—বঙ্গের দুরদৃষ্ট, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বঙ্কিমবাবু সীতারামের কীর্ত্তি দেখিয়া ও কিম্বদন্তী শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে সীতারাম একজন অসাধারণ লোক ছিলেন, কিন্তু তিনি ইতিহাস লিখিবার উপকরণ না পাওয়ায় ও তাঁহার উপকরণসংগ্রহের সময় না থাকায় কল্পনা ও ঘটনা মিশ্রিত করিয়া উপন্যাস প্রণয়ন করিয়াছেন। সীতারাম, যশোহর চাঁচড়ার রাজা মনোহর রায়ের ও নলডাঙ্গার রাজা রামদেবের সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সহিত সীতারামের সন্ধি হইলে কি হইবে। তাঁহারা সীতারামকে হিংসা করিতেন এবং সীতারামের পতনের জন্য আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করিতেছিলেন।

সীতারাম মনোহরের রাজ্য-বিস্তারের কণ্টক ছিলেন। নলডাঙ্গার রাজা সীতারামকে নান্দইলের শচীপতির স্বাধীনতা অবলম্বনের পরামর্শ-দাতা মনে করিতেন। মুকুন্দ রায়ের বংশধরের জমিদারীর মধ্যে সীতারাম গৃহবিবাদ ও প্রজাপীড়নদোষের অবসর পাইয়া প্রবেশ করেন। উক্ত বংশধরগণ কেহ স্থানান্তরে চলিয়া যান। কেহ ভূষণার ফৌজদারের অধীনে ঢালি-সৈন্য অর্থাৎ পদাতিক সৈন্যের নায়ক হইয়া থাকেন। রাজ্যভ্রষ্ট হৃতসর্ব্বস্ব এই ঢালি অধ্যক্ষগণ সর্ব্বদাই সীতারামের সর্ব্বনাশে যত্নবান্ ছিলেন। অন্যান্য জমিদারগণের অধিকাংশ জমিদারীতে সীতারাম গৃহবিবাদ বা প্রজাপীড়ন দোষে প্রবেশ করেন। এ জগতে সকল লোকের মনস্তুষ্টি করেন এরূপ সাধ্য কাহারও নাই; ভাল মন্দ লোক সকল সময়ই অল্প বা অধিক পরিমাণে আছে। সীতারাম যাহাদের রাজ্য লইয়াছিলেন, সেই বিপক্ষদলেও তাঁহার অনেক সুহৃদ্ ছিল। এই বিপক্ষ দলও সুসময়ের অপেক্ষা করিতেছিল। অল্প দিনের মধ্যে সীতারামের সর্ব্বোপরি উন্নতিতে ও তাঁহার রাজ্যের শান্তি-সুখ-সম্পদ্ বৃদ্ধিতে অনেকের হিংসাপ্রবৃত্তি বলবতী হইয়াছিল। ভূষণার ফৌজদার সীতারামকে ভয় করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রের নিকটে এরূপ একটা প্রবল শক্তি থাকা তিনি পছন্দ করিতেন না। মুজানগরের ফৌজদারও সীতারামকে ভাল দেখিতেন না। বৃটিশ সাম্রাজ্য-সংস্থাপনের প্রারম্ভে গভর্ণর ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে যেরূপ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরগণের অর্থলালসা পরিতৃপ্ত করিতে হইত, মুর্শিদ কুলী খাঁকেও সেইরূপ দক্ষিণাপথে যুদ্ধের জন্য সম্রাট্ অরঙ্গজেবকে অজস্র অর্থদান করিতে হইত। কুলী খাঁ অনেক সময় কথায় কাজে ঠিক থাকিতে

পারিতেন না। সীতারাম অনেক সময় নাবালক ও বিধবার জমিদারীর সুবন্দোবস্তের জন্য কর্ত্তৃত্বভার লইয়াছিলেন। অনেক স্থানে তিনি নূতন গ্রাম ও নগর বসাইয়া ছিলেন। তাঁহার শাসন ও পালনগুণে তাঁহার রাজ্যের সর্ব্বত্র শ্রী ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছিল। সীতারামের বিরুদ্ধে শত কথা প্রতিদিন সীতারামের বিপক্ষ দল ভূষণার ফৌজদার আবু তরাপের নিকট বলিতে লাগিল। আবু তরাপ সীতারামের সুখসমৃদ্ধি দেখিয়া সীতারামের নিকট হইতে কর আদায়ের জন্য দেওয়ান কুলি-খাঁর নিকট পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিতে লাগিলেন। প্রকৃতপক্ষে সীতারামকে কয়েক বৎসরের জন্য কর দিবার কথা ছিল না। আবু তরাপের পত্রের উপর পত্রে মুর্শিদ কুলী খাঁ কিছুদিন বিচলিত হন নাই। যখন বিশ্বাস-ঘাতক মুনিরাম আবু তরাপের পত্রের সঙ্গে সঙ্গে কুলী খাঁর নিকট সীতা-রামের রাজ্যের সুখসমৃদ্ধির ও সীতারামের স্বাধীন হইবার বাসনা ও কৌশল জানাইলেন, তখন কুলী খাঁ পূর্ব্বকথা সকল ভুলিয়া গিয়া সীতা-রামের নিকট সকল পরগণার রীতিমত কর চাহিয়া পাঠাইলেন। মুর্শিদ কুলী খাঁ আবু তরাপকে সীতারামের নিকট হইতে কর আদায়ের অনুজ্ঞা পত্র পাঠাইলেন। আবু তরাপ সীতারামের নিকট কর চাহিয়া পাঠাইলেন। আবু তরাপের অভিসন্ধি সীতারাম পূর্ব্ব হইতে বুঝিতে পারিয়া মুনিরামকে নবাবের নিকট তাঁহার জমিদারীর অবস্থা, আবাদী সনন্দের কথা, কয়েক বৎসর কর রেয়াত দেওয়ার কথা প্রভৃতি উত্থাপন করিবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলেন। মুনিরাম সীতারামকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিতেন যে, তাঁহার প্রস্তাবিত কার্য্য করিবার জন্য তিনি প্রাণপণ যত্ন করিতেছেন। কিন্তু তলে তলে সীতরামের সর্ব্বনাশ করিতে ছিলেন,

মুনিরামের কন্যার সহিত সীতারামের বিবাহ প্রস্তাবে, মুনিরাম-তনয়ার বিষপ্রয়োগে অকালমৃত্যু ইত্যাদিতে, সীতারামের প্রতি মুনিরামের কোপের বিষয় সীতারাম জানিতেন না। সীতারাম জানিতেন, তাঁহার বিবাহের প্রস্তাবে মুনিরাম অসন্তুষ্ট নহেন। সীতারাম জানিতেন, মুনিরামের কন্যার পীড়ায় স্বাভাবিক মৃত্যু হইয়াছে। সীতারাম জানিতেন, মুনিরামের পুত্র কার্য্যের ওমেদারীতে অগ্রে ঢাকায় ও পরে মুর্শিদাবাদ গমন করিয়াছেন। সীতারামের বিশ্বাস ছিল, জাহাঙ্গীরাবাদ নগরের পথে কুড়াইয়া পাওয়া মুনিরাম, রামরূপের বন্ধু মুনিরাম, নলদীর স্রমার-নবিস সীতারামের পালিত ও আশ্রিত মুনিরাম, ধর্ম্মভীরু কর্ম্মনিষ্ঠ মুনিরাম কখনও সীতারামের সর্ব্বনাশ করিবেন না। দেওয়ান মুর্শিদ কুলি খাঁর পত্র পাইয়া আবু তরাপ কড়াভাবে সীতারামের নিকট কর তলব করিলেন। সীতারাম ধীর ও স্থিরভাবে উত্তর করিলেন, নলদী পরগণা তাঁহার জায়গীর, তাঁহাকে কর দিতে হইবে না। খড়েরা প্রভৃতি পরগণার আবাদী সনন্দবলে ছয়বৎসর কর দিতে হইবে না। কতকগুলি পরগণা নাবালক ও বিধবাগণের পক্ষ হইতে তিনি কর্তৃত্বভার পাইয়াছেন। সেই সকল পরগণা সুশাসন করিতে তাঁহার অনেক ব্যয় পড়িয়াছে। এই জমিদারীগুলির কল্যাণকামনায় কর্তৃত্বভার তিনি স্বহস্তে লইয়াছেন। ইহাতে নবাবেরও মঙ্গল সাধিত হইতেছে। রামপাল প্রভৃতি স্থান তিনি নিজে যুদ্ধে জয় করিয়া লইয়াছেন। পার্শ্বচরগণের প্রবর্ত্তনায় ও পরামর্শে ইতরসংসর্গী হিতাহিতজ্ঞানশূন্য, নবাবের আত্মীয়জ্ঞানে মহা অভিমানী আবু তরাপ কোন কথায় কর্ণপাত করিলেন না। সীতারাম সভাসদ্‌গণে পরিবেষ্টিত হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছেন। দূরদেশীয়

পণ্ডিত ও বণিক্ অনেকে তাঁহার সভায় উপস্থিত আছেন। এমন সময় আবু তরাপের লোক আসিয়া বলিল, ৭ দিনের মধ্যে রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় না বুঝাইয়া দিলে তাঁহাকে (সীতারামকে) মেয়েপুরুষে হাবুজ-খানায় পূরিয়া ধানে চা'লে মিশাইয়া খাওয়ান হইবে এবং তাহার জমি-দারী খাস করা যাইবে। সীতারাম আবু তরাপের লোককে ধীর ও স্থিরভাবে বিদায় করিলেন, কিন্তু তাঁহার ক্রোধের পরিসীমা রহিল না। আবু তরাপের লোক স্থানান্তরিত হইবার পর সীতারাম সক্রোধে উচ্চ-রবে সভামণ্ডল কম্পিত করিয়া বলিলেন. "আবু তরাপের কাটা মাথার দাম দশ হাজার টাকা : যে আমাকে তিন দিনের মধ্যে আবু তরাপের মাথা কাটিয়া আনিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে আমি দশ হাজার টাকা পুরস্কার দিব।" বিশ্বস্ত, অনুগত অতুলনীয় ভুজবল সম্পন্ন মেনাহাতী জানিতেন, "দাদা আর গদা"। তিনি জানিতেন, সীতারাম আর সীতারামের অনুজ্ঞা। তিনি কার্য্যের ফলাফলবিষয়ক হিতাহিত চিন্তা করিতে পারিতেন না। বক্তার প্রভৃতি সৈন্যাধ্যক্ষগণ যে কার্য্যে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, মেনাহাতী দ্বিতীয় রাজাজ্ঞা অপেক্ষা না করিয়া চারি সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য ও ছয় সহস্র পদাতিক সৈন্যসহ আবু তরাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। রূপচাঁদ ঢালি পদাতিক সৈন্যের নায়ক ছিলেন। মেনাহাতী দশসহস্র সৈন্য লইয়া ভূষণার কেল্লা অবরোধ করিলেন। সূর্য্য উদয় হইতে সূর্য্য অস্ত পর্য্যন্ত তুমুল সংগ্রাম চলিল। প্রথমে উভয় পক্ষের পদাতিক অর্থাৎ ঢালি সৈন্যে সৈন্যে সংগ্রাম হইল। একদিকে দশভুজা-অঙ্কিত হিন্দুপতাকা, অন্য দিগে অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিত মোগলপতাকা পৎ পৎ শব্দে উড়িতে লাগিল।

হিন্দুপক্ষে উৎসাহে "কালীমাইকী জয়, লক্ষ্মীনারায়ণকী জয়" উচ্চারিত হইতেছিল। অন্যদিকে মুসলমানগণ "আল্লা হো আকবর" রবে আকাশ কম্পিত করিয়া তুলিল।

যুদ্ধে বহুলোক ক্ষয় হইতে লাগিল। যখন বেলা প্রায় অবসান হইয়া আইসে,ভগবান্ মরীচিমালী লোহিতরাগে দেহরঞ্জনপূর্ব্বক পশ্চিম সমুদ্র অবগাহনের উদ্যোগ করিতেছেন, তখন অমিততেজা বিরাটমূর্ত্তি মেনাহাতী সবেগে যবনসৈন্যের মধ্যে পড়িয়া সিংহনাদে "দশভুজা মাইকী জয়" বলিতে বলিতে আবু তরাপের শিরশ্ছেদন করিলেন। কোন গ্রাম্য কবি এই যুদ্ধ এইরূপে নিম্নলিখিত কবিতায় বর্ণন করিয়াছেন—

"বাজে ডঙ্কা নেড়ের শঙ্কা হয়ে গেল দূর।
ধন্য রাজা সীতারাম বাঙ্গালা বাহাদুর॥
রূপে ঢালি শড়কি তুলি কেল্লার মাঠে যায়।
যত নেড়ে দাড়ি নেড়ে গড়াগড়ি খায়॥
রূপে ঢালি বলে কালী নেড়ে'র আল্লা বোল।
সহর শুদ্ধ উঠলো খালি কান্নাকাটির রোল॥
তখন ঘোল ঢালিল দাড়ি মুড়িল ফৌজদার লস্কর।
মুই হেঁন্দু মুই হেঁন্দু বলি গেল পদ্মার পার॥"

এই যুদ্ধে ৬০০ শত মুসলমানসৈন্য নিহত হইয়াছিল, তাহাদিগকে এক সমাধিতে সমাধিস্থ করা হয়। তাহাদের সমাধিস্তম্ভের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বারাসিয়া-নদীতীরে বিদ্যমান আছে।

মেনাহাতী যুদ্ধাবসানে আবু তরাপের কাটামুণ্ড আনিয়া রাজপদে অর্পণ করিলেন। সেনাপতি কেবল ১০০০০৲ টাকার লোভে যুদ্ধে প্রবৃত্ত

হন নাই। তিনি রাজাজ্ঞাপালনের জন্য রাজ-অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, অর্থে মেনাহাতীর আসক্তি ছিল না।

সীতারাম মৃত ফৌজদারকে বীরোচিতভাবে সমাধিস্থ করিয়াছিলেন। তিনি বীরের প্রতি কোন অসম্মান প্রদর্শন করেন নাই। আবু তরাপের নিধনসংবাদ মুর্শিদাবাদে পৌঁছিল। আবু তরাপ নবাবের স্বসম্পর্কীয় লোক—জামাতা। মুর্শিদ কুলি খাঁর ক্রোধানলে মুনিরাম আরও কৌশলে ঘৃতাহুতি দিতে লাগিলেন। যুদ্ধ অনিবার্য্য বুঝিয়া সীতারামও উদ্যোগ আয়োজন করিতে লাগিলেন। এই ভূষণার যুদ্ধ হইতেই সীতারামের পতনের পথ সুপরিষ্কৃত হইতে লাগিল। আমরা দেখিতেছি, ক্রোধই সীতারামের পতনের মূল। সীতারাম যেরূপ ভাবে রাজ্য করিতে-ছিলেন, যেরূপ ভাবে তাঁহার বিপক্ষদল তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইতেছিল, যেরূপ ভাবে পার্শ্ববর্ত্তী নৃপতিবর্গ তাঁহার শৌর্য্যবীর্য্যে আকৃষ্ট হইতে-ছিলেন, যেরূপ দক্ষতার সহিত তাঁহার যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত ও সেনাদল শিক্ষিত হইতেছিল, তাহাতে সীতারাম আর পাঁচ বৎসর অপেক্ষা করিলে, নবাবসৈন্য কেন, সম্রাট্‌সৈন্যও তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারিত না।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

সীতারামের পতন।

সীতারাম যেরূপ বীর, যেরূপ সদাশয় ও উদার চরিত, সেইরূপ উৎসবের সহিত যথানিয়মে ভূষণার যুদ্ধে নিহত ফৌজদার আবু তরাপ ও অন্যান্য যোদ্ধৃগণকে সমাধিস্থ করিয়াছিলেন। তিনি যুদ্ধে নিহত বীরগণের মৃতদেহের প্রতি কোন অসম্মান প্রদর্শন করেন নাই। কেবল তাঁহার প্রতি অপমানসূচক বাক্যেই যে সীতারাম আবু তরাপকে যুদ্ধে নিহত করিবার আদেশ দেন, এরূপ নহে। আবু তরাপ মূর্ত্তিমান্ পিশাচ ছিল। তাহার অত্যাচারের পরিসীমা ছিল না। সে ইতর সম্প্রদায়ের লোকের সহিত মিশিয়া সর্ব্বদাই ঘোর অত্যাচার করিত। সে একে ফৌজদার, তাহাতে নবাবের জামাতা বলিয়া কোন অত্যাচার উৎপীড়নে পরাঙ্মুখ হইত না। সে অবিচারে নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে কারারুদ্ধ করিত। সতী রমণীর ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিত। হিন্দুর ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়াস পাইত, সুবিধা পাইলে বলপূর্ব্বক হিন্দু ধরিয়া মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিত এবং বালক-বালিকা ধরিয়া জলে ফেলিয়া দিয়া সকৌতুকে পারিষদগণসহ তাহাদিগের ভয়াবহ মৃত্যু দর্শন করিত। আবু তরাপের কথায় কাজে ঠিক ছিল না। দুর্ব্বল জমিদারের কর বৎসরে একবারের স্থলে দুইবার লইত এবং ধনী প্রজাদিগের সম্পত্তি লুণ্ঠন করিত। দস্যুদিগের সহিত যোগ করিয়া

তাহাদিগের দস্যুতালব্ধ অর্থের ভাগ লইত। মেনাহাতীও এই সকল কারণে আবু তরাপের উপর যার পর নাই রুষ্ট ছিলেন। তাঁহারও ইচ্ছা ছিল, এই আপদ্ দূর হইলেই রক্ষা পান। ভূষণার যুদ্ধে আবু তরাপের মৃত্যুর পর, সীতারাম তাঁহার পাঠান, ভোজপুরী ও হিন্দুসৈন্য বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করিলেন। তাহাদিগকে দিবারাত্র ভালরূপ অস্ত্রশিক্ষা দিতে লাগিলেন। বেলদার সৈন্যগণকে তীরন্দাজী ও গুলাল ছোড়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাঁহার কর্ম্মকারগণ দিবারাত্র লাগিয়া অস্ত্র শস্ত্র গঠন করিতে লাগিল। সীতারাম দূর দেশ হইতে বহুসংখ্যক কর্ম্মকার আনিতে লাগিলেন। মালাকারগণ কঠোর পরিশ্রম করিয়া বারুদ প্রস্তুত করিতে লাগিল।

কথিত আছে—সাধন মালাকরের মাতা বারুদ্‌গৃহে কাজ করিতে ছিল, হঠাৎ প্রদীপের আগুন বারুদে লাগিয়া ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড ঘটে, তাহাতে সাধনের মাতার নাসিকা, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি বারুদের অগ্নিতে নষ্ট হইয়া যায়। এ অঞ্চলে কাহার নাসিকা, চক্ষু, কর্ণ নষ্ট হইলে তাহাকে উপহাস করিয়া সাধন-কর্ম্মকারের মার সহিত তুলনা করিত। বালক-বালিকারা চক্ষু বান্ধাবান্ধি খেলা করিবার সময় যাহার চক্ষু বান্ধা পড়ে, তাহার চতুর্দ্দিকে করতালি দিয়া বলিতে থাকে,—

"সেধোর মা কাণাবুড়ি যান গুড়ি গুড়ি।"

সীতারাম কেবল সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি এবং যুদ্ধোপকরণ ও খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করিয়া নিরস্ত হন নাই। তিনি নড়াইল মহকুমার অন্তর্গত লক্ষ্মীপাশা গ্রাম হইতে চারি মাইল দূরে দিঘলিয়া গ্রামে আর একটী বাটী নির্ম্মাণ করেন। নবাবকরে পরাস্ত হইলে পুরস্ত্রী ও বালক-

বালিকাগণকে এই নূতন ভবনে রক্ষা করিবেন, এই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। এই দিঘলিয়ার উত্তরে ও পূর্ব্বে নবগঙ্গা নদী এবং দক্ষিণে শারোল গ্রামের নিকট দিয়া বৃহৎ বিল ছিল। এই স্থানে অল্পসংখ্যক সৈন্যেই শত্রুর আক্রমণ নিবারণ করিতে পারিত। কালের কুটিল গতিতে এক্ষণে দিঘলিয়ার দক্ষিণদিকের বিলসমূহ শুষ্ক হইয়াছে ও নদীর গতি কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। অন্যদিকে যখন মুর্শিদ কুলী খাঁ তোরাপ আলির নিধনবার্ত্তা শুনিলেন, তখন তিনি যত দূর দুঃখিত হউন বা না হউন, তোরাপ নবাবের জামাতা বলিয়া দুঃখের বিলক্ষণ ভাণই করিলেন। দিল্লীতে বাদশাহের ও ঢাকার নবাবের নিকট এই দুঃসংবাদ লিখিয়া পাঠাইলেন। অবিলম্বে বক্স আলি খাঁ নামক একজন সেনাপতিকে ভূষণার ফৌজদার নিযুক্ত করিয়া সীতারামের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। ভূষণার যুদ্ধের পর তথাকার ফৌজদারের কেল্লা সীতারামের হস্তগত হইয়াছিল। সীতারাম সসৈন্যে ভূষণায় অবস্থিতি করেন। মেনাহাতী মহম্মদপুরের নগর রক্ষা করিতেছিলেন।

বক্স আলি খাঁ সসৈন্যে পদ্মা বাহিয়া মহম্মদপুরে আসিতেছেন শুনিয়া কেবল নগর-কোতোয়াল আমোলবেগকে (আমিনবেগ) মহম্মদপুর ও রূপচাঁদ ঢালিকে ভূষণার কেল্লা-রক্ষার ভার দিয়া সীতারাম, মেনা-হাতী, বক্তার প্রভৃতি পদ্মাতীরে বক্স আলীর গতি রোধ করিতে গমন করিলেন। বহুসংখ্যক সৈন্য জলমগ্ন হইয়া পদ্মা নদীতে প্রাণত্যাগ করিল। এই সময় সীতারাম দুই হাতে কালে খাঁ ও ঝুম্‌ঝুম্ খাঁ নামক দুইটী বড় কামান দাগিয়াছিলেন। তাঁহার কামানের অগ্নির সম্মুখে সকল যবনতরী চূর্ণ বিচূর্ণ হইতেছিল। বঙ্কিম বাবুর সীতারামে মধুমতীতীরে

সীতারামের কামান দাগার কথা এই হইতেই লিখিত হইয়াছে। অল্পসংখ্যক সৈন্য লুক্কায়িত ভাবে স্থল ও জলপথে ভূষণার উত্তরে আসিয়া উপনীত হইল। দ্বিতীয়বার ভূষণার উত্তরে মুসলমান-হিন্দুতে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। আবার কালী মাইকী জয়, আল্লা হো অকবর রবে আকাশ কম্পিত হইল। এ যুদ্ধেও মুসলমানগণের পরাজয় ও রাজা সীতারামের জয় হইল।

যুদ্ধে পরাভূত হইয়া বক্স আলি ম্লানমুখে অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া মুর্শিদাবাদে উপনীত হইলেন। সীতারামের বীরত্ব-কাহিনীতে মুর্শিদাবাদ সহর কম্পিত হইল। এই সময় দেওয়ান রঘুনন্দন পীড়িত অবস্থায় বাসায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি প্রতিদিন নবাব-দরবারে উপস্থিত হইতে পারিতেন না। তাঁহার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী বিচক্ষণ বুদ্ধিমান্ দয়ারাম প্রভুর পীড়া উপলক্ষে মুর্শিদাবাদে প্রভুকে দেখিতে গিয়াছিলেন। সীতারামের উকিল মুনিরামও রঘুনন্দনকে দেখিতে যান।

কথাপ্রসঙ্গে সীতারামের বীরত্ব-কাহিনী উঠিয়া পড়িল। হিন্দু রাজা সীতারামের বীরত্বকথা শুনিয়া, রুগ্ন রঘুনন্দন উৎসাহে শয্যার উপর বসিয়া বলিলেন, “ধন্য সীতারাম রাজা। ধন্য মেনাহাতী! ধন্য ঢালি রূপচাঁদ! ইহারাই বঙ্গমাতার সুসন্তান। সীতারামই রাজা নামের যোগ্য পাত্র। সীতারামই প্রকৃত হৃদয়বান্ ও পরদুঃখে কাতর। মহাত্মা সীতারামই দেশের প্রকৃত কার্য্য করিতেছেন, আর আমরা কুবৃত্তি অবলম্বনে জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছি। ইচ্ছা হয়, সীতারামের সহিত যোগ দিয়া অশেষ ক্লেশক্লিষ্ট বঙ্গমাতার ক্লেশভার কিছু লাঘব করি। যদি

নবাবের ভয় না থাকিত, যদি বিশ্বাসঘাতকতাদোষে দোষী না হইতাম, তবে আমি আজীবন পরিশ্রম করিয়া যাহা করিয়াছিলাম, সকলই বঙ্গমাতার দুঃখভার লাঘবের জন্য দান করিতাম। সীতারাম বঙ্গের শিবাজী বা প্রতাপসিংহ। ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, এই বিশ্বাসঘাতকতার রঙ্গভূমি, এই স্বার্থপরতার ক্রীড়ার স্থান, এই ক্ষুদ্রাশয়তার আদর্শক্ষেত্রে সীতারামের বিপক্ষে যেন স্বার্থপরতা ও ক্ষুদ্রাশয়তাজড়িত বিশ্বাসঘাতকতার কুটিল জাল বিস্তার না করে। হে লক্ষ্মীনারায়ণজী! হে আদ্যাশক্তি দশভুজে! তোমরা সীতারামের রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত আছ, সীতারামের রাজশ্রী ও রাজগৌরব রক্ষা কর। মহম্মদপুরের স্বাধীনতার যে ক্ষুদ্র প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, তাহা অল্পদিনের মধ্যে দাবানলে পরিণত হইয়া সমগ্র মুসলমান-সাম্রাজ্য দগ্ধ করুক। মা রণরঙ্গিণি সিংহবাহিনি দুর্গে! হিন্দুর বাহুতে বল দাও, হিন্দুর হৃদয়ে সাহস দাও, হিন্দুর মস্তিষ্কে বুদ্ধি দাও, হিন্দুর গৃহে একতা দাও, হিন্দুর আয়ুধ তীক্ষ্ণ কর, আবার তোমার ভক্তবৃন্দ মুসলমান অসুর বিনাশ করিয়া দুর্গামাইকী জয়, কালীমাইকী জয় নিনাদে আসমুদ্র-হিমাচল ভারতবর্ষকে কম্পিত করুক।" মুনিরাম রঘুনন্দনের বাক্যে হাঁ হু করিয়া উঠিয়া গেলেন। দয়ারাম বিচক্ষণ লোক ছিলেন। তিনি মুনিরামের মুখাকৃতিতেই বুঝিয়াছিলেন, রঘুনন্দন কর্তৃক সীতারামের প্রশংসা-কীর্ত্তন মুনিরামের কর্ণে বিষবর্ষণ করিতেছিল। মুনিরাম গমন করিলে পর, দয়ারাম বলিলেন, "প্রভো! কি করিলেন? মুনিরাম আর এখন সীতারামের উকীল নাই, সে তাঁহার পরম বৈরী। মুনিরাম সীতারামের প্রশংসায় রুষ্ট হইয়াছেন। মুনিরাম যেরূপ শঠ, ধূর্ত্ত,

ও কৌশলী কল্য প্রত্যূষেই এই কথা মুর্শিদ কুলী খাঁর কর্ণে উঠাইয়া আপনার সর্ব্বনাশ করিবে।”

রঘুনন্দন দয়ারামের বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা জানিতেন। রঘুনন্দন তখন এরূপ কাতর ছিলেন যে, তাঁহার দরবারে যাইবার সামর্থ্য ছিল না। তিনি দয়ারামের কথায় ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—মুনিরাম কি এত বড় বিশ্বাসঘাতক? দয়ারাম বলিলেন, “মুনিরাম বিশ্বাসঘাতক না হইলে সীতারামের প্রতি করের তলপ হইত না। সীতারাম বল-সঞ্চয়ের ও একতায় হিন্দুরাজগণকে আবদ্ধ করিতে যথেষ্ট সময় পাইতেন” এই কথায় রঘুনন্দন নিতান্ত দুঃখিত হইয়া কহিলেন,“যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। দয়ারাম দাদা, কল্য তুমি দরবারে যাইবে। এ বিপদে তুমি রক্ষা না করিলে আর উপায় নাই।” রঘুনন্দন দয়ারামের প্রমুখাৎ আরও জানিলেন যে, রাজা মনোহর প্রভৃতির চর সীতারামের সর্ব্বনাশের জন্য মুর্শিদাবাদে উপস্থিত আছে। পরদিন প্রাতঃকালে মুর্শিদ কুলী খাঁর দরবারে রঘুনন্দনসম্বন্ধে সীতারামের পক্ষাবলম্বনের কথা উঠিল। বুদ্ধিমান্ দয়ারাম জানু পাতিয়া বলিতে লাগিলেন, “জাহাপনা! আমার প্রভু বিশ্বাসঘাতক নহেন। তিনি সর্ব্বদা জাহাপনার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করেন। যাহা বলিয়াছেন, সে কেবল সীতারামের উকীল মুনিরাম রায় মহাশয়ের মন পরীক্ষার জন্য। সীতারাম বিদ্রোহী হইয়াছেন এবং তাঁহার উকীল এখানে থাকিয়া সেনাপতি ও সৈনিকদিগকে উৎকোচে বাধ্য করিয়াছেন কি না, ইহাই জানা আমার প্রভুর ইচ্ছা। মুনিরাম অতি চতুর লোক। প্রভু তাঁহার নিকট হইতে কোন কথা আদায় করিতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে মুনিরাম সত্যমিথ্যা কথায় আমার বিশ্বস্ত

প্রভুকে কলঙ্কিত করিবার চেষ্টা পাইতেছে। জাহাপনার হুকুম হইলে এবং কিছু সুবাদারী সৈন্য আমার সঙ্গে থাকিলে আমি সীতারামকে লোহার খাঁচায় পূরিয়া জাহাপনার নিকট ধৃত করিয়া পাঠাইতে পারি।"

মুর্শিদ কুলী খাঁ দয়ারামের কৌশলময় বাক্যজালে আবদ্ধ হইয়া বহু-সংখ্যক সুবাদারী সৈন্যসহ সিংহরামকে ও দয়ারামকে জমিদারী সৈন্যসহ সীতারামের প্রতিকূলে প্রেরণ করিলেন। সীতারামের ইতিহাসলেখকগণ রঘুনন্দন ও দয়ারামকে স্বার্থপর ও বিশ্বাসঘাতক, লোভী প্রভৃতি তিরস্কারে তিরস্কৃত করিতে ত্রুটি করেন নাই। যে অসাধারণ সুবুদ্ধিসম্পন্ন রঘুনন্দন বিশ্বস্ততা ও কর্ম্মকুশলতাগুণে সামান্য পদ হইতে ধীরে ধীরে সুযশের সহিত বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার মুসলমান সুবাদারের দেওয়ানী পদ পাইয়াছিলেন, যাঁহার অসাধারণ উন্নতি আদর্শ উন্নতির মধ্যে গণ্য হইয়াছে,যাঁহার বংশে রাণী ভবানীর ন্যায় রাণীর কীর্ত্তিগৌরবে বঙ্গদেশ গৌরবান্বিত হইয়াছে, যাঁহার বংশে রাজা রামকৃষ্ণের ধর্ম্মনিষ্ঠার অলৌকিক কীর্ত্তি রহিয়াছে, যাঁহারা বঙ্গের বহুস্থানে দেবকীর্ত্তি ও অতিথি সেবার সুবন্দোবস্ত করিয়া অন্নক্লিষ্ট বঙ্গের অশেষ উপকার করিতেছেন, তাঁহার ও তাঁহার কর্ম্মচারী বুদ্ধিমান্ দয়ারামের চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শ করিতে পারে না। সীতারামের পতন-বিষয়ে রঘুনন্দন ও দয়ারামের সম্বন্ধে অনেকগুলি অপবাদ বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে। দুই পবিত্র রাজকুলের অপবাদগুলি দূর করাও প্রকৃত ইতিহাসলেখকের কর্ত্তব্য। অপবাদগুলি এই ঃ—

১। রঘুনন্দন সীতারামের রাজ্য পাইবার লোভে সর্ব্বদা দেওয়ানের দরবারে সীতারামের নিন্দা করিতেন। তিনি তাঁহার কর্ম্মচারী দয়ারাম

ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামজীবনকে জমিদারীর সৈন্যাধ্যক্ষ করাইয়া সুবেদারী সৈন্যের সেনাপতি সিংহরাম সাহকে সীতারামের নিধনার্থ মহম্মদপুরে প্রেরণ করেন।

২। রাজা রামজীবন ও দয়ারামের কুটিল চক্রান্তে বীরচূড়ামণি ভীষ্মতুল্য মেনাহাতীকে মহম্মদপুরের দোলমঞ্চের নিকটে চন্দ্রাতপ কাটিয়া দিয়া চন্দ্রাতপের নিম্নে ফেলিয়া অন্যায়রূপে নিহত করা হয়।

৩। রায় রঘুনন্দন সীতারামের নিকট হইতে দুইলক্ষ টাকা উৎকোচ লইয়া তাঁহার রাজ্য তাঁহাকে পুনরায় দিবেন, এইরূপ বন্দোবস্ত করেন। লক্ষ্মীনারায়ণ দুইলক্ষ টাকা লইয়া মুর্শিদাবাদের নিকটবর্ত্তী হইলে রঘুনন্দন দস্যুদল প্রেরণ করিয়া তাহা লুণ্ঠন করিয়া লয়েন। রঘুনন্দন সীতারামকে বলেন, তাঁহার নিষ্ঠুর প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। সীতারাম এই কথা শুনিয়া ভয়ে স্বীয় অঙ্গুরিস্থিত বিষপান করিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

৪। সীতারামের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্যামসুন্দর দিল্লীতে দরবার করিয়া মুর্শিদ কুলী খাঁর নিকট হইতে পৈতৃকরাজ্য পাইবার জন্য পত্র লইয়া আইসেন। রঘুনন্দন বলেন, সীতারামের রাণী ও অন্যান্য পুত্রগণের মত লইয়া সীতারামের রাজ্যের বন্দোবস্ত করা হউক। অন্যদিকে রঘুনন্দন মহম্মদপুরে প্রকাশ করেন যে, নবাবের আদেশে সীতারাম ও শ্যামসুন্দরের প্রাণদণ্ড হইয়াছে। অবশিষ্ট রাজপুত্রগণ ও রাণীগণ রাজ্যের আশা করিলে প্রাণে মরিবেন। রঘুনন্দনের সহিত জমিদারীর বন্দোবস্ত হইলে রাজ্যের পরিজনগণ প্রাণে বাঁচিতে পারেন। রাণীগণ ভয়ে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখেন যে, তাঁহাদের বংশে রাজ্যশাসনের

উপযুক্ত কেহ নাই। রাজ্য রঘুনন্দন বা তদীয় ভ্রাতা রামজীবনকে দেওয়া হউক। এই কৌশলে রঘুনন্দন সীতারামের রাজ্য লয়েন।

উল্লিখিত কিম্বদন্তী সকলই অলীক। সীতারামের পতনের পর নবাব রামজীবনকে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করায় সীতারামের বিশাল রাজ্যের অধিকাংশ তাঁহার সহিত বন্দোবস্ত করেন। মুনিরাম হইতে অনেকেই সীতারামের রাজ্য লইবার অভিলাষী ছিলেন। কাহারও আশা পূর্ণ হইল না। উপযুক্ত পাত্র রামজীবনই বিস্তীর্ণ জমিদারীর কর্ত্তা হই-লেন। দয়ারাম সেই বিশাল রাজ্যের দেওয়ান হইলেন। ইহা অনেকের চক্ষুঃশূল হয়। এই ঈর্ষার বশবর্ত্তী হইয়া তৎকালের লোক সকল যত কলঙ্কের ভার রায় রঘুনন্দন, রাজা রামজীবন ও দয়ারামের শিরে অর্পণ করিয়াছিলেন। বিশ্বস্ততা ও কর্ম্মকুশলতা যে রঘুনন্দনের উন্নতির ভিত্তি, তিনি বিশ্বাসঘাতক হইতে পারেন না। মুর্শিদ কুলী খাঁ মূর্খ ও বোকা নবাব ছিলেন না। তাঁহার বুকের উপর থাকিয়া রঘুনন্দনের শঠতা ও চতুরতাজাল বিস্তার করা কোনমতেই সম্ভব নহে। সীতারাম তোরাপের শিরশ্ছেদ করাইয়াছিলেন, বক্স আলিকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার প্রতি ও তাঁহার বংশীয় লোক-দিগের প্রতি দয়া করিয়া নবাবের সেই বিশাল জমিদারী প্রত্যর্পণের বিশেষ কোন কারণ ছিল না: তদপেক্ষা বিশ্বস্ত অনুগত কার্য্যক্ষম রাজা রামজীবনের সহিত জমিদারীর বন্দোবস্ত করাই বুদ্ধিমান্ নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁর পক্ষে উপযুক্ত কার্য্য। আরও ক্রমে ক্রমে দেখাইব, রঘুনন্দন ও দয়ারাম প্রকৃতপক্ষে কলঙ্কী নহেন। সিংহরাম সাহের অধীন সুবেদারী সৈন্য ও দয়ারামের কর্ত্তৃত্বাধীনে জমিদারী সৈন্য স্থল ও জল

পথে নিরাপদে ভূষণা ও মহম্মদপুরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। এবারে পদ্মার জলে ও পদ্মার তীরে বিপক্ষ সৈন্যের পথ সীতারাম জানিতে পারেন নাই; সুতরাং গতিরোধ করিতে অসমর্থ হইলেন। সীতারামের দূতগণই জমিদারগণের উৎকোচে বাধ্য হইয়া বিপক্ষ সৈন্য আগমনের প্রকৃতপথ সীতারামকে বিজ্ঞাপন না করিয়া মিথ্যাপথের কথা জানাইয়া ছিল। সীতারামের রাজ্যের চতুষ্পার্শ্বস্থ জমিদারগণ সীতারামের বিরুদ্ধে মস্তক উত্তোলন করিলেন। তাঁহারা নবাব-সৈন্যের সাহায্য করিতে লাগিলেন। এবারে নবাবসৈন্য সম্মুখ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন না। সীতারামের অন্তঃপুরে মহিষীদিগের মধ্যে বিবাদ বাধাইবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। মেনাহাতীর ভোজন, শয়ন, পূজা ও রন্ধনাদি স্থানের অনুসন্ধান হইতে লাগিল। বিশ্বাসঘাতকতা-পূর্ব্বক অন্যায়রূপে মেনাহাতীকে গুপ্তহত্যা করা হইল। মেনাহাতীর গুপ্তহত্যা সম্বন্ধে দুইটী কিম্বদন্তী আছে—

১। মেনাহাতী দোলমঞ্চের নিকটে বসিয়া সন্ধ্যা করিতেছিলেন, দোলমঞ্চস্থ চন্দ্রাতপ কাটিয়া দিয়া তাঁহাকে চাপিয়া ধরিয়া শত্রুগণ তাঁহার প্রতি কঠিন আঘাত করিতে লাগিল। মেনাহাতীর দক্ষিণ বাহুতে এক ঔষধ ছিল, তাহাতে তিনি প্রহারের যন্ত্রণা পাইতেন না ও তাহা দূর না করিলে তাঁহার মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা ছিল না। মেনাহাতী চন্দ্রাতপের চাপে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া ভীষ্মের ন্যায় মৃত্যুর উপায় বলিয়া দিলেন। তাঁহার বাহু হইতে ঔষধ বাহির করিয়া হত্যাকারিগণ তাঁহার শিরশ্ছেদন করিল। তাঁহার ছিন্নমস্তক মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হইল। মুর্শিদ কুলী খাঁ এরূপ বীরকে নিধন না করিয়া জীবন্ত ধরিয়া

পাঠাইলে ভাল হইত, এইরূপ মত প্রকাশ করিলেন। তাঁহার ছিন্নমস্তক পুনরায় মহম্মদপুরে আসিল। সীতারাম তাঁহার অগ্নিসংকার করিয়া মুসলমান-পদ্ধতিক্রমে তাঁহার কীর্ত্তিরক্ষার জন্য তাঁহার সমাধির উপর স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইলেন। মেনাহাতীর কবর প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে খনন করা হইয়াছিল। তাঁহার পায়ের নলা ৩৬ ইঞ্চি ছিল। ৩৬ ইঞ্চি পায়ের নলা হইলে মানুষটী ১৮ ইঞ্চি হাতের ৭ হাত লম্বা হয়।

২। মেনাহাতী দোলমঞ্চের নিকট প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপন করিয়া যাইবার সময় দেখিলেন, এক রুগ্ন ব্যক্তি পথপার্শ্বে শয়ন করিয়া আছে। সে কাঁদিয়া মেনাহাতীর নিকট কিছু ভিক্ষা চাহিল। মেনাহাতী তাহাকে কিছু ভিক্ষা দিয়া তাহাকে কোলে করিয়া চিকিৎসালয়ে লইয়া যাইতেছিলেন, সেই ছদ্মবেশধারী রোগী তীক্ষ্ণ ছুরিকায় মেনাহাতীর পেট দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিল। মেনাহাতী তাহাকে ভূমিতে ফেলিলে সে ছুটিয়া পলায়ন করিল। মেনাহাতী পেটকাটা ভয়ানক অবস্থা দর্শন করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহার বাহু হইতে ঔষধ বাহির করিতে বলিলেন। ঔষধ বাহির করিলেই মেনাহাতীর মৃত্যু হইল। মেনাহাতীর শব দাহন করা হইল। তাঁহার বৃহৎ বৃহৎ অস্থিগুলি সমাধিস্থ করা হইল। তাঁহার কঙ্কালচূর্ণগুলি ভাগীরথী-জলে নিক্ষেপ করা হইল।

যৎকালে মেনাহাতীর এইরূপ নৃশংসভাবে অপঘাত মৃত্যু হইল, তখন সীতারাম ভূষণার কেল্লায় বক্তার, আমলবেগ প্রভৃতিকে লইয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন এবং মেনাহাতী মহম্মদপুরে থাকিয়া দুর্গরক্ষা করিতেছিলেন। ভূষণার কেল্লায় সীতারাম সহোদর তুল্য, স্বদেশ-প্রেমিক ভীষ্মচরিত মেনাহাতীর নৃশংস মৃত্যুর সংবাদ পাইলেন।

সীতারামের শোক-দুঃখের পরিসীমা থাকিল না। মেনাহাতী তাঁহার রাজ্যস্থাপন, পালন ও রক্ষণের দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ ছিলেন। মেনাহাতীর ন্যায় বিশ্বস্ত সুহৃদ্ জগতে দুর্ল্লভ। মেনাহাতীর ন্যায় জিতেন্দ্রিয় অথচ বীর পৃথিবীতে অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। সীতারাম ও মেনাহাতী একই উচ্চ আশায় বুক বাঁধিয়া, একই দেশীয় লোকের দুর্দ্দশাদর্শনে বিগলিত হইয়া কেবল দেশের লোকের দুর্গতি দূর করিবার সংকল্পেই কেহ রাজা ও কেহ সেনাপতি ছিলেন। অথচ পরস্পর পরস্পরকে ভ্রাতৃস্নেহ করিয়া হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিতেছিলেন। লক্ষ্মণ বিয়োগে রাম, কুম্ভকর্ণ বিয়োগে রাবণ, দুঃশাসন আদি ভ্রাতৃবিয়োগে দুর্য্যোধন যেরূপ ব্যথিত ও শোকসন্তপ্ত না হইয়াছিলেন, মেনাহাতীর বিয়োগে সীতারাম তদপেক্ষা অধিকতর দুঃখিত ও শোকার্ত্ত হইলেন। তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিল। তিনি এই যবনপ্লাবিত বঙ্গে মুখে বন্ধুভাণকারী ও হৃদয়ে সর্ব্বনাশে উদ্যোগী পার্শ্ববর্ত্তী জমিদারগণের মধ্যে বিজিত এবং বাধ্য থাকার ভাণকারী অরাতিপূর্ণ রাজ্যে কি উপায় করিবেন, কি প্রকারে জাতি, মান-সম্ভ্রম রক্ষা করিবেন, সেই বিষয়ে মতস্থির করিতে পারিলেন না। মেনাহাতীর মৃত্যুর তিন দিন পরে রজনীযোগে তিনি সসৈন্যে ভূষণা ছাড়িয়া মহম্মদপুরে আগমন করার সঙ্কল্প করিলেন। মুসলমানেরা পূর্ব্বে দুই যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছিল। আবু তরাপ যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন ও বক্স-আলি পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিয়াছেন। সিংহরাম সাহ চতুর ও বুদ্ধিমান্ সেনাপতি। গত দুই যুদ্ধে সীতারামের বলক্ষয় হইয়াছে। অধীনস্থ ও পার্শ্বস্থ সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ জমিদারগণ ধন-জন দিয়া সহায়তা না করিয়া তাঁহার শত্রুপক্ষের সহায়তা করিতে লাগিলেন।

জমিদার ও নবাবশক্তি তাঁহার ধ্বংসসাধনে কৃতসঙ্কল্প। কুরুযুদ্ধে অভি-মন্যুর ন্যায় সীতারাম নিরুৎসাহ ও ভগ্নোদ্যম হইলেন না। তিনি রজনীর গাঢ় তামসাকাশের আশ্রয় লইয়া ধীরে ধীরে সৈন্যগণ সহ ভূষণার কেল্লা হইতে বহির্গত হইলেন। ভূষণার কেল্লা হইতে প্রায় একমাইল আসিয়াছেন, কতক সৈন্য নদী পার হইবার উদ্যোগ করি-তেছে, এমন সময়ে সম্মুখে বামপারে সুবেদারী সৈন্য ও পশ্চাতে দক্ষিণপার্শ্বে জমিদারীসৈন্য সীতারামকে বেষ্টন করিল। পরপারের সৈন্যগণ পার না হওয়া পর্য্যন্ত সীতারাম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন না। সন্ধির প্রস্তাবে সীতারামের দূত নবাবসেনাপতির নিকট ও নবাবসেনাপতির দূত সীতারামের সেনাপতির নিকট প্রেরিত হইল। অন্ধকার-রজনী, কোন পক্ষের আলোকের ভাল বন্দোবস্ত নাই। শক্রমিত্রের ভেদাভেদ করা সুকঠিন। তাহার পরে চৈত্রমাস, আলোক জ্বালিলেও প্রবল বায়ুতে রক্ষা করা কঠিন। অন্ততঃ প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত উভয়পক্ষ যুদ্ধে নিরস্ত থাকেন, সীতারাম এই প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। নবাবপক্ষ হইতে প্রস্তাব হইল, বক্তার, আমিনবেগ এবং রূপচাঁদ প্রভৃতি সহ সীতারাম ও তাঁহার দশজন সেনানায়ক আত্মসমর্পণ করিলে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত কেন সিংহরাম সাহ একেবারে যুদ্ধ পরিত্যাগ করিবেন। সীতারামের রাজ্য সীতারামকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য প্রয়াস পাইবেন। সীতারামের দূত পুনরায় বলিল, রাজা চারিটী মাত্র সেনানায়ক লইয়া নদী পার হইয়াছেন। পরপারে ছয়টী সেনানায়ক ও চারি সহস্র সৈন্য আছে। তাহারা সকলে সমবেত না হইলে ও পরামর্শ না করিলে মুসলমান-সেনাপতির প্রস্তাবের প্রকৃত উত্তর দিতে

অসমর্থ। এইরূপ কথা হইতে হইতে সীতারামের সকল সৈন্য নদীর পশ্চিমপারে আসিল। সীতারাম দশজন সেনানায়ক, পেস্কার ভবানী প্রসাদ ও গুরুদেব রত্নেশ্বরকে লইয়া পরামর্শ করিলেন। রত্নেশ্বর, বেলদারসৈন্যের কর্ত্তা মদনমোহন বসু ও রূপচাঁদ ইঁহারা যুদ্ধ না করাই শ্রেয়ঃ পরামর্শ স্থির করিলেন, আর সকলের মতে যুদ্ধ করাই শ্রেয়ঃ বলিয়া বিবেচিত হইল। বক্তার বলিল, আমরা সকলেই একপারে আসিয়াছি, অদ্যরাত্রেই যুদ্ধের ভাল সময়। আমরা এই স্থানের জল, জঙ্গল, পথঘাট ভালরূপ চিনি। অদ্য আমরা যুদ্ধে জয়ী হইতে পারিলে এ যাত্রা মুসলমানের সকল আশা নির্ম্মূল হইবে। এই কথা বলিয়া বক্তার ও আমিনবেগ দক্ষিণ ও উত্তরদিক্ দিয়া সুবেদারী সৈন্য আক্রমণ করিলেন। তুমুল সংগ্রাম বাধিল; অসংখ্য মশাল জ্বলিল। সীতারাম কামান লইয়া যবনবাহিনীর মধ্যদেশ আক্রমণ করিলেন। যবনবাহিনী তিনস্থানে আক্রান্ত হইল।

মুসলমানপক্ষে আল্লা হো আকবর ও হিন্দুপক্ষে কালীমায়কী জয় নিনাদে নৈশবায়ু কম্পিত ও নিকটস্থ গ্রামসমূহ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। নিকটস্থ গ্রামবাসী নরনারীগণ ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল। বারাসিয়া নদীর জল ও রণপ্রান্তর কম্পিত হইতে লাগিল। সীতারাম দুই করে দুই কামান দাগিতে দাগিতে যবনবাহিনীর উপর আপতিত হইলেন। তাঁহার পার্শ্বচর পাঠান সৈনিকেরাও কামান দাগিতে দাগিতে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। সীতারাম সিংহরামের সম্মুখীন হইয়া বলিলেন—"রে ক্ষত্রিয়কুলপাংশুল! তুই হিন্দু হইয়া হিন্দুর স্বাধীনতা লোপ করিতে আসিয়াছিস্। মুসলমানসংসর্গে তোর পবিত্র

ক্ষত্রিয়রক্ত কলঙ্কিত হইয়াছে। আজ সর্ব্বাগ্রে স্বদেশ-দ্রোহী ভারত-মাতার কুসন্তান হিন্দুর রক্তে আজ আমার অসি পবিত্র করিয়া পরে দেশবৈরী যবননাশে প্রবৃত্ত হইব।”

সিংহরাম সাহ লজ্জিত হইয়া বলিলেন,—“রাজন্! বৃথা তিরস্কারে প্রয়োজন কি? নিরুপায়ে, নৈরাশ্যে, মুসলমান অধীনে ভৃত্য হইয়াছি। আপনি আপনার কর্ত্তব্য সাধন করুন। আমিও ক্ষত্রিয়, ভৃত্যের দশায় কর্ত্তব্যপালনে ক্ষত্রিয়বীর্য্যই প্রদর্শন করিব।”

উভয়ে অসিযুদ্ধ বাধিল। সিংহরাম ক্রমে পশ্চাৎপদ হইতে লাগিলেন। সীতারামের অসির আঘাতে দুইবার সিংহরামের অসি ভগ্ন হইল। বক্তার, রূপচাঁদ, ফকির প্রভৃতি অমানুষিক বীরত্ব প্রদর্শন করিলেন। যবনসৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। সীতারাম যুদ্ধে জয়ী হইলেন। বেলা এক প্রহর হইতে না হইতে সীতারাম সসৈন্যে মহম্মদপুরের দুর্গে উপনীত হইলেন. কিন্তু এই যুদ্ধে সীতারামের বহু সৈন্য ক্ষয় হইল ও অনেক যুদ্ধোপকরণ সীতারামের হস্তচ্যুত হইয়া গেল।

সীতারাম মহম্মদপুরে আসিয়া সৈন্য ও যুদ্ধসম্ভার বৃদ্ধি করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, চতুষ্পার্শ্বে আর তাঁহার মিত্র নাই। সকলই তাঁহার শত্রু। অন্য ভূস্বামিগণের জমিদারী হইতে তাঁহার চাউল, ডাউল খরিদ করিবার উপায় নাই। তাঁহার রাজধানীতে কোন লৌহ বা গন্ধকপূর্ণ নৌকা আসিবার সুবিধা নাই। তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সন্ধি, কি আত্মসমর্পণ, কি পলায়ন করিবেন চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে সহসা মুসলমানবাহিনী মহম্মদপুর আসিয়া নগর অবরোধ করিল।

“ইহার পর সীতারামের পতন সম্বন্ধে দুই মত আছে। কেহ কেহ

বলেন, অবরুদ্ধ সীতারামের রাজধানীর উপর রজনীতে যবনসৈন্য আসিয়া আপতিত হয় এবং সীতারাম তুমুল সংগ্রাম করিতে করিতে বন্দী হয়েন। দ্বিতীয় মত এই যে, সীতারামের তৃতীয় রাণী এইরূপ অবরুদ্ধ নবাবের দুর্গে অবস্থিতি করায় সর্ব্বদা দুঃখিত থাকিতেন। সীতারাম যুদ্ধ না করিয়া, অরাতি বিদূরিত না করিয়া, রাজভবনে অবরুদ্ধ অবস্থায় বাস করিতেছেন দেখিয়া তৃতীয়া মহিষী তাঁহাকে বিদ্রূপ করেন। এই বিদ্রূপে সীতারাম ক্রুদ্ধ হইয়া সবেগে সসৈন্যে রজনীতে যবনসৈন্যের উপর নিপতিত হন এবং সেই যুদ্ধে সীতারাম পরাস্ত হন। ২য় রাণী সম্বন্ধীয় কিম্বদন্তী কেবল সীতারামের পরিবারস্থ লোক মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়। প্রকৃত কথা এই যে, যবনেরা রজনীযোগে সীতারামের দুর্গ আক্রমণ করে। তাহারা হঠাৎ রজনীতে সীতারামের দুর্গ আক্রমণ করিবে, এ বিশ্বাস সীতারামের ছিল না। যে রজনীতে নগর আক্রান্ত হয়, সেই রাত্রে সীতারাম তৃতীয়া মহিষীর গৃহে ছিলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া সীতারাম সসৈন্যে প্রাণপণে যুদ্ধ করেন।"

গোপনে ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ হইতে নূতন মুসলমান-সৈন্য আসায় সিংহরাম নৈশ আক্রমণে প্রবৃত্ত হন। দুর্গের সিংহদ্বার হইতে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হয়। সে যুদ্ধ বর্ণনা করে এমন সাধ্য কাহার নাই। সে দিন সীতারাম, বক্তার, আমিনবেগ, রূপচাঁদ ও ফকির যেন দৈববলে বলীয়ান্ হইয়া দেবগণের ন্যায় অচল অটল ভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কামান, বন্দুক, অসি, বল্লম, তীর, ·গুলাল সকলই যুদ্ধে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। শুনা যায়, স্বয়ং কমলা রাণী বীরবেশে গুরু কৃষ্ণবল্লভের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কামান ছুড়িয়া ছিলেন। দ্বিতীয় থার্ম্মপলির যুদ্ধের ন্যায়

সিংহদ্বারে ঘোর সংগ্রাম হইল। সিংহদ্বারে মুসলমান ক্ষয় করিতে করিতে সীতারাম ও তাঁহার সেনাগণ ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। একদিকে অসংখ্য মুসলমান-বাহিনী, অন্যদিকে অবরুদ্ধ অল্পসংখ্যক সীতারামের সৈন্যদল। সীতারাম স্বদলবল সঙ্গে আসিতেছে বিবেচনা করিয়া একবার হঠাৎ যবন-সৈন্যের মধ্যে অগ্রসর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সৈন্যদল বাধা পাইয়া অনুগমন করিতে পারিল না। বহুসংখ্যক মুসলমান-সৈন্য একসঙ্গে সীতারামকে আক্রমণ করিল। সীতাবামের গুলি ফুরাইল, বন্দুক ভাঙ্গিল, অসি খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল, তবু সীতারাম মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। বহু মুসলমান বীর একসঙ্গে সীতারামকে ধরিয়া ফেলিল। বাঙ্গালী গৌরব স্বদেশপ্রেমিক হিন্দুর দুঃখবিমোচন-কারী বীর সীতারাম চির রাহুগ্রাসে পতিত হইলেন। বাঙ্গালার শিবাজী, বাঙ্গালার প্রতাপ, বাঙ্গালার গুরুগোবিন্দ, বাঙ্গালার শেষ বীর, বাঙ্গালার শেষ আশা, এই নৈশ যুদ্ধে নির্ম্মূলিত হইল।

মেনাহাতীকে সমাধিস্থ করা হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে মুসলমান বলিয়া অনুমান করেন। মেনাহাতী, মেলাহাতী, রামরূপ, রূপ-রাম, মৃন্ময় প্রভৃতি তাঁহার যে নাম পাইতেছি,তাহার কোন নামই মুসল-মান নাম নহে। মেনাহাতী মুসলমান হইলে তাঁহার দোলমঞ্চে বসিয়া আহ্নিক করার প্রয়োজন হইত না এবং দোলমঞ্চের নিকটে প্রতিদিন যাইতে হইত না। মেনাহাতীকে জিতেন্দ্রিয় এবং রামসাগর প্রভৃতি দীঘী কাটাইতে প্রবৃত্ত দেখিতে পাই, তাহাতেও তাঁহাকে মুসলমান অনু-মান করিতে পারি না। সীতারামের সময়ে মুসলমানপ্রথা বিশেষ চল হইয়াছিল। কীর্ত্তিরক্ষার জন্য কীর্ত্তিমান্ পুরুষের সমাধিস্তম্ভনির্ম্মাণ

চিরকালই প্রচলিত আছে। এই কারণে আমরা বলি, মেনাহাতী হিন্দু; কখনও মুসলমান নহেন। রামসাগর নামও রামরূপের নামানুসারে হইয়াছে। রামরূপ কোন যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছেন এ কথা কেহ বলেন না। এই মাত্র কথিত আছে, একবার সীতারামের জন্মতিথি পূজা উপলক্ষে বন্দিগৃহের বন্দিগণকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সেদিন কুস্তি, ব্যায়াম, রহস্যযুদ্ধ প্রভৃতি ক্রীড়া প্রদর্শন হইতেছিল। বন্দিগণের মধ্যে কোন্নগরের নিকটস্থ কর্ণপুর গ্রাম হইতে কাতলি গ্রামে নবাগত রামসন্তোষ দে সিকদার উপস্থিত ছিলেন। তিনি রাজস্ব দিতে অসমর্থ হওয়ায় বন্দী হইয়াছিলেন। রামসন্তোষ ও রামরূপে বাহুযুদ্ধ হয়। এই বাহুযুদ্ধে রামরূপ পরাস্ত হইয়াছিলেন। রামসন্তোষ এই বাহুযুদ্ধে জয়ী হওয়ায় পুরস্কার স্বরূপ কর না দিয়া মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন ও গুণগ্রাহী রাজা সীতারামের নিকট বস্ত্র ও সোণার তাগা পাইয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন। রামরূপ বা মেনাহাতীর জীবনে এই এক দিন মাত্র বাহুযুদ্ধে পরাভবের কথা শুনা যায়।

দয়ারাম কোন্ পথে মহম্মদপুর রাজ্যে আসিয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। রাজা রামদেবের মহামুদসাহী পরগণার উত্তর দিক্ দিয়া তিনি আসিতে পারিয়াছিলেন এইরূপেই অনুমিত হয়। অধুনা দিঘাপতিয়ার রাজবংশের বরিশাট কাছারির প্রাচীন নাম বীরসাত অর্থাৎ এই স্থানে দয়ারাম বীরসঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম বীরসাত হইয়াছিল। এই বীরসাতের কাছারি সাহা-উজিয়াল পরগণার অন্তর্গত হইলেও মহামুদসাহী পরগণার মধ্য দিয়া না আসিলে এস্থানে কোন দিক্ দিয়া আসিবার উপায় নাই।

অধুনা বুনাগাতি গ্রামে যে সরকার বংশ আছেন, এই কায়স্থ সরকার বংশের আদিপুরুষ জয়নারায়ণ সরকার মুর্শিদাবাদে রঘুনন্দনের অধীনে রাজস্ব সংক্রান্ত কোন উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। বরিশাট ও বুনাগাতির মধ্যে কয়েকটী মৌজা তাঁহার নজর হইতে প্রাপ্ত নিষ্কর সম্পত্তি ছিল। এই সকল স্থান সীতারাম দখল করিয়া লইয়াছিলেন। জয়নারায়ণ রাজস্ব-সংক্রান্ত কোন হিসাব লইয়া রঘুনন্দনের সহিত কলহ করেন। রঘুনন্দনের ভয়ে ভীত হইয়া তিনি পলায়ন পূর্ব্বক গোপনে মহম্মদপুরে উপনীত হন। তাঁহার এক কৃতবিদ্য পুত্র সেনাপতি রামরূপের ভ্রাতৃ-কন্যা অর্থাৎ রায় গ্রামের ঘোষ বংশের কোন কন্যার পাণিপীড়ন করিয়া ছিলেন, সেই সূত্রে জয়নারায়ণ তাঁহার পূর্ব্ব নিষ্কর উদ্ধারপূর্ব্বক বুনা-গাতিতে বাস করিতে থাকেন।

দয়ারাম সৈন্যসহ বীর-সাতে অবস্থিতি করিবার সময়ে জয়নারায়ণ তাঁহার প্রজাগণের প্রতি উৎপীড়ন হইতেছে বলিয়া দয়ারামকে স্থানা-ন্তরিত হইতে বলেন। অনন্তর দয়ারাম দেবীগঞ্জে সমারোহে কালিকা দেবীর পূজা করিয়া কামারখালির অপর নাম দেবীগঞ্জ রাখিয়া তথায় সেনানিবাস সংস্থাপন করেন। এই স্থান হইতে ভূষণার দুর্গ ও মহম্মদপুরের রাজধানী সমদূরবর্ত্তী ছিল। শুনা যায়, এই স্থানেও সীতারামের সংস্থাপিত গন্ধখালির ক্ষত্রিয়পল্লীর ক্ষত্রিয় বীরগণ দয়ারামকে বিশেষ উৎপীড়িত করিয়াছিল। দয়ারাম উৎকোচ দানে কতক ক্ষত্রিয় সৈন্য বাধ্য করিয়া লইয়াছিলেন। এই ক্ষত্রিয়দিগের সহিত রাজধানী মহম্মদপুরের দুর্গের উত্তর পার্শ্বস্থ কাটগড়া পাড়ার ক্ষত্রিয়দিগের কুটুম্বিতা থাকায় দয়ারামের সীতারাম-অন্তঃপুরের সংবাদ পাইবার সুবিধা হইয়াছিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

সীতারামের মৃত্যু

রাজা ও বাঙ্গালীবীর সীতারামের মৃত্যুর প্রকৃত বৃত্তান্ত বিবৃত করিবার পূর্ব্বে আমরা অগ্রে কিম্বদন্তীগুলি বর্ণন করিব। কিম্বদন্তীগুলি এই ঃ—

১। সেই নৈশযুদ্ধে সীতারাম সাংঘাতিক আঘাত পাইয়া সমরক্ষেত্রে নিপতিত আছেন। ফকির মহম্মদালীর কোন শিষ্য ফকিরকে দেশের উপকার করিবার জন্য পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ফকির বলিয়াছিলেন, সময় উপস্থিত হইলে তাহাকে উপযুক্ত পরামর্শ দিবেন। এই যুদ্ধক্ষেত্রে মহম্মদালী সেই শিষ্যকে সীতারামের বসন-ভূষণ ও যুদ্ধাস্ত্র লইয়া বিচরণ করিতে বলিলেন। ফকিরশিষ্য আহত ভূপতিত সীতারামের নিকট সীতারামের পরিচ্ছদ, মুকুট ও অসিবর্ম্ম প্রার্থনা করিলেন। সীতারাম তাহার উদ্দেশ্য না বুঝিয়া তাহাকে তাঁহার প্রার্থিত বস্তু সকল দান করিলেন। সেই ফকির-শিষ্য সীতারাম সাজিয়া যুদ্ধস্থলে বিচরণ করিতে লাগিল। সেই ধৃত হইয়া সীতারাম-বোধে মুর্শিদাবাদে নীত হইল। গুরু, পুরোহিত, ফকির ও মন্ত্রী যদুনাথ সীতারামের শুশ্রূষা করিতে আসিলেন। বঙ্গের দুর্ভাগ্য, বাঙ্গালীর দুরদৃষ্ট সেই আঘাতে সীতারাম পরদিন প্রাতে লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরের সম্মুখে জীবন লীলা

শেষ করিলেন। ফকিরের উদ্দেশ্য ছিল, তাহার শিষ্যকে সীতারামবোধে লইয়া যবনসৈন্য মুর্শিদাবাদে চলিয়া গেলে, সীতারামের আঘাত আরোগ্য হইবে এবং তাঁহাকে পুনরায় সিংহাসনে বসাইয়া রাজত্ব করাইবেন। ফকিরের মন্ত্রণায় কৃষ্ণবল্লভ ও যদুনাথেরও মত ছিল।

২। সীতারাম মহম্মপুরের দুর্গমধ্যে সম্মুখসমরে প্রাণত্যাগ করেন।

৩। সীতারাম বন্দী অবস্থায় মুর্শিদাবাদে যাইবার পথিমধ্যে নাটোরে বা অন্য কোনস্থানে হীরক অঙ্গুরীয়কের হীরক চুষিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

৪। সীতারামের মৃত্যু সম্বন্ধে চতুর্থ কিম্বদন্তী রঘুনন্দনের কলঙ্ক মধ্যে লিখিত হইয়াছে। দুইলক্ষ টাকা উৎকোচ দিয়া রঘুনন্দনকে বাধ্য করিয়া সীতারাম রাজ্য লইতে অভিলাষী হন। রঘুনন্দন পথিমধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণের নিকট হইতে এই টাকা লুটিয়া লন ও সীতারামকে কঠিন প্রাণদণ্ডের কথা বলেন। সীতারাম এই কথায় বিষপানে প্রাণত্যাগ করেন।

৫। আবু তরাপকে হত্যা, বক্স আলীকে যুদ্ধে পরাভব ও সংগ্রামসিংহ সাহার সহিত অন্যায় যুদ্ধ করায় এবং চতুর্দ্দশ বৎসর দেয় রাজকর না দেওয়ায় মুর্শিদ কুলী খাঁ তাঁহার উপর বিশেষ রুষ্ট ছিলেন। সীতারামকে লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া মুর্শিদাবাদে প্রকাশ্য রাজপথে রক্ষা করা হয় ও তথায় লৌহশলাকার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করিয়া বহু ক্লেশ দিয়া তাঁহাকে নিহত করা হয়।

৬। সীতারামকে প্রত্যহ বন্দী অবস্থায় প্রহরি-পরিরক্ষিত হইয়া নবাবদরবারে যাইতে হইত। নবাব-সরকারের কোন উচ্চ কর্ম্মচারীর প্রতি কতকগুলি লোক ক্রুদ্ধ ছিলেন, তাঁহার নিধন সাধন করা তাহাদের

অভিপ্রায় ছিল। তাহারা শালবিক্রেতাভাণে ছদ্মবেশে নবাবদরবারে উপস্থিত হয়। দরবারে কথায় কথায় সেই কর্ম্মচারীর সহিত তাহারা বিরোধ বাধায়। সেই বিরোধে তাহারা অসিচর্ম্ম লইয়া সবেগে সেই কর্ম্মচারীকে আক্রমণ করে। সীতারাম সেই আততায়ীদিগের তরবারি কাড়িয়া লন ও তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া সেই কর্ম্মচারীকে রক্ষা করেন। মুর্শিদ কুলী খাঁ তাহার বীরত্বদর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে মুক্তি দিলেন ও তাঁহার রাজ্য তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিবার আদেশ করিলেন, কিন্তু সীতারাম সেই যুদ্ধে এরূপ আহত হইয়াছিলেন যে, সেই দিন অপরাহ্ণে গঙ্গাতীরে ক্ষত স্থান হইতে রক্তস্রাব হইয়া তাঁহার মৃত্যু হয়।

৭। শৃগালের শৃঙ্গ অর্থাৎ কোন দুর্লভ বস্তু। মেনাহাতী সপ্তহস্ত দীর্ঘ মহাবীর সীতারামের সেই দুর্লভ বস্তু ছিলেন। চারি-ইয়ারি টাকা আকবরী মোহর ও লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ সীতারামের রাজশ্রীর মূলকারণ ছিল। এই চারি বস্তু সীতারামের গৃহে ছিল। এই চারি বস্তু জমিদার সৈন্য কৌশলে অপহরণ করে। লক্ষ্মীনারায়ণ মহম্মদপুর হইতে অপহৃত হইয়া নাটোরে যান এবং তথা হইতে অপহৃত হইয়া নড়ালে আইসেন। এই চারি বস্তুর অপহরণে সীতারাম জীবন্মৃত ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত মৃত্যু পূর্ব্ব হইতেই হইয়াছিল। যুদ্ধে কেবল তাঁহার দেহ হইতে প্রাণ বিয়োগ ঘটে।

৮। সীতারাম বন্দী হইয়া মুর্শিদাবাদে নীত হইবার সময় এক জোড়া শিক্ষিত পায়রা সঙ্গে লইয়া যান। তিনি যাইবার সময় বলিয়া যান, 'যদি রাজ্য ও জীবন উদ্ধার করিতে পারি, তবেই দেশে ফিরিয়া

আসিব, নচেৎ শিক্ষিত পায়রা উড়াইয়া দিয়া আমি আত্মহত্যা করিব।' নবাবদরবারে প্রতিদিন প্রহরী কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া আসা যাওয়ায়, জেলের কষ্ট ও রাজ্য-উদ্ধারের কোন আশা না পাওয়ায় সীতারাম পায়রা উড়াইয়া আত্মহত্যা করেন।

আমরা যে চারিখানি সনন্দের নকল পরিশিষ্টে দিব, তাহাতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, মুর্শিদাবাদেই সীতারামের মৃত্যু হইয়াছিল। এখন সীতারাম আত্মহত্যা করেন, কি লৌহশলাকায় বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন, কি অরাতিগণ কর্ত্তৃক আহত হইয়া গঙ্গাতীরে, কি আততায়ীর আঘাতজনিত রক্তস্রাবে তাঁহার মৃত্যু হয়, ইহাই সিদ্ধান্তের বিষয়। সকলগুলিই কিম্বদন্তী। কোন শাল-বিক্রেতাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া গঙ্গাতীরে মৃত্যুর কথাই সীতারামের গুরুকুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে। যে সময়ের কথা, তখন কি সম্রাট্ কি নবাব, সকলেরই দরবারেই ষড়-যন্ত্র হইত। অত্যাচার উৎপীড়নে লোক সকল মর্ম্মান্তিক জ্বালাতন হইত; সম্ভবতঃ উচ্চ কর্ম্মচারীর নিধনমানসে ছদ্মবেশী শাল-বিক্রেতাগণের সহিত দ্বন্দ্বকালে সীতারামের আঘাতজনিত মৃত্যুই বিশ্বাসযোগ্য কথা। বিশ্বস্ত, অনভিজ্ঞ, উচ্চপদস্থ রঘুনন্দন সামান্য রাজ্যলোভে নিজের চরিত্র নিজের ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া, মিথ্যা কথা বলিয়া, সীতারামের অর্থলুণ্ঠন করিয়া, সীতারামের আত্মহত্যার পথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন, এ কথা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। বাঙ্গালা, বিহার,উড়িষ্যার রাজস্বসচিব একজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ। মুসলমান-প্লাবিত দেশে একজন ব্রাহ্মণের উচ্চপদ? ঐ পদ তাঁহার পুরুষপরম্পরাগত নহে। নিজগুণে নিজ প্রতিভায় এই উচ্চ-পদ লাভ। এই রঘুনন্দন, এই মান্যগণ্য রঘুনন্দন, এই ন্যায়নিষ্ঠ, ধর্ম্মনিষ্ঠ

রঘুনন্দন বিশ্বাসঘাতকতা-দোষে দোষী হইবে, ইহা আধুনিক বাঙ্গালী-লেখকের লেখনী ভিন্ন অন্য জাতীয় লেখকের লেখনীপ্রসূত হইতে পারে না। রঘুনন্দনের কলঙ্ক আমাদের কলঙ্ক, বাঙ্গালীর উচ্চপদ লাভের অন্তরায়। রঘুনন্দন ও দয়ারাম সীতারামের প্রতিকূলে যাহা কিছু করিয়াছেন, তাহা নবাবের আদেশপালন ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। দয়ারাম জমিদারীসৈন্যের অধ্যক্ষ হইয়া আসিলেন। তিনি দেখিলেন, সীতারামের উদ্ধারের পথ নাই, তিনি শত্রুপরিবেষ্টিত। তাঁহার মিত্র—তাঁহার অনুগত জনই তাঁহার শত্রু। এ সময়ে সীতারামের অনুকূলতা করা কেবল নিজের জীবন, নবাবের ক্রোধ-হুতাশনে আহুতি দেওয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাই দয়ারাম নিজে কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন। সিংহরাম সাহ সীতারামের নিধনসাধন করিয়াছেন ও দয়ারাম তাঁহার সহায়তা করিয়াছেন। দয়ারাম নবাবপক্ষীয় লোক। নবাবকর্ত্তৃক সম্মানিত। জমিদারীসৈন্যের কর্ত্তৃত্বভার পাওয়াও কম সম্মানের বিষয় নহে। দয়ারাম বিশ্বাসঘাতক হন নাই। তলে তলে সীতারামের সহিত ষড়যন্ত্র করেন নাই, এইজন্য কি দয়ারামকে গালি দিতে হইবে? যদি কোন হিন্দু মুসলমানের অধীনে কার্য্য না করিত, যদি হিন্দু মুসলমানে এ সময় দ্বেষাদ্বেষী থাকিত, যদি মুসলমানের অধীনে হিন্দুর কার্য্যগ্রহণ করা এ সময়ে নিন্দনীয় হইত, তাহা হইলেও আমরা রঘুনন্দন ও দয়ারামকে কিছু বলিতে পারিতাম। প্রাচীনকালের দুই রাজবংশের আদিপুরুষ, জ্ঞানগরিমায় মণ্ডিত ও নবাব-সম্মানে সম্মানিত মহাত্মাদিগকে গালি দিয়া আমাদের লেখনী কলঙ্কিত করামাত্র। সীতারাম স্বাধীনভাবে হিন্দুরাজ্য স্থাপনে প্রয়াসী, রঘুনন্দন ও দয়ারাম নবাবসকাশে

সম্ভ্রান্ত হইতে উদ্যোগী। সকলেই বড়লোক। সকলেরই উচ্চ আশা—কেবল কর্ম্মক্ষেত্র পৃথক্। এক্ষণে একজন ওকালতী ও অন্যজন জজিয়তী করিয়া বড়লোক হইতেছেন। আর একজন ব্যবসা করিয়া ধনবান্ হইতেছেন। উকিল ও জজ ইংরাজাধীনে কার্য্য করেন বলিয়া আমরা তাঁহাদিগকে ঘৃণা করিয়া কি ব্যবসায়ীকে বেশী আদর করিয়া থাকি? বাঙ্গালী উকিল সাহেবের পক্ষে ওকালতনামা লইয়া ও বাঙ্গালী জজ্ সাহেবের মোকদ্দমার বিচারে ন্যায়বুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়া উভয়ে বাঙ্গালীর উপকার করিলে আমরা কি তাঁহাদিগকে প্রশংসা করিয়া থাকি? যদি লোকসমাজে ন্যায় ও ধর্ম্মানুগত কার্য্যের প্রশংসা বিহিত হয়, তবে রঘুনন্দন ও দয়ারাম কখনও সমাজে নিন্দিত হইতে পারেন না।

সীতারামের সঙ্গে শিক্ষিত পায়রা যাওয়া এবং জীবন ও রাজ্য উদ্ধার করিতে না পারিলে শিক্ষিত পায়রার মুখে পত্র দিয়া ছাড়িয়া দিয়া আত্মহত্যার কথাও প্রকৃত নহে। সীতারামকে মুসলমানগণ প্রবল বৈরী মনে করিত। রাত্রিতে সংগ্রাম সময়ে তাঁহাকে বন্দী করে।" তিনি পায়রা পাইতে ও সকলেকে বলিয়া যাইতে সুবিধা ও অবসর পান নাই। তাঁহার প্রতি নবাব-আদেশানুসারে নিষ্ঠুর ব্যবহারই হইয়াছিল। লৌহপিঞ্জরে করিয়া লয় বলিয়াই তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে উপরোক্ত পঞ্চম কিম্বদন্তী প্রচলিত হইয়াছে।

আমরা সীতারামের জীবনচরিত পর্য্যালোচনা করিয়া এই বুঝিয়াছি যে, তিনি লৌহ-পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া মুর্শিদাবাদে নীত হয়েন। তিনি যাইবার সময় আত্মীয়-স্বজনকে কোন কথা বলিয়া যাইতে পারেন নাই। যে রাত্রে তাঁহার দুর্গ আক্রান্ত হয়, ঠিক সেই রাত্রে তিনি পরাজিত হন

নাই। তাঁহার এক এক সেনাপতি এক এক দ্বারে তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। তিনি আমিনবেগ ও রূপচাঁদকে সঙ্গে করিয়া পূর্ব্ব দক্ষিণ দ্বার দিয়া সুবেদারী সৈন্যের উপর নিপতিত হন। সীতরামের সঙ্গে অধিক সেনা ছিল না। তাঁহার জানা ছিল, অন্যান্য সেনানায়কগণ তাহার অনুগমন করিবে। তাঁহারা দ্বাররক্ষায় এত ব্যস্ত ছিলেন যে. রাজার অনুসন্ধান লইতে পারিলেন না। সীতারাম অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে অশ্বারোহী সেনাপতি সিংহরাম সাহের নিকট উপস্থিত হন। সীতারামের সহচর সৈন্যগণ সকলেই রাজাকে রক্ষার জন্য বিশ্বস্ত ভৃত্যের ন্যায় সম্মুখসংগ্রাম করিয়া যুদ্ধে নিহত হয়। সীতারাম আহত হইয়া অশ্ব হইতে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। তাঁহার মূর্চ্ছিত অবস্থায় তাঁহাকে বন্দী করে। অপর কিম্বদন্তী এই যে, একাকী যুদ্ধ করিতে করিতে তিনি বন্দী হন, তাহা আমরা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদেই বলিয়াছি। মুর্শিদাবাদের দরবারে তিনি শালওয়ালা ছদ্মবেশী আততায়ী দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া নবাবকে সন্তুষ্ট করেন। তৎপূর্ব্বেও তিনি রাজবন্দীর ন্যায় সসম্ভ্রমে ছিলেন। মুর্শিদ কুলী খাঁ প্রসন্ন হইয়া, তাঁহার বীরত্বে সন্তুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে মুক্তিদান করেন ও তাঁহার রাজ্য তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিবার অঙ্গীকার করেন। সেই দিনেই সন্ধ্যাকালে গঙ্গাতীরে তাঁহার মৃত্যু হয়। সীতারামের মৃত্যুর ২।৩ দিন পূর্ব্বে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মীনারায়ণ কিছু অর্থ সঙ্গে লইয়া মুর্শিদাবাদে উপনীত হইয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদের ভাগীরথীতীরে সীতারামের মৃতদেহের সৎকার করা হইয়াছিল। সীতারামকে কেহ নিহত করেন নাই, অথবা তিনি আত্মঘাতী হন নাই। সাধারণ লোকের চক্ষে সীতারাম যতই

দোষী হউন, সীতারামের বিশ্বাস ছিল যে, তিনি মুর্শিদ কুলী খাঁর নিকট ক্ষমা পাইবেন। মুর্শিদ কুলী খাঁ অর্থলোলুপ ও অত্যাচারী হইলেও তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি ও গুণগ্রাহিতা গুণ ছিল। সীতারাম আবু তরাপকে নিহত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে কম উত্তেজনায় নহে। সীতারাম বঙ্গের দস্যুনিবারণে আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন; যে সীতরাম নবাবের অনুকূলে পাঠানের বিদ্রোহ নিবারণ করিয়াছিলেন,যে সীতারাম একটী শান্তি-সুখময় বিস্তীর্ণ রাজ্য গঠন করিয়া উঠাইয়া ছিলেন, কুলী খাঁ অবশ্যই তাঁহার গুণ গ্রহণ করিবেন। যে কর দেওয়া লইয়া আবু-তরাপের সহিত সীতারামের বিবাদ, ন্যায্যপক্ষে সে করও সীতারামের দেয় ছিল না। কয়েক বৎসর সীতারামকে কর মথুব দিবার কথা ছিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।
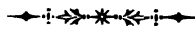
সীতারামের পরিবার ও উত্তর পুরুষগণের জ্ঞাতিগণের অবস্থা

যে নৈশ যুদ্ধে সীতারাম বন্দীকৃত ও যে যুদ্ধান্তে মুর্শিদাবাদে নীত হন, সেই রাত্রেই রাজ্যের দুর্ঘটনার সংবাদে রাজপুরীতে রাজপরিবারের আতঙ্কের পরিসীমা ছিল না। রাজ-পরিবারস্থ সকল লোক অন্তঃপুরের দ্বার দিয়া পলায়ন করিয়া রাজপুতপল্লী মধ্যে ছিরু রায় ওরফে শ্রীনাথ রায় নামক একজন ক্ষত্রিয়ের বাটীতে সেই রাত্রে আশ্রয় লন। দ্বিতীয় দিন সেই স্থলে গুপ্ত অবস্থায় থাকিয়া সেই রাত্রে তাঁহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকায়, প্রচ্ছন্ন ভাবে অতি সামান্য লোকের ন্যায় মহম্মদপুর নগর হইতে হরিহর নগরে পলায়ন করেন। তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন, লক্ষ্মীনারায়ণের গৃহে তাঁহারা সাদরে গৃহীত হইবেন। লক্ষ্মীনারায়ণ নিরীহ স্বভাবের ভীরুলোক ছিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার রাজ্যের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া হরিহর নগরের বাটীতেই বাস করিতেন। মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ বাধিবার প্রারম্ভেই লক্ষ্মীনারায়ণ পলায়ন করিয়াছিলেন।

দুর্ভাগ্য একা আগমন করে না। সীতারামের পরিজনবর্গ হরিহর-নগরের বাটীতে যাইয়া দেখিলেন যে লক্ষ্মীনারায়ণ তথায় নাই। বাটীতে বিগ্রহ ও পুরোহিতগণ বাস করিতেছেন। তাঁহারা প্রচ্ছন্নভাবে পুরো-

হিতদিগের বাস-গৃহেই থাকিলেন। মহম্মদপুরের যুদ্ধ শেষ হইল। বক্স আলি খাঁ ফৌজদার পুনরায় ভূষণা কেল্লায় বসিয়া ফৌজদারের কার্য্য করিতে লাগিলেন। বক্স আলির ব্যবহারে পলায়িত গৃহস্থগণ নিরাতঙ্কে প্রত্যাগত হইয়া মহম্মদপুরে বাস করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ দূত দ্বারা ফৌজদারের নিকট ভূষণায় আসিবার প্রস্তাব জানাইলে, তিনি তাঁহাকে হরিহর-নগরের বাটীতে আসিতে অনুমতি দিলেন।

সীতারামের পরিজনবর্গের দুর্দ্দশার কথা জানিয়া ও তাঁহার শৌর্য্য, বীর্য্য ও কীর্ত্তির কথা শ্রবণ করিয়া মুসলমান ফৌজদার বক্স আলির হৃদয়ও দ্রবীভূত হইল। সীতারামের গুরুদেব কৃষ্ণবল্লভ ও রত্নেশ্বর, রামদেব পুরোহিত, দেওয়ান যদুনাথ, পেস্‌কার ভবানীপ্রসাদ, মুন্সী বলরাম, বেলদার-সৈন্যাধ্যক্ষ মদনমোহন, সরকার গদাধর প্রভৃতি লক্ষ্মী-নারায়ণের নিকটে আসিলেন। যদুনাথপ্রমুখ সীতারামের অমাত্যবর্গ লক্ষ্মীনারায়ণের সহিত ফৌজদার বক্স আলির নিকট সীতারাম সম্বন্ধে কি করা যাইবে, পরামর্শ করিতে আসিলেন। বক্স আলিরও ইচ্ছা সীতারামের ন্যায় উদারচরিত মহাত্মার উদ্ধারের জন্য কোন রূপ সদুপায় অবলম্বিত হয়। সকলের মতে এই পরামর্শ ঠিক হইল যে, লক্ষ্মীনারায়ণ ও শ্যামসুন্দর কয়েক লক্ষ টাকা লইয়া মুর্শিদাবাদে যাইবেন এবং নবাব-কর্ম্মচারীদিগকে উৎকোচ দিয়া সীতারামের মুক্তির চেষ্টা পাইবেন।

এই পরামর্শানুসারে লক্ষ্মীনারায়ণ ও শ্যামসুন্দর অর্থ লইয়া নৌকা-পথে মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে তাঁহারা দস্যুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন। গুরুদেব কৃষ্ণবল্লভের পরামর্শানুসারে নৌকায়

মৃন্ময়পাত্রে যে তুলসী তরু ছিল, তন্নিম্নস্থ মোহরগুলি ও খাদ্যাদির মধ্যে যে সকল মোহর ছিল, তাহা দস্যুদল অপহরণ করিতে পারে নাই। তাহাদিগকে এক লক্ষ টাকা দিয়াই বিদায় করা হইয়াছিল। শ্যামসুন্দর ও লক্ষ্মীনারায়ণ মুর্শিদাবাদে উপনীত হইবার দুই দিন পরেই ছদ্মবেশী শাল-বিক্রেতাদিগের সহিত সীতারামের যুদ্ধ ও পরে রক্তস্রাবে ভাগীরথীতীরে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

সীতারামের মৃত্যু অন্তে লক্ষ্মীনারায়ণ ও শ্যামসুন্দর দেওয়ান রঘুনন্দনের সহায়তায় নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নবাব সীতারামের সুকীর্ত্তি বর্ণনাপূর্ব্বক তাঁহার বিস্তীর্ণ রাজ্য তাঁহার পুত্র ও ভ্রাতার সহিত বন্দোবস্ত করা হইবে এইরূপ আশ্বাস দিলেন এবং তাঁহাদিগকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিলেন। সীতারামের মৃত্যুতে নবাবও অতি দুঃখ প্রকাশ করেন।

আশ্বস্ত হইয়া লক্ষ্মীনারায়ণ ও শ্যামসুন্দর হরিহর-নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। হরিহর নগরের বাটীতেই মহাসমারোহে সীতারামের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। সীতারামের জীবদ্দশাতেই বসন্ত রোগে তাঁহার চতুর্থ ও পঞ্চম স্ত্রীর মৃত্যু হয়। সীতারামের স্ত্রী কমলা পতি-বিয়োগশোকে কাতর হইয়াছিলেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। সীতারামের মৃত্যুর কয়েক দিন পরেই তিনি কি প্রকারে জলে পতিত হইয়া পরলোক গমন করেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি আত্মঘাতিনী হইয়াছিলেন। কমলা বুদ্ধিমতী ও বিদুষী রাণী ছিলেন। তিনি সীতা-রামকে রাজ্যশাসন ও পালন বিষয়ে অনেক পরামর্শ দিতেন। কথিত আছে, সীতারাম ভূষণার কেল্লায় অবস্থিতিকালে এই রাণীই স্বয়ং মহম্মদ

পূরের যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত ও খাদ্যাদি সংগ্রহ কার্যের তত্ত্বাবধারণ করিতেন।

অন্যদিকে মুর্শিদাবাদে সীতারামের জমিদারীর ডাক হইতে লাগিল। রাজ্যচ্যুত বিতাড়িত ভূস্বামিগণ সকলেই মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, মুর্শিদ কুলী খাঁর বিশেষ অর্থের প্রয়োজন ছিল। উপযুক্ত বোধে সীতারামের কোন কোন পরগণা তাহার পূর্ব্বাধিকারিগণের সহিত বন্দোবস্ত করা হইল।

সীতারামের অধিকাংশ পরগণা নাটোরের রাজবংশের আদিপুরুষ বুদ্ধিমান্ বিচক্ষণ রাজা রামজীবনের সহিত বন্দোবস্ত করা হইল। কেবল নলদী পরগণা কিছুদিন সীতারামের উত্তরাধিকারিগণের হস্তে থাকিল। মুর্শিদকুলী খাঁ তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলেন না।

সীতারামের মধ্যমা স্ত্রীর গর্ভে শ্যামসুন্দর ও সুরনারায়ণ নামে দুই পুত্র জন্মে ও তৃতীয়া স্ত্রীর গর্ভে রামদেব ও জয়দেব নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। সুরনারায়ণের পুত্র প্রেমনারায়ণ যশোহর জেলার অন্তর্গত মাগুরা মহকুমা হইতে দশ মাইল দূরে শিয়ালজোড় গ্রামে ভগবান্‌চন্দ্র দাসের কন্যাকে বিবাহ করেন। ভগবানের কন্যা পরমাসুন্দরী ছিলেন। তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়াই প্রেমনারায়ণ তাঁহার পাণিপীড়ন করেন। এই দাসবংশ বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী বহড়ান গ্রামের দাস বলিয়া খ্যাত। এই দাস-বংশ আদিস্থান হইতে এই স্থানে সীতারাম কর্ত্তৃক আনীত, আশ্রিত ও প্রতিপালিত হন। এই বংশে এক্ষণে উমেশচন্দ্র, লক্ষ্মীকান্ত ও যুধিষ্ঠির চরণ দাস জীবিত আছেন।

দ্বিতীয়া স্ত্রীর সন্তানগণ সূর্য্যকুণ্ডের বাড়ীতে ও তৃতীয়া পত্নীর পুত্রগণ

শ্যামগঞ্জের বাটীতে বাস করিতেন। তাঁহারা যুদ্ধের রজনীতে মহম্মদ-পুরের দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া আর পুনঃপ্রবেশের অধিকার পান নাই।

নারায়ণের পুত্র রাধাকান্ত। রাধাকান্তের পুত্র নবকুমার ও কন্যা আলোকমণি। আলোকমণির পুত্র গিরীশচন্দ্র দাস ও গিরীশের পুত্র উমাচরণ দাস। উমাচরণের যোগেন্দ্রচন্দ্র দাস নামে একটা পুত্র জন্মে। এই পুত্র দশনবর্ষ বয়সে মাগুরা মহকুমার নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষা দিতে আসিয়া ১৮৯৮ সালে কলেরা রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যোগেন্দ্রের শোকসন্তপ্ত বৃদ্ধ জনকজননী অদ্যাপি জীবিত আছেন। তাঁহাদের আর সন্তান নাই। সীতারামের অপর দুই পুত্র রামদেব ও জয়দেব নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন।

লক্ষ্মীনারায়ণের চারিপুত্র যদুনাথ, নরনারায়ণ, জয়নারায়ণ, ও বিজয়নারায়ণ। নরনারায়ণের পুত্র মনসুখ চাঁদ ও নেহাল চাঁদ। মনসুখ চাঁদের তিন পুত্র—রঘুনাথ, রমানাথ ও প্রাণনাথ। নেহালচাঁদের দত্তক পুত্রের নাম কৃষ্ণকান্ত রায়। রমানাথের দুই পুত্র, কমলাকান্ত ও মাধব। কৃষ্ণকান্তের দুই পুত্র, গুরুদয়াল ও চৈতন্যচরণ। চৈতন্য-চরণের দুই পুত্র, সূর্য্যনাথ ও দেবনাথ রায়।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, নলদীপরগণা কিছুদিন সীতারামের উত্তরা-ধিকারিগণের হস্তে ছিল। কেহ কেহ বলেন, সীতারামের উত্তরাধিকারি-গণের মধ্যে জমিদারী কাহার নামে বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া হইবে এই গোলযোগে তাঁহারা জমিদারী প্রাপ্ত হন নাই শ্যামসুন্দর ও রামদেব দুইজনে দুই নামে জমিদারী বন্দোবস্ত করিয়া লইবার জন্য মুর্শিদাবাদে

গমন করেন। তাঁহারা দীর্ঘকাল পরে মুর্শিদাবাদে যাওয়ায় কোন পরগণাই প্রাপ্ত হন নাই। তখন সকল পরগণার বন্দোবস্ত শেষ হইয়াছিল।

সীতারামের মৃত্যু হইলে, লক্ষ্মীনারায়ণ ও শ্যামসুন্দরের মুর্শিদাবাদ হইতে আগমনের পর এবং শ্যামসুন্দর ও রামদেবের মুর্শিদাবাদে দ্বিতীয়-বার গমনের পূর্ব্বে মহম্মদপুর অঞ্চলে সীতারামের জমিদারীর প্রার্থিগণ অনেক অলীক গল্প প্রচার করিয়াছিল। সেই সকল গল্পের সত্যাসত্য অবগত হইয়া মুর্শিদাবাদে যাইতে শ্যামসুন্দর ও রামদেবের বিলম্ব হইয়াছিল। সেই গল্পগুলি এই ;—

সীতারামের মৃত্যুর পর সীতারামের বিচার হইয়াছে। সীতারাম রাজ-দ্রোহী, আবু-তরাপ ও অনেক মুসলমান সৈনিকের প্রাণহন্তা—সীতারাম বার্ষিক ৭৮ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় করিয়া লইয়াছেন। যদি সীতারামের উত্তরাধিকারিগণ ১৪ বৎসরের বাকী কর ৭ কোটী ৬২ লক্ষ টাকা নগদ দিতে না পারেন, তবে তাঁহাদিগকে যাবজ্জীবন কারাবাস করিতে হইবে।

২। ৭ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা আদায়ের জন্য সীতারামের পরিজনের প্রতি অত্যাচার করা হইবে। তাহাদিগকে বজরায় পুরিয়া চাবি দিয়া কুড়াল মারিয়া পদ্মায় ডুবাইয়া দেওয়া হইবে।

৩। সীতারামের পুত্রগণের মধ্যে, কেহ মুর্শিদাবাদে জমিদারী বন্দোবস্ত করিয়া আনিতে গেলে তাহাদিগকে মাজা পর্য্যন্ত পুঁতিয়া বড় বড় নবাবী কুকুর দিয়া খাওয়ান হইবে।

এই সব গল্পের মূল কি জানিবার জন্য দেওয়ান যদুনাথ মজুমদারের ভ্রাতৃপৌত্র গিরিধর মজুমদার সন্ন্যাসীবেশে মুর্শিদাবাদে যান। গিরিধরের যাওয়া সম্বন্ধে একটী কবিতা আছে—

"সন্ন্যাসীর বেশে গিরি, প্রবেশি নবাবপুরী,
জনে জনে জিজ্ঞাসিল বার্ত্তা।
কেহ বলে হ'তে পারে, কেহ বলে কও ফিরে,
তেমতি নিষ্ঠুর বঙ্গকর্ত্তা॥
ঘুরে ফিরে বহু দিন, করে অঙ্গ শ্রীহীন,
সত্য কথা জানে গিরিধর।
সকলি অলীক গল্প, রাজা লইবার কল্প,
রটে কথা,—বহুতর॥
নবাব বিরস মুখে, কথা কন অতি দুঃখে,
উঠিলেই সীতারাম কথা।
বীরের প্রধান বীর, রাজ্য-পালনেতে ধীর,
বড় কার্য্যে বড় যার মাথা॥
সেই গেল ছেড়ে বঙ্গ, কাণা কড়ি এক অঙ্গ,
তার মত আছে কয়জন।
ধন্য রাজা সীতারাম, কলিতে দ্বিতীয় রাম,
গুণে জ্ঞানে কর্ম্মে বিচক্ষণ॥

দেওয়ান রঘুনন্দনের ভ্রাতা রামজীবন রায় সীতারামের অধিকাংশ সম্পত্তি বন্দোবস্ত করিয়া সীতারামের মহম্মদপুরের রাজপ্রাসাদেই সুন্দর কাচারী সংস্থাপিত করিলেন। তাঁহার কর্ম্মচারিগণ ছলে বলে নলদী পরগণা লইতে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। নলদী হইতে ধোঁয়াইল দীঘলিয়া প্রভৃতি কয়েকটা তরফ বাহির করিয়া লইলেন। যৎকালে প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী রাণীভবানী নাটোরে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা

করিতেছিলেন, তখন প্রেমনারায়ণ রায় নলদী পরগণার গোলযোগ মীমাংসার জন্য তাঁহার নিকট গমন করিয়াছিলেন। এই সময়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আরম্ভ হয়। সীতারামের সমগ্র জমিদারী তাঁহার উত্তরাধিকারীর সহিত বন্দোবস্ত করা হইবে, গবর্ণমেণ্ট এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন। প্রেমনারায়ণ এই মন্তব্যের কিছুমাত্র জানিতেন না। যৎকালে প্রেমনারায়ণ নাটোরের যত্নে ও সমাদরে কালাতিপাত করিতেছিলেন, তখনই বুদ্ধিমতী রাণীভবানী তাঁহার পৈতৃক জমিদারী চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া লয়েন। এই সঙ্গে হতভাগ্য প্রেমনারায়ণের নলদী পরগণাও বন্দোবস্ত হইয়া যায়। পরিশেষে মহারাণী প্রেমনারায়ণকে নলদী ও সাঁতৈর পরগণার মধ্যে প্রেমনারায়ণের ভরণপোষণের জন্য কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন এবং প্রেমনারায়ণের ভৃত্যগণকেও তিনি কিছু চাকরাণ জমি দান করেন।

নাটোরের পতনের সময়ে যখন রাজা রামকৃষ্ণ যোগে মগ্ন এবং তাঁহার জমিদারীর পরগণার পর পরগণা করের দায়ে বিক্রয় হইতেছিল, তখন পাইকপাড়ার রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ নলদী পরগণা ক্রয় করেন। তিনি সীতারামের বংশধরগণের দুর্গতির কথা শুনিয়া ও স্বজাতীয় রাজবংশের সম্ভ্রমরক্ষার জন্য সীতারামের বংশধরগণকে বার্ষিক বার শত টাকা বৃত্তি দান করিতেন। ঐ বৃত্তি নবকুমার রায়ের সময়ে ছয়শত টাকা ছিল, পরে নবকুমারের বৃদ্ধদশায় ঐ বৃত্তি ৩৬০৲ টাকায় পরিণত হয়। নবকুমারের স্ত্রী মাসিক ১০৲ টাকা হারে বৃত্তি পাইতেন। প্রায় ২০ বৎসর অতীত হইল, এই বৃত্তি বন্ধ হইয়াছে। সীতারামের শেষ বংশধর উমাচরণের অবস্থা অতি শোচনীয়। উমাচরণ

একে প্রাচীন ও সন্তানবিহীন, তাহাতে আবার গ্রাসাচ্ছাদনেরও সাতিশয় কষ্ট। কালের কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন! যাঁহার পূর্ব্বপুরুষের বার্ষিক আয় ৭৮ লক্ষ টাকা ছিল, আজ সে নিরন্ন। অদৃষ্টচক্রে কালের প্রভাবে কাহার ভাগ্যে কি ফলোদয় হয়, তাহা বিশ্বস্রষ্টা ভিন্ন আর কে বলিবে?

লক্ষ্মীনারায়ণের শেষ বংশধর দেবনাথ রায়ের অবস্থাও বড় ভাল নহে। তিনি হরিহরনগরের বাটীতে বাস করেন। তাঁহার সামান্য সম্পত্তি আছে, তাহাতেই কোন ক্রমে গ্রাসাচ্ছাদন চলে। তাঁহার পৈতৃক ঠাকুর শ্রীধর এখনও বিদ্যমান আছেন। দেবনাথের গৃহে উদনারায়ণের সাঁজোয়ালী চাপরাস দৃষ্ট হইয়াছে।

সীতারামের জ্ঞাতিগণের উল্লেখ করাও এই পরিচ্ছেদে আবশ্যক। রামদাস গজদানীর তিন পুত্র অনন্ত ধনন্ত, ও শিবরাম। ইঁহারা কোথাও দাস বলিয়া তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছেন। শিবরামের আর দুই নাম দৃষ্ট হয়—রামমাণিক্য ও মাণিক্য। আমার বোধ হয় রামদাসের এই পুত্রের নাম প্রথম বয়সে রামমাণিক্য ছিল, পরে লোকে সংক্ষেপে রাম বলায়ও পিতৃনামের সঙ্গে এক হইয়া যাওয়ায় কেহ মাণিক্য ও কেহ শিবরাম বলিতেন। সীতারামের পূর্ব্বপুরুষ রামদাস গজদানীর পৌত্র ধরাধরের দুই পুত্র—রামলোচন ও সুধাকর। সুধাকরের বংশে সীতারামের উৎপত্তি। রামলোচনের পুত্রের নাম কৃষ্ণচন্দ্র, তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণ, তাঁহার পুত্র বক্সী নন্দকিশোর ও তাঁহার পুত্র কিরণচন্দ্র। নন্দ কিশোর ও কিরণচন্দ্রের মধ্যে কেহ দিল্লীতে সম্রাট অরঙ্গজেবের সভায় কোন উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারা বক্সী উপাধি ও বঙ্গদেশে অনেক জায়গীর প্রাপ্ত হন। ইঁহারা মেদিনীপুর জেলার

চন্দ্রকোণা অঞ্চলে বক্সী উপাধিতে পরিচিত। কিরণের পুত্র রামনাথ, তাঁহার পুত্র লক্ষ্মীকান্ত। মুর্শিদ কুলি খাঁ লক্ষ্মীকান্তের জায়গীর গুলি অপহরণ করিয়া মেদিনীপুর ও উড়িষ্যায় নূতন জায়গীর অর্পণ করেন। লক্ষ্মীকান্তের পুত্র প্রাণনাথ, তাঁহার পুত্র শ্রীনাথ ওরফে সৃষ্টিধর। সৃষ্টিধরের অবস্থা মন্দ হওয়ায় ইনি রাজা সীতারামের সরকারে বৃত্তি পাইতেন। সৃষ্টিধরের পুত্র বৃন্দাবন, তাঁহার পুত্র কৃষ্ণবল্লভ ও তাঁহার পত্র মদনারাম। মদনের পুত্র শোভারাম, তাঁহার পুত্র কুড়ারাম, তাঁহার পুত্র রাধাচরণ। এই রাধাচরণ দাস মহাশয় ইংরাজ আমলে সুখ্যাতির সহিত সদর ওয়ালার কার্য্য সম্পন্ন করেন। রাধাচরণের তিনপুত্র, জগমোহন, কৃষ্ণমোহন, ও হরিমোহন। কৃষ্ণমোহন হুগলিতে উকীল ছিলেন। কৃষ্ণমোহনের দুই পুত্র রাজীবলোচন ও রামলোচন। রাজীবলোচন সেরেস্তাদার ও রামলোচন মুন্সেফ ছিলেন। সেরেস্তাদার রাজীবলোচনের দুই পুত্র, শ্যামাচরণ ও কৈলাসচরণ। শ্যামাচরণ মেদিনীপুর কলেজের অধ্যক্ষ। শ্যামাচরণের দুই পুত্র, কুঞ্জবিহারী ও বিপিনবিহারী। কুঞ্জবিহারী বি, এল উকীল ও বিপিনবিহারী চিত্রকর। বিপিনবিহারীর পুত্র মণীন্দ্রনাথ। ইনি বি, এ। কৃষ্ণমোহনের দ্বিতীয় পুত্র রামলোচনের ছয় পুত্র। চন্দ্রশেখর, যদুনাথ, উপেন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ, মহেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ। চন্দ্রশেখর বি, সি, ই, ডিষ্ট্রিক্ট ইন্‌জিনিয়ার; যদুনাথ বি, এল সব জজ্; উপেন্দ্রনাথ এল, এম, এস্ এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন, দেবেন্দ্রনাথ বি, এল বাকিপুরে উকিল, মহেন্দ্রনাথ বি, এল মেদিনীপুরে উকিল ও সত্যেন্দ্রনাথ এম এ,বিএল ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট। ইনি প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া ডিপুটী পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ইনি ধীর ও স্থির প্রকৃতির লোক। ইনি গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে সাধারণের হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করায় যখন যে মহকুমায় থাকিতেছেন, তথাকার জনসাধারণের কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসার ভাজন হইতেছেন। চন্দ্রশেখরের পুত্র অমরেন্দ্রনাথ, ইনি এম এ ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট। যদুনাথের পুত্র শৈলেন্দ্রনাথ। উপেন্দ্রনাথের পুত্র যতীন্দ্রনাথ বি এ। দেবেন্দ্র-নাথের পুত্র অচলেন্দ্রনাথ। মহেন্দ্রনাথের পুত্র কালীপদ। সত্যেন্দ্র-নাথের পাচ পুত্র, হীরেন্দ্রনাথ, হরেন্দ্রনাথ, কিরাতনারায়ণ, কিরণচন্দ্র ও ও জ্যোৎস্নাকুমার। মাণিক্য বা শিবরামের বংশে এমকি সপ্ত পুরুষ নিম্নে অশোকরাম দাসের জন্ম হয়। মাণিক্য হইতে অশোকরাম পর্য্যন্ত কয়েক পুরুষের নাম আমি বিশেষ চেষ্টা করিয়াও পাই নাই। পুড়োপাড়ার ঘটকের পুথিতেও বোধ হয় এ নাম গুলি নাই অশোকরামের পুত্র বল্লভরাম। বল্লভরামের পুত্র বীরভদ্র বা বীরচরণ। ইনি মুর্শিদাবাদে মুর্শিদ কুলি খাঁর অধীনে কার্য্য করিতেন। বীরভদ্র নবাব সাহ সুজার সভাসদ থাকায় বহু ভূসম্পত্তি ও সরকার উপাধী পাইয়া-ছিলেন। বীরভদ্রের পুত্র দয়ালচন্দ্র। দয়ালচন্দ্র মেদিনীপুর অঞ্চলে ভূসম্পত্তি পাওয়ায় তথায় আসিয়া প্রথম অবস্থিতি করেন। দয়ালের পুত্র রাম-চন্দ্র। রামচন্দ্রের দুই পুত্র শ্যামাচরণ ও গুরুপ্রসাদ। শ্যামাচরণের পুত্র-টীকারাম, তাঁহার পুত্র শ্রীকান্ত। শ্রীকান্তের পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র, তাঁহার পুত্র পূর্ণচন্দ্র মুনসেফী করিতেছেন। পূর্ণচন্দ্রের পুত্রের নাম পৃথ্বীশ নারায়ণ। রামচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র গুরুপ্রসাদের পুত্র ব্রজমোহন। ব্রজমোহনের পুত্র কৃষ্ণমোহন। কৃষ্ণমোহনের দুই পুত্র, যাদবচন্দ্র ও উদয়চন্দ্র। যাদবচন্দ্রের পুত্র করালীচরণ। ইনি জীবিত আছেন ও ইংরাজগবর্ণমেণ্টের নিকট

পেনসান পাইতেছেন। করালীচরণের দুই পুত্র, সতীশচন্দ্র ও হেমচন্দ্র। কৃষ্ণমোহনের দ্বিতীয় পুত্র, উদয়চন্দ্রের ছয় পুত্র—কালীকিঙ্কর, বরদা-প্রসাদ, চন্দ্রশেখর, দুর্গাচরণ, সারদাপ্রসাদ ও অন্নদাপ্রসাদ। উদয়-চন্দ্রের সহধর্ম্মিণী অতি বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক ছিলেন। ইনি স্বীয় ভূষণ ও ভূসম্পত্তি বিক্রয় করিয়া পুত্রদিগের লেখাপড়া শিক্ষা দিয়াছিলেন। অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত না হইলে উদয়চন্দ্রের ছয়টী পুত্র ছয়টী দিক্‌পালের স্বরূপ হইতেন। চন্দ্রশেখর এণ্ট্রান্স হইতে এম এ, পর্য্যন্ত কোন পরীক্ষায় প্রথম দশজনের নিম্নে হন নাই। বি, এ, এম এ ও বি, এলে ইনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ইনি গণিতে এম এ। ইনি ভাগলপুরে গবর্ণমেণ্ট উকীল ছিলেন, এক্ষণে সে পদ পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন ভাবে ওকালতী করিতেছেন। ইনি ভাগলপুরের প্রধান উকিল। দুর্গাচরণের কথা অনেকেরই মনে থাকিতে পারে। দুর্গাচরণ এণ্ট্রান্স, এল, এ, বি, এ, পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। মৃত্যুশয্যায় ম্যালেরিয়া জ্বরে ছট্ ফট করিতে করিতে বিএ পরীক্ষায়ও দুর্গাচরণ প্রথম বিভাগে পাশ করেন। দুর্গাচরণের হতভাগিনী দুঃখিণী বিধবা স্ত্রী অদ্যাপি জীবিতা আছেন। সারদাপ্রসাদও এণ্ট্রান্স হইতে এম এ, পর্য্যন্ত সকল পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় ডিপুটী হইয়াছেন। কালীকিঙ্করের তিন পুত্র, শরচ্চন্দ্র, সরিৎচন্দ্র ও মন্মথকুমার। চন্দ্রশেখরের পাঁচ পুত্র, যামিনীমোহন বি, এ, যতিন্দ্রমোহন, সৌরেন্দ্রমোহন, ভূপেন্দ্রমোহন, ও নৃপেন্দ্রমোহন।

ধনন্তের বংশাবলী আমরা পাই নাই। কেহ ঐ বংশাবলী পাঠাইলে আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে পুস্তকস্থ করিব।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

—০—

যুদ্ধান্তে মহম্মদপুরের অবস্থা, সীতারামের রাজ্যভাগ ও মহম্মদপুরের পরবর্ত্তী কীর্ত্তি

যুদ্ধান্তে মুসলমান সৈনিকগণ নগরলুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল। সীতারামের দুর্গস্থিত বাজার ও রাজধানী ব্যতীত মহম্মদপুর নগর পূর্ব্বেই প্রায় ভয়ে জনশূন্য হইয়াছিল। সীতারামের দেওয়ান, পেস্কার, মুন্সী, সরকার, কানন্‌গো, সুমার-নবিস, জমা-নবিস প্রভৃতি কর্ম্মচারিবর্গ স্ত্রীপুত্র প্রভৃতিকে পূর্ব্বেই স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মূল্যবান দ্রব্যাদি অধিকাংশই গৃহে ছিল না। সীতারামের গুরু, পুরোহিত, কবিরাজ ও মৌলবীগণ পূর্ব্বেই সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। মহম্মদপুর নগরের প্রজাগণও অনেকেই ঘরদ্বার ছাড়িয়াছিল। দয়ারাম, সিংহরাম প্রভৃতি উচ্চপদস্থ সেনাপতিগণ লুণ্ঠন করিতে নিষেধ করিলেও মুসলমান সেনাগণ বাজার লুণ্ঠন করিল, বাজারের মিষ্টান্ন সকল লুটিয়া খাইয়া ফেলিল। সীতারামের রাজভবনের সকল দ্রব্য অপহরণ করিল। সিংহরাম ও দয়ারাম বহু চেষ্টায় দেবালয় সকল ও দেবসম্পত্তি লুণ্ঠন হইতে রক্ষা করিলেন।

বেলা দেড় প্রহরের সময় জয়োৎফুল্ল বিজয়ী মুসলমান-সৈন্যগণ দেওয়ান যদুনাথের ভবনে উপস্থিত হইল। আল্লাহো আকবর রবে গৃহ ও গৃহ-প্রাঙ্গণ প্রকম্পিত করিল। এই সময়ে যদুনাথের অন্নব্যঞ্জন

পাক করা হইতেছিল। বৃদ্ধ দেওয়ানজীর নিষেধ না মানিয়া সৈনিকগণ পদাঘাতে রন্ধনের হাঁড়ী সকল চূর্ণ করিল। কথিত আছে, মদনাথের অভিসম্পাতে তৎক্ষণাৎ দুইটা যবন-সৈনিকের মুখ হইতে রক্ত নির্গত হইতে থাকে ও তাহারা ভবলীলা সাঙ্গ করে।

তার পর সৈনিকগণ পেস্কার ভবানীপ্রসাদের গৃহে গমন করিয়াছিল। ভবানীপ্রসাদ অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগকে পূর্ব্বেই তাঁহার শ্বশুরালয়ে নলিয়া-গ্রামে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বৃদ্ধমাতা স্বগৃহস্থ দশভুজার সেবা পরিত্যাগ করিয়া কুটুম্বগৃহে গমন করেন নাই। সৈন্যগণ দশভুজামূর্ত্তি অপহরণে অভিলাষী হইলে, বৃদ্ধা মন্দিরদ্বার রুদ্ধ করিয়া দ্বারে দণ্ডায়মানা ছিলেন। সৈনিকগণ দ্বার ভাঙ্গিয়া বৃদ্ধাকে পদাঘাত করিতে উদ্যত হইলে সিংহরাম ও দয়ারাম আসিয়া উপস্থিত হইলেন। লুণ্ঠনকারী-দিগকে একেবারে ফাঁসি দেওয়া হইবে এই আদেশ প্রচার করায় সৈনিকদিগের লুণ্ঠনক্রিয়া নিবৃত্ত হইল। ভবানীপ্রসাদ সেই দিন রাত্রেই তাঁহার মাতা ও জগন্মাতা দশভুজাকে নলিয়ায় প্রেরণ করিলেন।

সীতারামের রাজধানী লুণ্ঠিত হইল এবং জাল ফেলিয়া রাজকোষ পুষ্করিণী হইতে ধনরত্ন উঠাইয়া মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হইল। কিন্তু সদাশয় দয়ারাম লইলেন কি? স্বার্থশূন্য ভক্তিমন্ত ধর্ম্মভীরু লুণ্ঠিত দ্রব্য স্পর্শও করিলেন না, বস্তুতঃ তিনি লুণ্ঠনকারীদিগকে লুণ্ঠন হইতে নিবৃত্ত করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা পাইলেন। জয়োল্লাসে মত্ত মুসলমান-সৈনিকের লুণ্ঠনগতি রোধ করা মুসলমান-সেনাপতিরও সাধ্য হইল না। স্বার্থশূন্য কর্ত্তব্যরত দয়ারাম মহম্মদপুর হইতে ধনরত্ন না লইয়া তাঁহার ভক্তির দ্রব্য, তাঁহার সাধনের ধন কেবলমাত্র কৃষ্ণজী বিগ্রহ লইলেন। এই

পরম ধন তিনি পরম যত্নে বস্ত্রাবৃত করিয়া স্বীয় গৃহে লইয়া গেলেন। এই কৃষ্ণের পাদপদ্মে 'দয়ারাম বাহাদুর' এই শব্দগুলি খোদিত আছে দয়ারাম কৃষ্ণজীকে গৃহে লইয়া কিছুদিন পরে প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিগ্রহের পূজা-অর্চ্চনা দিঘাপাতিয়ার রাজবাটীতে অদ্যাপি নিয়মিতরূপে হইতেছে। দয়ারাম, লোভী, স্বার্থপর, ষড়যন্ত্রকারী কুপ্রকৃতির লোক হইলে তিনি কখন লুণ্ঠনদ্রব্যের ভাগ পরিত্যাগ করিতেন না। তৎকালে লুণ্ঠনদ্রব্যের ভাগগ্রহণ বিজয়ী অধ্যক্ষের পক্ষে পাপ বা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত না। যে দয়ারাম এতদূর কৃষ্ণভক্ত, যে দয়ারাম এতদূর স্বার্থশূন্য, সেই দয়ারাম কর্ত্তৃক কোন ষড়যন্ত্র ও অসদুপায় অবলম্বিত হইয়াছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। পাপের সংসার স্থায়ী হয় না। আমরা দয়ারামের বংশের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়াও অনুমান করিতে পারি, তিনি কর্ত্তব্য ব্যতীত সীতারামের পতন সম্বন্ধে অন্য কোনরূপ পাপের কার্য্যে লিপ্ত হন নাই।

রাজা রামজীবন লব্ধ-জমিদারীর সদর-কাছারী মহম্মদপুরে স্থাপন করিয়া যান। তিনি সীতারামের প্রদত্ত সম্পত্তিতে সীতারামের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ ও অতিথিসেবা এবং পল্লানুষ্ঠেয় কার্য্য সকল রক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া যান। রাণী ভবানীর সময়ে মহম্মদপুরের কিছু উন্নতি হয়। রাণী ভবানী গঙ্গাতীরে মুর্শিদাবাদে বিধবা-তনয়া তারামণির সহিত অবস্থিতি-কালে ইন্দ্রিয়-দাস হিতাহিত-জ্ঞান-বর্জ্জিত সিরাজউদ্দৌলার দৃষ্টি সৌন্দর্য্য-ময়ী যৌবনসন্ন্যাসিনী তারামণির প্রতি পতিত হয়। ভবানী তারামণিকে মহম্মদপুরে আনিয়া লুক্কায়িত অবস্থায় রাখেন **। আবার মহম্মদপুরে প্রাচীন গড় সংস্কৃত হয়। কানাইপুরে রাজনন্দিনীর বাসের উপযুক্ত

নিরাপদ্ ভবন নির্ম্মিত হয়। তারামণির স্বামীর নামানুসারে রামচন্দ্র-বিগ্রহ ও তদীয় মন্দির সংস্থাপিত হয়। তাঁহার আহ্নিকের জন্য শিবমন্দির ও শিব প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্নপূর্ণাসদৃশ ভবানীর তনয়ার মহম্মদপুরে আগমনে মহম্মদপুর যেন সজীব হইয়া উঠে। মহম্মদপুর আবার নূতন শোভা ধারণ করে। মহম্মদপুরে দেবসেবার আবার সুবন্দোবস্ত হয়। এখানকার বাজার আবার জমকাইয়া উঠে। স্থানীয় অধিবাসীর মনেও রাজনন্দিনীর আগমনে আবার রাজভবন হইবার আশা উদিত হইয়া উঠে; কিন্তু সে আশা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়।

যোগী রাজা রামকৃষ্ণের বিষয়ভোগ-বাসনা ছিল না। তাঁহার এক এক পরগণা বিক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দৈবকার্য্যের বাধা অপনীত হইতেছে ভাবিয়া তিনি পরমানন্দে মহোৎসবে জয়কালীর বাড়ীতে পূজা দিতে লাগিলেন। যৎকালে বিষয়-ভোগাভিলাষ-পরিপূর্ণ তাঁহার পরিজন ও কর্ম্মচারিগণ বিষাদে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন, তিনি সোৎসাহে সোৎসবে সাগ্রহে হাস্যমুখে পূজা দিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার জমিদারীর মহিমসাহী, নসরতসাহী, নসিবসাহী, নলদী প্রভৃতি পরগণা পাইকপাড়ার রাজবংশের আদিপুরুষ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ক্রয় করিলেন। সাহ্-উজিয়াল প্রভৃতি পরগণা দিঘাপতিয়া রাজবংশের নিলামখরিদা জমিদারী স্বত্ব হইল। সাতৈর প্রভৃতি পরগণা অগ্রে রাণাঘাটের পালচৌধুরীগণ ক্রয় করিলেন ও পরে তাহা শ্রীরামপুরের গোস্বামী বাবুগণ ক্রয় করেন। নলদীর অন্তর্গত তরপ ধোঁয়াইল ঢাকার নবাব গণিমিঞার আদিপুরুষ ক্রয় করিলেন। তরপ দিঘালিয়া চাঁচড়া রাজা ক্রয় করিলেন। তেলিহাটি রোকনপুর প্রভৃতি পরগণা

নড়াইলের জমিদারবংশের আদিপুরুষ বাবু কালীশঙ্কর রায় নিলামে খরিদ করিলেন। খড়েরা পরগণা কলিকাতা মহানগরীর হাটখোলার দত্ত বাবুদিগের ও মকিমপুর পরগণা রাণী রাসমণির জমিদারীসত্ব হইল। অন্যান্য পরগণা আর আর জমিদারগণ ক্রয় করিলেন।

কালের কুটিল গতিতে লক্ষ্মীর চঞ্চলতা-দোষে, সীতারামের পরগণা-গুলির মধ্যে পদ্মার দক্ষিণ পারে কোন পরগণাই নাটোর-রাজবংশের জমিদারী থাকিল না। সীতারামপ্রদত্ত নিষ্কর স্বত্ব কেবল নাটোরের রাজগণ দেব-সেবাইত ভাবে দখল করিতে লাগিলেন এবং কোন মতে দেবসেবা চালাইতে লাগিলেন। দেবসেবার অনেক ত্রুটি ও বিশৃঙ্খলতা হইতে লাগিল। মহম্মদপুর নগরের শ্রী ও সৌন্দর্য্যের কোন হ্রাস হইল না। দীঘা-পতিয়া, পাইকপাড়া ও নড়াইলের জমিদারগণ মহম্মদপুরে সুন্দর সুন্দর কাছারি নির্ম্মাণ করিলেন। দীঘাপতিয়ার বিষ্ণুভক্ত রাজগণ আবার মহম্মদপুরে কৃষ্ণজী বিগ্রহ স্থাপন করিলেন। মহাসমারোহে তাঁহার পূজা অর্চ্চনা হইতে লাগিল। সাঁতৈর পরগণা ধোঁয়াইল তরপের কাছারী ও মহম্মদপুর নগরের মধ্যে বাউজানিতে ও ধোঁয়াইল গ্রামে সংস্থাপিত হইল।

সীতারামের স্বাধীন রাজ্যের পরিবর্ত্তে, একাদশ জন সেনানায়কের পরিবর্ত্তে এবং সীতারামের অশ্বারোহী, ঢালি ও বেলদার সৈন্যের পরিবর্ত্তে পরাধীন জমিদারগণের জমিদারী কাছারী জমিদার-নায়েব-গণের অত্যাচার এবং জমীদারী সৈন্য, পাক ও পেয়াদাগণের কুরুচি ও কুপ্রবৃত্তির পরিচয়ে মহম্মদপুর পূর্ণ হইল। জমিদারী পাক পিয়াদা ও সৈন্যগণ পরস্পর কলহ করিতে লাগিল। পরস্পর পরস্পরের মস্তক চূর্ণ করিতে লাগিল। যে স্থানে ৬০ বা ৭০ বৎসর পূর্ব্বে স্বাধীন রাজ্য

স্থাপনের আশা, একতার বীজ, শান্তির উচ্ছ্বাস, সৌভাগ্যের আনন্দময় কোলাহল বিরাজ করিত, সেই স্থানে এই সব দাঙ্গা হাঙ্গামা অত্যাচার উৎপীড়নে পরিপূর্ণ হইল। স্বাধীন রাজ্যস্থাপনের আশার স্থলে পরগণার সীমাহরণের দাঙ্গ,—মোগলবিরুদ্ধে স্বাধীন হিন্দুরাজ্যস্থাপনের আশা স্থলে এক জমিদারের কৃষকের ক্ষেত্র অপর জমিদারের কর্ম্মচারি-কর্ত্তৃক লুণ্ঠনের ষড়যন্ত্র, দস্যুতা-নিবারণ স্থলে দস্যুতাকরণ প্রভৃতি কার্য্যের অনুষ্ঠান চলিতে লাগিল।

এই সব বিবাদ বিসম্বাদ সন্দর্শন করিয়া প্রাচীন মুরলী বর্ত্তমান যশোহর জেলার মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর গভর্ণমেণ্টের নিকট ১৮১৫ সালের ১৬ই মার্চ্চ গবর্ণমেণ্টকে মুরলীর জেলা মহম্মদপুরে স্থানান্তরিত করিতে পত্র লিখিলেন। ১৮১৫ সালের এপ্রিল মাসেই মহম্মদপুরে পুলিস ষ্টেশন ও মুন্সেফি চৌকি বসিল। মহম্মদপুরে জেলা করিবার জল্পনা কল্পনা চলিতে লাগিল, পুলিশ ভয়ে দাঙ্গা হাঙ্গামা কমিল ও জমিদারী ফৌজের সংখ্যা হ্রাস হইল। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে (বাঙ্গালা ১০৩৯ সালে) কালীগঙ্গা নদী শুষ্ক হওয়ায় ও মহম্মদপুরের পশ্চিমে পার্শ্বস্থ বিলগুলির খাল বন্ধ হওয়ায় এবং মহম্মদপুরের জনসংখ্যা হ্রাস হওয়ায় বনজঙ্গল উৎপন্ন হওয়ায় মহম্মদপুরে ম্যালেরিয়া জ্বরের উদয় হইল। এই প্রাণ-নাশক বিষময় জ্বর মহম্মদপুরের ধ্বংসসাধন করিয়া নলডাঙ্গা অভিমুখে ধাবিত হইল। তথা হইতে ক্রমে সকল বঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। মহম্মদপুরে উৎপন্ন ম্যালেরিয়া জ্বর এখন বঙ্গের ভয়ানক ত্রাস হইয়া পড়িয়াছে। ম্যালেরিয়ার সহোদরা ভগিনী উলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহার বিনাশসাধনপূর্ব্বক জ্যেষ্ঠা সহোদরার অনুগমন করিয়া

ওলাউঠা ক্রমে সমস্ত বঙ্গে আধিপত্য বিস্তার করিলেন। সম্প্রতি আষাঢ় ও কার্ত্তিকে ম্যালেরিয়া এবং ভাদ্র, অগ্রহায়ণ ও চৈত্রে কলেরা এই দুই ভয়ঙ্করী রাক্ষসী বঙ্গের শত শত সন্তান উদরসাৎ করিতেছে। কত শত জনক জননীকে শোকসাগরে ভাসাইতেছে, কত সংসার শ্মশানে, কত গ্রাম ও নগর জঙ্গলে পরিণত করিয়া উঠাইতেছে। স্বাধীনতা-নিপীড়িত বঙ্গে ম্যালেরিয়া ও ওলাউঠার দর্পে প্রতি পরিবারের অনেক আশা লোপ হইতেছে ও বঙ্গের অনেক গৌরবরবি অকালে রাহুগ্রাসে নিপতিত হইতেছে। বাঙ্গালী ভীরু ও দুর্ব্বল নহেন, কিছু দিন ইংলণ্ডে ডেঙ্গু জ্বর ছিল, তাহাতেই ইংলণ্ডীয় লোকেরা বলেন যে, নেলসন্ প্রভৃতি বিখ্যাত বীরগণের দেহ দুর্ব্বল করিয়াছিল [৬৫]। ম্যালেরিয়া ও কলেরা বঙ্গে অৰ্দ্ধ-শতাব্দীর অধিক কাল বিরাজ করিতেছে। এমন বাঙ্গালী নাই, যিনি একবার না একবার উভয় রাক্ষসীর কোন না কোন রাক্ষসীর গ্রাসে পড়েন নাই। তাই আজ বাঙ্গালী দুর্ব্বল, ভীরু, উদ্যম ও উৎসাহহীন। এই জ্বরের প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নড়াইল জমিদারের মহম্মদপুরের কাছারী নড়াইলে উঠিয়া গেল, দীঘাপতিয়ার জমিদারীর সদর কাছারী মহম্মদপুর হইতে বুনাগাতিতে স্থানান্তরিত হইল। পাইকপাড়ার রাজবংশের সদরকাছারী স্থানান্তরিত হইয়া পরগণা নলদীর কাছারী লক্ষ্মীপাশায় ও মহিমসাহী নসিবসাহী প্রভৃতি পরগণার কাছারী বেলিয়াকান্দিতে সংস্থাপিত হইল। গণিমিঞার পূর্ব্বপুরুষ তরপ ধোঁয়াইল জাপুরের মৌলবী ঘরে কন্যা বিবাহ দিয়া তাঁহাকে উপহার দিলেন। সাঁতৈর ও ধোঁয়াইলের কাছারী মহম্মদপুরে থাকিল। দীঘাপতিয়ার কৃষ্ণজী বিগ্রহ বহু দিন মহম্মদপুরের

ভগ্নাবস্থা অবলোকন করিয়া ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে দীঘাপতিয়ায় চলিয়া গেলেন।

মহম্মদপুর শ্রীভ্রষ্ট ও তথাকার জমিদারী শক্তি হ্রাসের আবার এক নূতন কারণ আসিয়া উপস্থিত হইল। বর্দ্ধমান মহারাজের যত্নে পত্তনি সম্পত্তির কর আদায়ের জন্য অষ্টম আইন প্রচারিত হইল। নীলকর সাহেবগণ নিম্নবঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা নদীতীরস্থ পল্বলময় জমি নীলচাষের উপযুক্ত মনে করিলেন। তাঁহারা জমিদারীর আয় অগ্রাহ্য করিয়া নীলের আয় দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা ৫০০৲ টাকা হস্তবুদের গ্রাম ৬০০৲ টাকা হস্তবুদ ধরিয়া পত্তনি লইতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে সীতারামের বাবুখালি মদনধারি. নহাটা, চাউলিয়া, রামনগর, হাজরাপুর সাদালপুর, আমতৈল-নহাটা. বেলেকান্দি, ঘোড়াদহ, সিন্দুরিয়া, শ্রীখোল, মীরগঞ্জ প্রভৃতি নামধেয় গ্রামগুলিতে বহু নীল কনসানের কুটা প্রতিষ্ঠিত হইল। জমিদারীশক্তি হইতে নীলকরশক্তি প্রবলতর হইয়া উঠিল। জমিদারী সংক্রান্ত কথা ব্যবহারের পরিবর্ত্তে নীলচাষসংক্রান্ত কথা আয়েমী ও কাতেলি নীল, নীলচাষ, নীলদাদন, নীলবুনন, নীলসাজান, নীজগাজনি, নীলের হাউস নীলের বড়ী, নীলের গুদাম, নীলের ফরমা. নীলের কড়া, নীলের চাদর, নীলের দেওয়ান, নীলের খালাসী, নীলের সাহেব, নীল যাওয়ার রাস্তা ও নীল চলার খাল প্রভৃতি শব্দে নিম্নবঙ্গ পরিপূর্ণ হইল, জমিদারী শক্তি যেন লোপ হইয়া গেল, জমিদারগণ কুঠীয়ালগণের বৃত্তিভোগী হইয়া উঠিলেন।

এই সময়ে নড়াইলের জমিদারবংশে মধ্যাহ্ন-সূর্য্যসদৃশ বাবু রামরতন

রায় জমিদারী কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছিলেন। নীলকর-নিপীড়িত প্রজার দুঃখে তাঁহার হৃদয় কাঁদিল। তিনি তাঁহার যশোহর ও পাবনার দুই প্রধান মোক্তার কালিয়া-নিবাসী গিরিধর সেন ও আড়পাড়ানিবাসী জগৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মত লইলেন। বাটীর অমাত্য ব্রজকিশোর সরকার ও পিতামহ-বন্ধু নাটোরের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী করগুঁানিবাসী রাজচন্দ্র সরকারের (এঃ) পৌত্র মৃত্যুঞ্জয় প্রভৃতির সহিত পরামর্শ করিলেন। তিনি নীলকর-অত্যাচার নিবারণের জন্য অক্লান্তদেহে, সপরিশ্রমে ও মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিতে লাগিলেন।

নীলকরের অত্যাচার দেখিয়া সহৃদয় দীনবন্ধু বাবু নীলদর্পণ নাটক লিখিলেন। নীলদর্পণ লিখিত হইবার সময় ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে নীলকর সাহেবদিগের প্রতিকূলে যে অগ্নি জ্বলিল, তাহা ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের নীলশক্তি গ্রাস করিয়া নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। সেই শক্তিগ্রাসের শেষ রঙ্গভূমিও সীতারামের চিত্তবিনোদনের বিনোদপুর হইয়াছিল। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে মিলিটারী পুলিসে বিনোদপুর পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

মহম্মদপুর ধ্বংসের পর ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে মহম্মদপুরের মনসেফী চৌকী মাগুরায় স্থানান্তরিত হয় এবং কুটীয়াল সাহেবদিগের মামলা মোকদ্দমা বিচারের জন্য মাগুরায় একজন জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট দিয়া মাগুরা মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হইল। ক্রমে মাগুরা, ঝিনাইদহ, নড়াইল, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরাপুর এবং প্রথমে কুমারখালী ও পরে কুষ্টিয়া মহকুমা নীলকর সাহেবদিগের অত্যাচার নিবারণার্থ সংস্থাপিত হয়।

অনেক নীলকরদিগের পত্তনি সম্পত্তি আবার জমিদারগণের খাস হইয়াছে। অনেক গৃহস্থ পত্তনিদার হইয়া বসিয়াছেন। পাইকপাড়া-

রাজবংশের জমিদারী এ অঞ্চলে হ্রাসবৃদ্ধি হয় নাই। দীঘাপতিয়ার জমিদারী, পালন ও শাসন গুণে দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। মকিমপুরের রাণী রাসমণির জমিদারীর বিল ঝিল শুকাইয়া যাওয়ায় অধিকতর লাভজনক হইতেছে। খড়েরার আয়ও বৃদ্ধি হইতেছে। নসরৎসাহী পরগণা বহুখণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। বেলগাছি পরগণা নলডাঙ্গা-রাজবংশ ক্রয় করিয়াছিলেন। তাহারও কিয়দংশ এখন নড়াইলের জমিদারবংশের হস্তগত হইয়াছে। জাপুরের মৌলবীদিগের হস্ত হইতে তরপ ধোঁয়াইল বিখ্যাত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ওবেদউল্লা খাঁ বাহাদুরের হস্তগত হয়। উক্ত ডেপুটীর বংশধরগণ উক্ত তরপ বাবু যদুনাথ রায় বাহাদুরের নিকট বিক্রয় করিয়াছেন।

যদুবাবু ধোঁয়াইলের কাছারীর ও বাজারের উন্নতি করিবার চেষ্টা করিতেছেন। যদুবাবুর অধীন প্রজাইস্বত্বের রেকর্ড অব্ রাইট করা উপলক্ষে আমরা সীতারামের প্রদত্ত হিন্দু ও মুসলমানের অনেক নিষ্করের সনন্দ দেখিয়াছি, তাহার নকল বারান্তরে প্রকাশ করিব। সে সব দলিল কালেক্টরীতে দাখিল আছে। তাহার সত্যাসত্য বিচারসাপেক্ষ।

কালের কুটিল গতিতে ভাগ্যলক্ষ্মীর চঞ্চলতা-দোষে, সীতারামের ৪৪ পরগণায় এক্ষণে বহুলোকের গ্রাসাচ্ছদন চলিতেছে। মহম্মদপুরের দুইপ্রান্তে সাঁতৈর ও ধোঁয়াইলের কাছারীদ্বয় যেন দুই সৈনিকের হস্তধৃত দুইটী ক্ষীণালোক-লণ্ঠনের ন্যায় রহিয়াছে। সীতারামের রাজ্যা-বসানরূপ করুণার ঘোর সমরের পর সার জন্ মুরের সমাধির আয়োজনের ন্যায় তাহারা যেন সীতারামের কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ সমাধিস্থ করিবার

আয়োজন করিতেছেন। মহম্মদপুরের বর্ত্তমান পুলিস ষ্টেসন, রেজেষ্টারি আফিস ও ডাকঘর যেন সেই সমাধিকার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করিতেছে। বিষণ্ণতা, নিস্তব্ধতা ও নৈরাশ্য যেন মহম্মদপুরের জঙ্গলে বাস করিতেছে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

মহম্মদপুরের বর্ত্তমান অবস্থা ও সীতারামের চরিত্র

আর সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই। স্বাধীনতার রঙ্গভূমি, বীরগণের আবাস, ব্যবসায়ের হাট, গুণী, জ্ঞানী ও শিল্পীর নিকেতন আজ শ্বাপদপরিপূর্ণ অরণ্যে পরিণত। সীতারামের দুর্গ আজ বেতসাদি কণ্টকীলতায় ও বন্য হিজল, কদম্ব, অশ্বত্থ, বট প্রভৃতি তরুরাজিতে সমাচ্ছন্ন। সম্প্রতি মধ্যাহ্নে সৌরকরের সহস্র রশ্মির এক রশ্মিও তথায় প্রবেশ করিতে পারে না! মধ্যাহ্নকালে তথায় শৃগাল, বরাহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি জন্তুগণ নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে। চর্ম্মচটিকাপুঞ্জ ভগ্ন অট্টালিকার প্রতিকক্ষে দিবাবিভাবরী পক্ষ ব্যজন করিতেছে। সীতারামের অট্টালিকাসমূহের ইষ্টকরাশি স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে। সীতারামের দুর্গের ও গড়ের মধ্যে দক্ষিণের গড় শৈবালে (পানায়) অঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া লজ্জায় জঙ্গলে মুখ লুকাইয়া আছে। অন্য তিন গড় অগৌরবে জীবন রক্ষা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়স্কর মনে করিয়া পদাঙ্কমাত্র রাখিয়া ভূগর্ভে লীন হইয়াছে। লক্ষ্মীনারায়ণ, দশভুজা, রামচন্দ্র ও কানাই নগরের কৃষ্ণবলরামের পূজায় শঙ্খঘণ্টার বাদ্যচ্ছলে দেবদেবীগণ যেন মধ্যে মধ্যে বঙ্গগৌরব সীতারামের দুর্বিসহ শোকে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। দেবসেবায় দেবগণ যেন সীতারামের শোকে হবিষ্যান্ন আহার

করিতেছেন। সামান্য অতিথিসেবায় যেন কোনমতে সীতারামের দৈনিক তর্পণাঞ্জলি দান করা হইতেছে। একটী ডাকঘর, রেজেষ্টরী আফিস ও পুলিশ ষ্টেসন যেন মহম্মদপুরে সীতারামের শ্মশানে মৃতের শেষ চিহ্ন মৃণ্ময় কলসী, রজ্জু ও ভগ্ন খট্টা সদৃশ পড়িয়া রহিয়াছে। অদ্য শ্রীসমৃদ্ধিসম্পন্ন মহানগরী কতিপয় জঙ্গলাবৃত, শ্রীহীন ম্যালেরিয়া-নিপীড়িত দরিদ্র অধিবাসিগণ কর্ত্তৃক অধ্যুষিত পল্লীতে পরিণত হইয়াছে। অদ্য মহম্মদপুরের লোকে জানে না যে, মহম্মদপুর একদিন শিক্ষা, শিল্প ও বাণিজ্যের রঙ্গালয় ছিল,—দেশী, বিদেশী, জ্ঞানী ও গুণী লোকের গমনাগমনের কোলাহলে পূর্ণ ছিল।

কাল! তোমার কি মহতী শক্তি, তোমার কি বিশাল উদর, তোমার কি বিকট দশন, তোমার কি ভীষণ জঠরানল! তুমি রাজ্যের পর রাজ্য গ্রাস করিতেছ, নগরের পর নগর উদরসাৎ করিতেছ, নগর শ্মশান করিতেছ, জন-কোলাহল বায়ুর মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদে পরিণত করিতেছ, তোমার যে গ্রাসে কুরুরাজ্য গিয়াছে, তোমার যে দশনে যদুবংশীয়গণের চর্ব্বণলালসা তৃপ্ত করিয়াছে, তোমার যে আস্যে পারস্য, গ্রীস, মিশর, কার্থেজ, প্রাচীন রোমক সাম্রাজ্য নিপতিত হইয়াছে, তোমার সেই মুখেই সীতারাম ও তাঁহার নগরী লুপ্তপ্রায়! ধ্বংসসাধন তোমার নিত্য কর্ম, কিন্তু সামান্য নগরের সুদিনের স্মৃতি বড় মর্ম্মপীড়াপ্রদ। তোমার কার্য্য তুমি অবারিত গতিতে সম্পন্ন করিতেছ, কিন্তু আমরা মানব—ক্ষুদ্র মানব—আমাদের কর্ত্তব্যের কিছুই করিতে পারি না।

সীতারাম নাই, কিন্তু সীতারামের বীরত্ব, মহত্ত্ব, ধার্ম্মিকতা, স্বদেশপ্রেমিকতা, আত্মোৎসর্গশীলতা লোকপরম্পরাগত কিম্বদন্তীতে ও তাঁহার

কীর্ত্তিগুলিতে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। কালসহকারে কিম্বদন্তী বক্তাদিগের রুচিভেদে সীতারামকে সদসৎ অনেক গুণের আধার করিয়া উঠাইয়াছে। কালমাহাত্ম্যে সীতারামের নিষ্কলঙ্ক উজ্জ্বল চরিত্রে যে সকল কলঙ্করেখা পড়িয়াছে, তাহা অনায়াসে বিদূরিত করিতে পারা যায়। সীতারাম যশোহরাধিপতি প্রতাপাদিত্যের ন্যায় পিতৃব্যহন্তা ও জামাতা রামচন্দ্রের নিধন-প্রয়াসী নৃশংস বলিয়া কখনও নিন্দিত হন নাই। তিনি মুকুট-রায়ের ন্যায় একদেশদর্শী, মুসলমান-বিদ্বেষী বলিয়াও ঘৃণিত হন নাই। মুকুটরায় যখন গোহত্যাকারী মুসলমানগণের নিধন সাধন করিয়া নিজের পতনের পথ পরিষ্কার করিয়াছেন, সীতারাম তখন পাঠান মুসলমানগণকে গোহত্যা প্রভৃতি হিন্দুর বিরক্তির কার্য্য হইতে কৌশলে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া হিন্দু-মুসলমানকে একতাসূত্রে বন্ধনপূর্ব্বক তাঁহার রাজ্যে এক প্রবল শক্তির সঞ্চয় করিয়াছেন। বঙ্গের ভূস্বামিগণের সহিত তুলনা করিতে হইলে সীতারামকে বিক্রমপুরের কেদার রায়ের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। কেদার ও সীতারাম উভয়েই ধার্ম্মিক, প্রজা-বৎসল, ধর্ম্মবিদ্বেষশূন্য, কীর্ত্তিমান্ ও বীরত্বসম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু কেদার ও তৎপিতা চাঁদরায়ের অসতর্কতা দোষ লক্ষিত হয়। চাঁদ ও কেদারের অসতর্কতা দোষে সোণামণি বা স্বর্ণময়ী মুসলমান জমিদার ইশাখাঁর প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী হন এবং তাঁহার মুসলমান অঙ্কলক্ষ্মী হওয়া উপলক্ষে চাঁদের অনশনে মৃত্যু ও কেদাররায়ের বলক্ষয় হয়।

সীতারাম বঙ্গের শিবাজী বা প্রতাপসিংহ। যদি বঙ্গদেশ মহারাষ্ট্র দেশের ন্যায় পর্ব্বতসঙ্কুল হইত, যদি বঙ্গের অধিবাসী মহারাষ্ট্র ক্ষত্রিয়ের ন্যায় ক্ষত্রিয় হইত, বঙ্গদেশ যদি মহারাষ্ট্র দেশের ন্যায় জমিদারী

শক্তিতে স্বার্থপর ক্ষুদ্র শক্তিময় না হইত, সীতারাম যদি শিবাজীর ন্যায় পৈতৃক দুর্গ ও পৈতৃক ধন পাইতেন ও বঙ্গদেশ যদি মহারাষ্ট্রদেশের ন্যায় মুসলমান সম্রাট্‌শক্তি হইতে দূরে অবস্থিত হইত, কে জানে সীতারাম শত সায়েস্তা খাঁকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারিতেন কি না, সীতারামের রাজ্য হইতে পাঁচটি ক্ষমতাশালী রাজ্য হইত কি না, সীতারামের প্রতিষ্ঠিত রাজ্য ধ্বংস করিতে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকেও লর্ড লেক্, আর্থার ওয়েলিস্‌লি প্রভৃতির ন্যায় সেনাপতিকে সমরাঙ্গনে প্রেরণ করিতে হইত কি না, আমরা কি প্রকারে বলিব ?

যে পুণ্যশ্লোক মহাত্মা, আবার বলি—আপন জীবন তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া নিঃস্বার্থপরতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া বঙ্গের নিরীহ প্রকৃতিপুঞ্জের দুর্দ্দশা অবোলোকন করিয়া দীর্ঘকাল জলে, স্থলে ও অরণ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে বাস করিয়া বঙ্গের ত্রাস, বঙ্গের কলঙ্ক দ্বাদশ দস্যুকে দলন করিয়াছেন, যে পুণ্যাত্মা, উদারচেতা সীতারাম হিন্দু-মুসলমানের বৈরতা দূরীকরণ করিয়া শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব-মিমাংসা করিয়া হরিহর, রাধাদুর্গা এক দেখাইয়া পাঠানক্ষত্রিয়, চণ্ডালব্রাহ্মণ লইয়া যুদ্ধক্ষম, নির্ভীক সৈন্যদল গঠন করিয়াছিলেন, যিনি আরাকাণী, আসামী ও পর্ত্তুগীজগণের নিম্নবঙ্গ গ্রাসের লোলরসনা অনায়াসে ছেদন করিয়াছিলেন, যিনি লুপ্তপ্রায় হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্ধার মানসে, ধর্ম্মভক্তি হৃদয়ে জাগরূক রাখিবার উদ্দেশ্যে অসংখ্য দেবালয় ও দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, যিনি অসংখ্য পুষ্করিণী-খনন, রাস্তা নির্ম্মাণ, বাজার বন্দর সংস্থাপন করিয়া বঙ্গবাসীর অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, যিনি নিম্নবঙ্গের বনজঙ্গল পরিষ্কার করিয়া নানাদেশ হইতে নানা সম্প্রদায়ের লোক আনয়নপূর্ব্বক দেশের

শিক্ষা, কৃষি ও শিল্পের প্রভূত উন্নতিসাধন করিয়াছেন, যিনি সর্ব্বোপরি মুসলমান- অত্যাচার হইতে নিম্নবঙ্গবাসিগণকে রক্ষার নিমিত্ত ধীর, স্থির-ভাবে সতর্কতার সহিত পার্শ্ববর্ত্তী জমিদারগণের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া নিঃস্বার্থভাবে বঙ্গমাতার উদ্ধারের নিমিত্ত এক স্বাধীন হিন্দুরাজ্য-স্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছেন, যাঁহার সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, উদার ও আদরণীয় ছিল, হে বঙ্গবাসিগণ! হে শিক্ষিত বঙ্গসমাজ! সেই সীতা-রামের প্রতি কি আমাদের কোন কর্ত্তব্য নাই?

প্রতিবৎসর কোটী কোটী হিন্দু কুরুক্ষেত্রে ও প্রভাসে গমনপূর্ব্বক শ্রাদ্ধতর্পণে পিতৃপুরুষ পাণ্ডু, কুরু, ও যদুবংশের তৃপ্তিসাধন করিতেছেন। সকল হিন্দু রাম, লক্ষ্মণ ও ভীষ্ম তর্পণ করিয়া জিতেন্দ্রিয় বীরগণের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছেন। শ্রাদ্ধকালে কুরুক্ষেত্রে, গয়া, গঙ্গা, প্রভাস, পুষ্কর প্রভৃতি তীর্থের সান্নিধ্য কল্পনা করিতেছেন। শ্রাদ্ধকালে "দুর্য্যোধন মন্যুময়ো" ইত্যাদি শ্লোক পাঠ করিয়া বলিতেছেন, মন্যুময় দুর্য্যোধন মহাদ্রুমের কর্ণ স্কন্ধ, শকুনি শাখা, দুঃশাসনাদি ভ্রাতৃগণ পুষ্প ও ফল এবং মনীষী ধৃতরাষ্ট্র তাহার মূল সমৃদ্ধি, অন্যদিকে ধর্ম্মময় যুধিষ্ঠির মহাতরুর স্কন্ধ অর্জ্জুন; শাখা ভীম, নকুল ও সহদেব ফল-পুষ্প এবং মূলসমৃদ্ধি পরব্রহ্ম কৃষ্ণ ও ব্রাহ্মণ; এই শ্লোকে আমরা পুণ্যাত্মা ও পাপাত্মাদিগের সদসৎ কীর্ত্তি স্মৃতিপথে জাগরূক রাখা কর্ত্তব্যের অঙ্গে পরিণত করিয়াছি। অনন্তর আমরা শ্রাদ্ধমন্ত্রের রুচির শ্লোকে শ্রাদ্ধ-মন্ত্রের মহিমা ঘোষণা করিতেছি। আমাদের শ্রাদ্ধে পিতৃপুরুষের সুখ, দুঃখ, তৃপ্তি কিছু হউক বা না হউক, আমাদের কৃতকর্ম্মের ফল আমরাই ভোগ করি। মহতের জীবনী, মহতের কীর্ত্তি, বীরের স্মৃতি

জয়ঢক্কা, তুরি, ভেরি আর কালীনদী প্রতিধ্বনিত করিয়া নিনাদিত হইবে না। আর কৃষ্ণবল্লভ, রত্নেশ্বর, গুরু ভট্টাচার্য্য পুরোহিত, অমাত্য সভাসদে বেষ্টিত হইয়া নক্ষত্রে পরিশোভিত শশাঙ্কের ন্যায় সীতারাম সিংহাসনে বসিবেন না। বাল্মীকি, রামায়ণে রামলক্ষ্মণের গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন, ব্যাস মহাভারতের কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ বর্ণন করিয়াছেন, তাই রামেশ্বরে ও কুরুক্ষেত্রে তিন্দুর গমন ঘটিতেছে এবং রামলক্ষ্মণ ও ভীষ্ম তর্পণ অনুষ্ঠিত হইতেছে।

এস ভাই! এস আর বিলম্বে কাজ নাই—আমরা দীর্ঘ নিদ্রায় নিদ্রিত আছি সত্য, কিন্তু এখনও শ্রাদ্ধ করা তীর্থ করা ভুলি নাই। আজ মহাতীর্থ মহম্মদপুরে গমন করিয়া সীতারাম, মেনাহাতী প্রভৃতির তর্পণাঞ্জলি দান করি। বঙ্গের শেষ বীর, বঙ্গের শেষ আশা, অশেষ-কীর্ত্তি, গুণাকর সীতারাম ও তাঁহার সহচরগণের কীর্ত্তি স্মরণ করিয়া আমাদের সাহস, উদ্যম ও শক্তিহীন দেহে বলের সঞ্চার করি। দশ জনে একমত হইয়া একতাবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিতে শিক্ষা করি। কেমন করিয়া স্বজাতির জন্য পরিশ্রম করিতে হয়, কেমন করিয়া শিক্ষা, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি করিতে হয়, কেমন করিয়া দেশ বিদেশ হইতে গুণী, জ্ঞানী আনয়ন করিয়া আশ্রিত, পালিত ও অধীনস্থ রাখিয়া কার্য্য করিতে হয়, কেমন করিয়া বিল ঝিল, বনজঙ্গল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও বাসোপযোগী করিয়া সুন্দর উদ্যান ও শস্যক্ষেত্রে পরিণত করিতে হয়, ইত্যাদি লোকহিতকর, দেশহিতকর, সমাজহিতকর কার্য্য-প্রণালী শিক্ষা করি।

এস ভ্রাতৃগণ! এস, এস, বন্ধুগণ! এস, আর কতকাল অজ্ঞতা,

অনুদারতা ও অলসতার গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত থাকিব? এস, একবার কল্পনাবিমানে আরোহণপূর্ব্বক দ্বিশতবর্ষরূপ দ্বিশত মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আমরা সুবর্ণতন্তিদ্বারা রক্তবর্ণ কিংশুক বস্ত্রে লক্ষ্মীনারায়ণ ও দশভুজা-অঙ্কিত পতাকাশোভিত, সুধাধবলিত সিংহদ্বারে মেনাহাতীকে দক্ষিণপার্শ্বে রাখিয়া সীতারামের নূতন রাজপ্রাসাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করি। ভীষ্মের ন্যায় ব্রহ্মচর্য্যব্রতাবলম্বী বিশ্বপ্রেমিক, স্বদেশপ্রেমিক, স্বার্থত্যাগী মেনাহাতীকে তাঁহার আত্মোৎসর্গ, প্রভুভক্তি ও স্বদেশ-হিতকামনার জন্য সর্ব্বাগ্রে অভিবাদন করি। ঐ যে সম্মুখে পাঠান-বীরচূড়ামণি বক্তার, আমিনবেগ, করিম খাঁ, ক্ষত্রিয়বীর ছকুরায়, চণ্ডালবীর রূপচাঁদ, কায়স্থবীর বেলদার সেনার নায়ক মদনমোহন প্রভৃতি উৎফুল্লমুখে শিষ্টভাবে রাজপ্রাসাদের গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া বিচরণ করিতেছেন, উহাঁদের সহিত করমর্দ্দন করিয়া উহাঁদিগকে সাদরে আলিঙ্গনপূর্ব্বক আমাদিগের জীর্ণ, শীর্ণ, ভগ্ন দেহ পবিত্র করি। ঐ যে উজ্জ্বল সিংহাসনে রত্নখচিত স্বর্ণমুকুট শিরে ধারণপূর্ব্বক অসিতকায়, উজ্জ্বলনয়ন, বৃহৎমস্তক, নাতিদীর্ঘ, নাতিক্ষুদ্র, দৃঢ়বপু, বিশালাক্ষ, গাম্ভীর্য্যময় রাজা সীতারাম আসীন রহিয়াছেন, তাঁহাকে যথাবিধানে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করি। ৪৬ ঐ যে সীতারামের দক্ষিণপার্শ্বে অপর মহার্ঘ আসনে কৃষ্ণবল্লভ ও রত্নেশ্বর, শিখাধারী শুক্রবস্ত্রপরিহিত দ্বিজগণ ও যদুনাথ, ভবানীপ্রসাদ প্রভৃতি ধর্ম্মকুশল বুদ্ধিমান্ অমাত্যগণ উপবিষ্ট আছেন, তাঁহাদিগের পদরজোগ্রহণে দেহ-মন পবিত্র করি। ঐ যে সীতারামের বামপার্শ্বে বলরাম, রামনারায়ণ, গদাধর, বিশ্বনাথ প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারিগণ স্ব-স্ব কার্য্যে একমনে নিবিষ্ট রহিয়াছেন,

তাহাদিগের সহিত প্রীতি-সম্ভাষণ করিয়া হৃদয়মন আবেগশূন্য করি। এস, ধূপ, গুল্‌গুল্‌, চন্দনচর্চ্চিত সুগন্ধ পুষ্প সৌরভে আমোদিত নানা উপচারে পরিসেবিত, বেদপারগ ব্রাহ্মণ-মুখোচ্চারিত সুললিত মন্ত্রোচ্চারণ ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত সীতারামের প্রতিষ্ঠিত শক্তিশিব, রাধাকৃষ্ণের গৃহে বিচরণ করিয়া হৃদয়মন ধন্যভাবে পূর্ণ করি। সীতারামের জলকীর্ত্তি, সীতারামের হর্ম্ম্যালয়, সীতারামের দেবালয়, সীতারামের চতুষ্পাঠী ও সীতারামের মক্তাব্‌ সকল অবলোকন করিয়া সবিস্ময়ে বলি ধন্য রাজা সীতারাম রায়! ধন্য হিন্দু-মুসলমানের একতার সুখময় ফল!

এস, সীতারামের কর্ম্মকারপল্লীতে প্রবেশ করিয়া কর্ম্মকারগণের হস্তবিক্ষিপ্ত লৌহমুদ্গরাঘাতে বহ্নিমান উজ্জ্বল লৌহরাশি হইতে বিচ্যুত অগ্নিকণা সকল অবলোকন করি। বাঙ্গালী শিল্পীর প্রস্তুত কামান, বন্দুক, অসি, খড্গ, ছুরিকা, বল্লম প্রভৃতি দর্শন করিয়া বলি—আমাদের দেশেও আগ্নেয় অস্ত্র, আগ্নেয় যন্ত্র, শস্ত্রাস্ত্র ও শস্ত্রপ্রহরণ প্রস্তুত হইতে পারিত। এস! সীতারামের বারুদখানা ও গুলিখানা সবিস্ময়ে দর্শন করি। সীতারামের রাজ্যের স্বর্ণরৌপ্যালঙ্কার, কাংস্যপিত্তলাদির বাসন, বিবিধ বসন, কাগজ, দারুময় দ্রব্য, বংশনির্ম্মিত দ্রব্য, তন্তুনির্ম্মিত দ্রব্য, কৃষিজাত দ্রব্য সকল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সাহসে, উৎসাহে ও হর্ষে বলি—বাঙ্গালী শিখিলে সকলই করিতে পারে। সানুচর সীতারামের দস্যুদলন, রাজ্যবিস্তার, মোগল প্রতিকূলে অভ্যুত্থান দেখিয়া আহ্লাদে সবিস্ময়ে হৃদয়ঙ্গম করি—উচ্চ নীচ হিন্দু ও হিন্দু-মুসলমানের দৃঢ় একতায় কি সুখকর সুধাময় ফল ফলিতে পারে! পক্ষান্তরে সীতারামের বিদ্বেষী,

জন্মভূমির কুপুত্র, স্বার্থপর, বিশ্বাসঘাতক, রাজ্যচ্যুত, বিতাড়িত জমিদার ও বিশ্বাসঘাতক মুনিরামের কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা ঘৃণায় ও লজ্জায় ম্রিয়মান হইয়া বিশ্বাসঘাতকতা, ক্ষুদ্রাশয়তা ও স্বার্থপরতা হইতে বহু দূরে দণ্ডায়মান থাকি এবং এই সব হীনবৃত্তির বিষময় ফল ধীরচিত্তে চিন্তা করি। আবার সীতারামের পরিণাম সন্দর্শন করিয়া আমরা বুঝিয়া লই, আমাদিগের যথেষ্ট শক্তি সঞ্চার না হওয়া পর্য্যন্ত অপমান ও হতাদরজনিত ক্রোধকে বশীভূত রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। ক্রোধ-রিপুর প্রশ্রয় দিতে নাই। বন্ধুর বিশ্বস্ততা, সুহৃদের মিত্রতা দীর্ঘকালে পরীক্ষিত হয়। সুবর্ণের বিশুদ্ধিতা অনল সংযোগে পরীক্ষিত হয়, বিষের বিশুদ্ধিতা রক্তসংযোগে পরীক্ষিত হয়, কিন্তু মনুষ্যের সাধুচরিত্র সহস্র কঠোর পরীক্ষায় পরীক্ষিত হয় না।

এস! বন্ধুগণ! এস! কল্পনাবিমান ছাড়িয়া সীতারামের ভগ্নদুর্গের স্তূপীকৃত কণ্টকগুল্মাবৃত ইষ্টকস্তূপের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া চতুর্দ্দিকের বিষণ্ণ, মলিন, হীন অবস্থা দেখিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বীর সীতারামের তৃপ্ত্যর্থে প্রতি বর্ষে একবার ঘোড়দৌড়, লাঠিখেলা, কুস্তি, ব্যায়াম প্রভৃতি দৈহিক বলপ্রদ কার্য্যের অনুষ্ঠান করি। সীতারাম দেবভক্ত ছিলেন, সীতারামের প্রীত্যর্থে বর্ষে একবার তাঁহার দশভূজার আড়ম্বরের সহিত পূজা করি। সীতারাম নগরের নাম মহম্মদপুর রাখিয়াছিলেন। তাঁহার সন্তোষার্থে মুসলমানগণের সহিত মিলিয়া মুসলমানী প্রথায় পীর মহম্মদের নামে ভগবানের অর্চ্চনা করি। মহম্মদপুর সীতারামের প্রিয় রাজভবন ছিল এবং সীতারাম জনসমাগম ভাল বাসিতেন। এস! আমরা তাঁহার সন্তোষার্থে সমবেত হই।

জনসমবেত-জনিত মেলা বহু শুভফলপ্রদ। এই মেলার উপকারিতা প্রাচীন গ্রীসের পণ্ডিত, পুরোহিত ও বীরগণ হৃদয়ঙ্গম করিয়া অলিম্পিয়ান, ইস্থিমিয়ম, নিমিয়ম্ প্রভৃতি ক্রীড়া উপলক্ষে মহতী মেলার অনুষ্ঠান করিতেন। মেলা উচ্চনীচ সম্প্রদায় সকললোকের মিলনের শুভক্ষেত্র। পরস্পরের মনোভব প্রসারিত হইবার উত্তম স্থল। পরস্পরের ইচ্ছা উদ্দেশ্য পরস্পরকে হৃদয়ঙ্গম করাইবার সুন্দর সুযোগ। পরস্পরের শিক্ষা অভিজ্ঞতায় পরস্পরকে অংশভাগী করার সুন্দর উপায়। পরস্পরের একতাসূত্রে আবদ্ধ হইবার উত্তম সঙ্কল্প। দেশী ও বিদেশী শিক্ষা, শিল্প, কৃষিজাত দ্রব্য দেখিবার ও প্রস্তুত করিবার সুন্দর শিক্ষার স্থল। ভগ্নমন, ভগ্নহৃদয় আশাশূন্য ও উদ্যমশূন্য জীবনে অভীষ্টপূরণ ও সজীবতা আনয়নের উত্তম অবসর। সীতারামের স্মৃত্যর্থে আমরাও একদিনের জন্য ভগ্নমনে, ভগ্নহৃদয়ে, নিরুদ্যম জীবনে একটু সজীবতা লাভ করি। সীতারাম কৃষিশিল্পবাণিজ্যের উন্নতি করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার আনন্দবর্দ্ধনার্থে বৎসরে একবার কৃষিশিল্পমেলা সংস্থাপন করি। পুণ্যশ্লোক সীতারামের কীর্ত্তি সমালোচনার জন্য আমরা সীতারামের কথকতা ও সীতারামের যাত্রা শ্রবণ করি ও সীতারাম নাটক অভিনয় করি। আমরা এই টুকু করিতে পারিলে এই মহম্মদপুর মহাতীর্থে এই হিন্দুজাতির শেষ বীরস্বর্য্য অস্তগমনের অস্তাচলে, এই জাতীয় স্বাধীনতার শেষ দীপনির্ব্বাণের প্রাঙ্গণে বঙ্গের শেষ আশা-ভরসা সমাধিস্থ হইবার শ্মশানে আমাদিগের যথাসাধ্য তর্পণ করা হইবে। এস! সীতারামের ভগ্নদুর্গে হর্ম্ম্যমালার ভগ্নাবশেষের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া সমবেত হিন্দু মুসলমান সমস্বর উচ্চরবে বলি---

"জয় হিন্দু-সূর্য্য সীতারামের জয়!" "জয় স্বার্থত্যাগী স্বদেশহিতব্রত ব্রহ্মচারী মেনাহাতীর জয়!" "জয় পাঠান-বীরচূড়ামণি বক্তারপ্রমুখ উদারচরিত পাঠান বীরগণের জয়!" "জয় চণ্ডালবীর রূপচাঁদের জয়!" "জয় সীতারাম-প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মীনারায়ণজিকী জয়!" "জয় সীতারামপ্রতিষ্ঠিত দশভূজা মাইকী জয়!" "জয় একতার জয়!"

প্রথম পরিশিষ্ট

সীতারাম সম্বন্ধে অন্যান্য গ্রন্থকারের মত, উদ্ধৃত বিষয় সকল, সনন্দ ইত্যাদি

হিমালয়ের দক্ষিণে নেপালের পাদদেশে যুদ্ধস্থান। "পরদিন প্রাতে তৈমুর জালালউদ্দীনকে আক্রমণ করিবেন স্থির করিলেন। কিন্তু মামুদ তোগলক তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। তিনি বলিলেন, এখনও তৈমুরের সমস্ত তাতারসৈন্য আসিয়া পঁহুছায় নাই........ তৈমুর বাদসাহের (মহম্মদের) কথায় হাসিলেন। বিপদের নামে তাহার তাতর-শোণিত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল.........প্রাতে যুদ্ধ আরম্ভ হইল, চৈৎমল্লের (জেলান বা বঙ্গের) হিন্দু ও মুসলমান সৈন্যগণ মরিয়া হইয়া মৃত্যু আকাঙ্ক্ষায় তৈমুরের তাতরসৈন্যের সম্মুখীন হইল।.........সে ভীষণ দৃশ্য বর্ণনাতীত। দুই প্রহর ধরিয়া যেন পিশাচে পিশাচে, মহা প্রলয়কালে, পরস্পরের বিনাশে প্রবৃত্ত।.........এই তৈমুরের জয়, এই চৈৎমল্লের জয়।.........ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় উভয়ে উভয়ের উপর পড়িলেন, চৈৎমল্ল ডাকিয়া বলিলেন, আজ তোমার ও আমার শেষদিন। উভয়ে তরবারির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইলেন, তাঁহাদের রক্ষার জন্য উভয়দলের সহস্র সহস্র যোদ্ধা সেই দিকে ঝুঁকিল।.........অবশেষে উভয়ে বর্শার আঘাতে অচৈতন্য হইয়া অশ্ব হইতে ভূমে পড়িয়া গেলেন।

বাবু শ্রীশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত "বঙ্গেশ্বর" ২২ পরিচ্ছেদ ৯০ পৃঃ।

(২) কুতুবুদ্দীন্ মহারাজ নামক নমঃশূদ্র ও রাণী নামক ব্রাহ্মণীর গর্ভজ পুত্র। "কুমার (কুতব) যুদ্ধ করিতে করিতে বন্দী হইয়াছিল। সকল বন্দীই যবনপতির নিকট বিক্রীত হইল। কুমার সেই সঙ্গে যবনপতির নিকট বিক্রীত হইলেন।..................দস্যুপতি প্রায় একহাজার দাস পাইয়াছেন। তিনি তাহাদিগকে মিবারঘাটে অনেক মূল্যে বিক্রয় করিতে পারিবেন বলিয়া জাহাজ ছাড়িয়া দিলেন।"

বাবু শ্রীশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত "রামপাল" ৯ম ও ১১শ পরিচ্ছেদ।

(৩) "He (Mansingha) then determined upon taking charge of both the governments of Behar and Bengal, and fixed upon the city of Agmahel, the name of which he changed to Rajmahel (Places of sovereignty) as the capital of the three provinces. This place, in ancient times, under the Hindoo government, was called Rajgriha."

Stewart, Bengal.
Bangabasi Edition, pages 209 210.

(৪) "The first act of Islam Khan's authority was the removal of the seat of government from Rajmahel to the city of Dacca, the name of which in compliment to the reigning emperor, he changed Jahangirnagar." S. B. Page 233.

(৫) "The First act of the Nawab, on his return to Bengal was to change the name of the city of Mukhsoosabad to Moorshidabad." S. B. page, 418.

(৬) "He also ordered the whole of the lands to be re-measured.........When he had thus entirely dispossessed the zemindars of all interference in the collection, he assigned to them an allowance, either in land or money. for the subsistence of their familes, called *nankar*; to which was added the privilege of hunting, of cutting wood in the forests, and of fishing in the lakes and rivers: these immunities are called *bunkar julkar*........."

S. B. page 420.

(৭) "But Durpanarayan (Kanango under Mursid kuli khan) having thorough knowledge of the business and being well acquainted with every particular regarding the revenue of Bengal.........He increased the revenue from one crore and thirty lacks, 1,300,000*l*.) to one crore and fifty lacks of Rs. (1,500,000*l*)."

S. B. page 423

(৮) ১২৮৯ সালের বান্ধব ৭ম সংখ্যায় কোন সুযোগ্য লেখক পাত্সা-নামা হইতে লিখিয়াছেন যে, ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দে সাজাহান বাদশাহের রাজত্বকালে বাঙ্গালার ভূষণস্বরূপ ভূষণার অধিপতি (শত্রুজিৎ) নবাব-প্রেরিত সৈন্যের নিকট পরাস্ত ও বন্দীকৃত হন।

(৯)......Many of these (the portuguese) had entered into the service of the native Princes; and from their knowledge of maritime affairs, and by their desperate bravery had reason to considerable commands, and had obtained extensive grants of land both on the continent and in the adjacent islands."

S. B. page 233.

(১০) ১২৭৪ সালে যশোহর জেলার অন্তঃপাতী মাগুরা-মহকুমা হইতে ৭৪ মাইল উত্তরে আমতৈল গ্রামে মৃত্তিকাখননকালে প্রথমে কতকগুলি ইষ্টক ও পরে একখানি ভগ্নপ্রস্তর উঠে। ভগ্নপ্রস্তরে যে শ্লোকাংশ লিখিত ছিল, তাহার মর্ম্ম এই—"১৪৮১ শকে বন-পরিষ্কারান্তে এই কালী"। এই প্রস্তরখানা গৃহদাহে নষ্ট হইয়াছে। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে যশোহর নড়াইলের কালিয়াগ্রামে ভূতপূর্ব্ব হাইকোর্টের উকিল বাবু বংশীধর সেন মহাশয়ের ও বর্ত্তমানে সটীক খাজনার আইনের সঙ্কলয়িতা হাইকোর্টের উকিল বাবু সুরেন্দ্রচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাটীতে পুষ্করিণী-খননকালে সুন্দরবৃক্ষের মূল সহ কাণ্ডাবশেষ ৮ হাত মাটীর নিম্নে বাহির হয়।

(১১) "The tradition about this river is to the effect that before the year 1203 B. S. the Gorai was a khal 10 cubits in breadth." Ramsankar Sen's Report on Jessore, Appendix E. page XLVIII.

(১২, ১৩) Vide the report on the district of Jessore by J. Westland, chap. VIII and the Report on the district of Jessor by Ramsankar Sen's Appendix A. page VI and F.

(১৪) Vide J. Westland, Report on the district of Jessore chapter IX.

(১৫) Magh Jaigir: The name of small Paragana near the Goria included formerly in Trangal, but seperated at the time of the decennial settlment. The Jaigir was originally granted to a Magh Raja named Dharmadas of Mulkakhong (Arracan) who was found in rebellion and brought a captive in

the reign of Arangajib and converted him to Islamaism and gave him the name of Nijamshaha bari (of this Jaigir) and to other Mouzas lie on other side of Gorai." Babu Ramsankar Sen's Report, Appendix F. page LII.

(১৬) যশোহর কালেক্টরীর ১২০৯ সালের ১৯০৬ নং তায়দাদ দৃষ্টে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, সংগ্রাম সাহ নলদীপরগণার ভাট্‌দহ গ্রামে ১০৭১ সালে ১৯ শে আকরণ (১৬২৬ খৃঃ) রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কারকে জমি দান করেন। ১৯১১ নং তায়তাদে ১০৩৯ সালের পৌষমাসে (১৬৪১ খৃঃ জানুয়ারি মাসে) রামতনু ভট্টাচার্য্যকে সংগ্রামসিংহের জমিদান করিতে দেখা যায়।

(১৭) Vide J. Westland's Report on the district of Jessore chap. XXII.

(১৮) Vide do Report. chap. XXII

(১৯) দীঘলবানা গ্রামে প্রাণনাথ ভট্টাচার্য্যের গৃহে ১৬০৮ নং যশোহর কালেক্টারীর ১২০৯ সালের তায়দাদে ও গঙ্গারামপুরের রমেশনাথ স্মৃতি-তীর্থের গৃহে ১৯১১ নং তায়দাদে আমরা ১৫৮৩ খৃঃ মুকুন্দ রায়ের প্রদত্ত নিষ্করের ও ১৪৪৬ খৃঃ ছত্রজিতের নিষ্কর দানের উল্লেখ দেখিয়াছি।

(২০) আমার বন্ধু ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচরণ ভট্টাচার্য্য লক্ষ্মীনারায়ণের হরিহরনগরের গৃহে এই শাঁজোয়ালের চাপরাস দেখিয়া আসিয়াছেন। ইহার আকার ষষ্ঠী কি নবমীর চন্দ্রের ন্যায় অর্থাৎ অৰ্দ্ধগোলাকার। ইহার দুইপার্শ্ব কালসহকারে ভগ্ন হইয়াছে। মধ্যস্থলে পারসিক ভাষায় কয়েকটী শব্দ আছে। বাঙ্গালায় লেখা আছে "শাঁজোয়াল ভূষণা"

(২১) সীতারামের সহিত জয়দেব ও চণ্ডীদাসের কবিতার পাল্লায় জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী জয়ী হন এবং তিনি উক্ত মুখস্থ কবিতার জন্য যে নিষ্করের সনন্দ পাইয়াছিলেন তাহা এই :—

"পরমপূজনীয় শ্রীযুক্ত জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী শ্রীচরণেষু—

আমার জমিদারী পরগণে মহিমসাহীর হোগলডাঙ্গা ও কল্যাণপুর গ্রামে বার পাখা ও পরগণে নলদীর নারায়ণপুর ও নহাটা গ্রামে আট পাখী জমি আপনার চণ্ডীদাস ও জয়দেবের মুখস্থ কবিতা শুনিবার জন্য ব্রহ্মত্তর দিলাম, আপনি পুরুষানুক্রমে আশীর্ব্বাদ করিয়া ভোগদখল করুন সন ১১১৩ সাল তাং ৫ই বৈশাখ"

(সীতারামের মোহর)
আমাল সন[illegible] ভোগ
দখল ক[illegible]

(২২) যত মজুমদারের গৃহে তাঁহার বংশধর দুর্গাচরণ মজুমদারের হস্তলিখিত সীতারামের বড় বড় কার্য্যের একটা ফর্দ্দ পাইয়াছি। তাহাতে দৃষ্ট হয়, সীতারামের পিতার দানসাগর শ্রাদ্ধের ব্যয় ১৮৯১২৲ টাকা। সেকালে এত টাকা ব্যয় এ সময়ের লক্ষ টাকার সমান।

(২৩) কুমরুলের দত্তদিগের গৃহের সনন্দ এই :—

"পরম পোষ্টাবর শ্রীরামনারায়ণ দত্ত পরমপোষ্টাবরেষু—

রামপাল জয়কালে তুমি খাদ্যের সরবরাহ করায় তোমার দোলপূজার জন্য তোমাকে পরগণে সাঁতৈরের কুমরুল দিঘাবাগো নাগরিপাড়া হাটবাড়িয়া গ্রামগারে ৯৮ অষ্টনব্বই পাখী নিষ্কর শিবোত্তর দিলাম। তুমি পুরুষানুক্রমে সেবাইতরূপে দোল-পূজার জন্য জমিতে দখিলকার থাকহ ইতি সন ১১১৭ সাল ১২ ফাল্গুন।"

(সীতারামের মোহর)
আমাল সনদ ভোগ
দখল করহ

(২৪) পরপৃষ্ঠায় যদুনাথ মজুমদারদিগের গৃহের সনন্দের প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল :—

(২৫) গঙ্গারামপুরের সেই ফকিরদিগের সমাধিক্ষেত্র ১২৭৬ সালে এক নমঃশূদ্র কর্ষণ করিয়াছিল। এই কর্ষণকালে উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য উপস্থিত ছিলেন। তাহার প্রমুখাৎ এই নরকঙ্কালের কথা শুনিয়াছি।

(২৬) যশপুর পল্লিয়ায় গুরুবংশের সনন্দগুলি এই :—

"পরমপূজনীয় শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

আমার জমিদারী পরগণে—— ——পরগণে নলদীর পল্লিয়া বিনোদপুর কুল্লে চেঙ্গারডাঙ্গী পরগণে সাহা উজিয়ালের কাবিলপুর———গ্রামে আপনাকে দুই শত চব্বিশ পাখী ভূমি ব্রহ্মত্তর দিলাম। আপনি পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে আশীর্ব্বাদ করিয়া ভোগদখল করিতে থাকন ইতি সন ১১১৬ তাং ২৮ কার্ত্তিক।"

এই সনন্দে সীতারামের মোহর ও হস্তাক্ষর আছে। এইরূপ আর তিনখানা সনন্দে আনন্দ চন্দ্র ও গৌরীচরণের নাম পাওয়া গিয়াছে। তাহাদের সাল যথাক্রমে ১১১৬, ১১১৮ ও ১১১৯।

(২৭) সীতারামের পুরোহিতবংশের, বাউইজানি ও ধূপড়িয়ার পণ্ডিতগণের নাম ও অভিরাম সেনের বিবরণ ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের অধ্যাপক বাবু সুরেন্দ্রনাথ মিত্র এম, এ মহাশয়ের সঞ্জীবনীর প্রবন্ধে পাইয়াছি। যদুনাথ মজুমদারের গৃহের ১১১৮ সালের দুর্গাপূজার প্রণালি-তালিকায় কবিরাজ মহাশয়দিগের নাম পাইয়াছি।

(২৮) সাবেক হরিহরনগরনিবাসী ও বর্ত্তমান সময়ে মাগুরার অন্তর্গত

রাজা সীতারাম রায়ের প্রদত্ত সনন্দের প্রতিলিপি।

মহিষাখোলা-নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের গৃহে সালিশি রোয়দাদ মৌলবীগণের নাম পাইয়াছি। শালিশ রোয়দাদ এই ঃ—

"হরিহর নগর সাকিনের দুর্গাচরণ বিদ্যারত্ন ও কালীচরণ ভট্টাচার্য্য পৃথক্ হইবার জন্য রাজসরকারে নালিশ করায় ও সরকার হইতে উভয়পক্ষের মত লইয়া আমাদের পাঁচ ব্যক্তিকে সালিশ মান্য করায় আমরা দায়ভাগ জানা পণ্ডিত ও মৃত্যুর অগ্রপশ্চাতের সাক্ষী লইয়া দেখিলাম, কালীচরণ দুর্গাচরণের বড় ভাই রামচরণের পুত্র হন ও তাঁহার পিতা রামচরণ পিতৃব্যপত্নী তিলকের স্ত্রী জীবিত থাকিতে মরেন, তিলকের স্ত্রীর শ্রাদ্ধ দুর্গাচরণ করিয়াছেন এই কারণে দুর্গাচরণ খুড়ার ৷৷০ আনা ও পৈতৃক ।০ আনা একুনে ৷৷০ আনা পান এবং কালীচরণ কেবল পৈতৃক ।০ আনা পান। আমরা মাঠান ৫১ বিঘা ১৬ কাঠা জমি-মধ্যে দুর্গাচরণকে ৩৭ বিঘা ৫২ কাঠা ও কালীচরণকে ১২ বিঘা ।৫ কাঠা জমি দিলাম। ভদ্রাসন বাড়ীর উত্তরে বাশঝাড় ও দক্ষিণে গাবগাছ সীমানা করিয়া পূর্ব্বের অর্দ্ধেক দুর্গাচরণকে ও পশ্চিমের অর্দ্ধেক কালীচরণকে দিলাম। সন ১১১১ সাল তাং ৫ই মাঘ। ইহাতে ৩ জন মৌলবী, ভবানীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ও গদাধর সরকার সালিশের নাম স্বাক্ষর আছে। দুইজন মৌলবীর নাম ও উকিলরূপে স্বাক্ষর আছে।

(২৯) বাবু ঈশানচন্দ্র ঘোষের বাঙ্গালার ইতিহাস ৩০ পৃষ্ঠাঃ—পাঠান-রাজত্বের শেষভাগে পর্ত্তুগীজজাতি বাঙ্গালার বাণিজ্য ছাড়িয়া দস্যুবৃত্তি ধরে এবং আরাকানের "মগ"দিগের সহিত মিলিয়া নিরীহ বাঙ্গালী-দিগের প্রতি অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হয়।

(৭০) "There must be much in my report that would bear further enquiry"

(Vide letter to Govt, dated the 25th Oct. 1890.)

(৭১) বেলদারসৈন্যের অর্থাৎ খনক সৈনিকশ্রেণীর এইরূপ বন্দোবস্তের কথা বেলদার সৈন্যের কর্ত্তা মদনমোহন বসুর উত্তরপুরুষ লালবিহারী বসুর নিকট অবগত হইয়াছি। তিনি বলিয়াছিলেন, এই সকল নিয়মাবলী একখানি ভূষনাই কাগজের খাতায় লিখিত ছিল। বহুদিন হইল গৃহদাহের সময় নষ্ট হইয়াছে।

(৭২) পাবনার দোগাছি প্রভৃতি স্থানে সীতারামের পুষ্করিণী দেখা যায়। পাবনার ভোলানাথ অধিকারী মহাশয়ের গৃহে তাঁহাদিগের বাটীর বিগ্রহের দেবত্র সম্পত্তি ছিল। সেই দেবত্র সম্পত্তির মধ্যে দোগাছি গ্রামে বার বিঘা নিষ্কর সম্পত্তি সীতারামের দত্ত ছিল। ঐ জমি বার্ষিক ৮৲ টাকা করে রামকুমার তন্তুবায়ের মধ্যে জমা ছিল। সে পাট্টা এই :—

"ইয়াদি কিদ্দ শ্রীরামকুমার তন্তুবায় সুচরিতেষু

কস্য শুভ পট্টকপত্র মিদং সন ১২৬৭ সালাব্দে লিখনং কার্য্যনঞ্চাগে জেলা পাবনায় দোগাছিয়া গ্রামে চকচারা তলায় রাজা সীতারাম দত্তা গোপীনাথ ঠাকুরের ১২ বিঘা জমি তোমাকে ৮৲ টাকার জমা দিলাম ইহার সীমা সরাদ্দ ঠিক রাখিয়া নিরূপিত কর আদায় করিবে খাজনা আদায়ে শৈথিল্য করিলে আইন আমলে আসিবে। এতদর্থে কবুলতি গ্রহণে পাট্টা দিলাম সন সদর তারিখ ৮ই চৈত্র।"

এই দলিলে সাক্ষর আছে ৩টী নাম। ১টী অপাঠ্য অপর ভোলানাথ

ও গোবিন্দচন্দ্রের নাম পড়া যায়। ইহাতে সাক্ষী আছেন হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা, মহিমচন্দ্র যোয়াদ্দার ও গোপালচন্দ্র সরকার সাং পোয়জানা।

(৩৩) বর্ত্তমান সময়ে নীলগঞ্জের পর পারে রামনগরপুরের নিকটে (বঙ্কিম বাবুর বিষবৃক্ষের রামনগর) সীতারামের পুষ্করিণী আছে এবং ঐ মাঠকে কেল্লার মাঠ বলে।

(৩৪ পুণ্ডরীক ও হলধর জাতীয় লোক সীতারামের রাজ্য মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগর হইতে বিতাড়িত কতকগুলি লোক ও পশ্চিম অঞ্চলের কতকগুলি বৈশ্যকে সীতারাম তাঁহার রাজ্য মধ্যে আনাইয়া কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত করেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, তাঁহাদিগকে বঙ্গীয় উচ্চ হিন্দুসমাজে মিশাইয়া যাইবেন, কিন্তু তাঁহার ১৪ বৎসরের রাজ্যে তাঁহাদিগের অবস্থা উন্নত করিয়া যাইতে পারেন নাই। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের লোকেরা পুঁড়ুয়া ও হলধরেরা হলদ্ধর নাম লইয়া এ অঞ্চলে পৃথক্ পৃথক্ কৃষিজীবী লোক হইয়াছে। এক্ষণে অনেক স্থলে দেখা যায়, পুঁড়ুয়ার উৎপন্ন দ্রব্য হলধর বিক্রয় করে।

(৩৫) "The Naral Babus, who for sometime had possession of the temple lands (Debottar) at Mahammadpur, made diligent search in the tank to find any stray treasure which might be in it." Vide J. Westland, page 39.

(৩৬) ভবানীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর গৃহে মধ্য প্রদেশের অর্থাৎ সীতারামের রাজ্যের একটী পণ্ডিতের ফর্দ্দ ছিল। ঐ ফর্দ্দ এখনও শ্যামমোহন বাবুর গৃহে আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি শ্যামমোহন বাবু রঙ্গপুরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল ছিলেন।

(৩৭) দক্ষিণবাড়ীর কালীর সনন্দখানা এই :—

"পরম পূজনীয় শ্রীশিবশঙ্কর মজুমদার শ্রীচরণেষু—

দক্ষিণবাড়ীর কালীমাতার সেবার জন্য আমার জমিদারীর নিচের লিখিত পরগণার গ্রামহারে ১০০ বিঘা দেবোত্তর দিলাম ভূমি পুরুষানুক্রমে সেবাইত রূপে উক্ত ভূমির কর ফসল আদায়ে মাতার সেবা ও আশীর্ব্বাদ করিবা পং মহিমসাহী দক্ষিণবাড়ী ২০/০ পদমদি ১২/০ কট্‌রাকান্দি ২৮/০ হোগলডাঙ্গা ৩০/০ মদনপুরপুর ১০/০ মৌজদে ২২/০ রাজাপুর ৮/০ একুনে ১৪০/০ পং সাহা-উজিয়াল (গ্রাম অপাঠ্য) ৬০/০ পং নসিবসাহী গড়েনা... ...রায় না... ... ...একুনে ১৫০/০ পং সাঁতৈর বাগাট ৪০/০ নাগরিবাড়ী ২০/০ ... ...একুনে ১৫০/০" (সনন্দের অন্য অংশ অপাঠ্য)

(৩৮) যে বৎসর সীতারামের ভগ্নিনীর বিবাহ হয়, সেই বৎসরে অন্দরের পুষ্করিণী খনন করা হয়। সীতারামের ভগিনীপতির ভাল নাম গোপেশ্বর ও তাঁহার মন্দ নাম সাধুচরণ খাঁ। তাঁহার নামে সীতারামের স্ত্রীগণ এই পুষ্করিণীর নাম রাখিয়াছিলেন।

(৩৯) তাম্বুলখানার মোহনচন্দ্র রামাইতের প্রাপ্ত এই সনন্দ পাওয়া গিয়াছে:—

"শ্রীমোহনচন্দ্র রামাইত সুচরিতেষু—

তোমাকে শীতলামাতার সেবার জন্য পং সাঁতৈরের বাঁধুগ্রাম ও কাঁদাকুলে ১॥০ খাদা জমি দেবোত্তর দিলাম পুরুষ পুরুষানুক্রমে শীতলামার সেবা করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে থাকহ সন ১১১৫ তাং ২৩ ভাদ্র। এই সনন্দ বলরাম দাস মুন্সীর লিখিত ও সীতারামের স্বাক্ষরযুক্ত।

(৪০) কোন ঘটকের কারিকায় দেখা যায় –

"কুলীনে কন্যার দায়ে গেলা রাজা পাশে।
সুবামনে কন্যা দেও ব'লে রাজা হাসে॥
অন্য দানে মুক্ত হস্ত কুলদায়ে নয়।
চাল শকড়ি গড়ে রাজা অর্থ করে ক্ষয়॥"

এইকবিতা রাজা সীতারাম সম্বন্ধেই লিখিত হইয়াছে।

(৪১) মহম্মদপুর অঞ্চলে গব্য দ্রব্য ও সন্দেশ, মুড়কী ভাল হইত, এ বিবরণও গত ১৩১১ সালের অগ্রহায়ণ মাসের সঞ্জিবনীতে প্রকাশিত বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের অধ্যাপক বাবু সুরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের প্রবন্ধে পাইয়াছি।

(৪২) সীতারামের মুর্শিদাবাদে মৃত্যু হইয়াছে, তাহার প্রমাণস্বরূপ সনন্দ গুলি এই –

(ক) আনন্দচন্দ্র গোস্বামী শ্রীচরণেষু –

প্রণামা আগে মুকঃসুদাবাদ মোকামে ৺ পিতামহাশয়ের
শ্রাদ্ধে উৎসর্গ ভূমিদানে পং নলদীর কানুটীয়া গ্রামে।০ চারি
পাখী চুল্লিয়া গ্রামে ॥৵০ পাখী বিনোদপুর গ্রামে।৵০ পাখী
ও নারায়ণপুর গ্রামে ।৴০ পাখী ভূমিদান করিলাম।
৺ পিতাঠাকুরের স্বর্গার্থে পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভূমিদান জমিতে দখল
করিতে থাকুন ইতি ১১২১ তারিখ ২২ শে কাত্তিক

(খ) শ্রীগৌরচরণ গোস্বামী শ্রীচরণেষু—

প্রণামা আগে মুকঃসুদাবাদ মোকামে ৺ পিতামহাশয়ের
শ্রাদ্ধে উৎসর্গ ভূমিদানে পং নলদীর কানুটীয়া গ্রামে।০ পাখী

খুল্লিয়া গ্রামে ৷৷৵০ পাখী বিনোদপুর গ্রামে।৵০ পাখী ও নারায়ণপুর গ্রামে।/০ পাখী ভূমিদান করিলাম। ৺পিতাঠাকুরের স্বর্গার্থে পুত্র ও পুত্রাদিক্রমে ভূমিদান জমিতে দখল করিতে থাকুন ইতি ১১১১ তারিখ ২২শে কার্ত্তিক।

(গ) শ্রীশ্রীরাম বাচস্পতি ভট্টাচার্য্য শ্রীচরণেষু—

প্রণামা আগে মুকঃসুদাবাদ মোকামে ৺পিতা-মহাশয়ের শ্রাদ্ধে উৎসর্গ ভূমিদান সিমুলিয়া গ্রামে।৵০ ছয় পাখী জমির সনদ পাইয়াছ, সে গ্রামে জমির জের হইল না, এ কারণ তাহার এতক সিমুলিয়া মদাফত পদ্মবিলাতে দেওয়া গেল আমল দখল ভোগ করহ ইতি সন ১১২১ তারিখ ২৬শে কার্ত্তিক।*

(ঘ) পরমারাধ্যতম শ্রীযুক্ত শ্রীরামবাচস্পতি ঠাকুর শ্রীচরণেষু—

পরগণে নলদীর জয়রামপুর ও আঠারবাঁকা গ্রামে আমার-জমিদারী তাহাতে ৺পিতামহাশয়ের মকঃসুদাবাদে ৺গঙ্গা প্রাপ্ত হন। তৎশ্রাদ্ধে ঐ দুই গ্রামের মধ্যে প্রভুরামের মুদাফতর ৷৷০ আট আনা ১২/ বিঘা শ্রীশ্রীচরণে উৎসর্গীকৃত হইল। দাস ভূম্যধিকারীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া পুরুষানুক্রমে ভোগ করিতে রহুন। ১১২২ সাল ২৩শে কার্ত্তিক।

(ঙ) পরম পূজনীয়া শ্রীযুক্তেশ্বরী তারামণি ঠাকুরাণী জওজে শ্রীযুক্ত মহাদেব ন্যায়বাগীশ মহাশয় শ্রীচরণেষু—

আমার জমিদারী পরগণে নলদীর সিমুলিয়া ও কলিকাতা চাঁদপুর গ্রামে আছে, তাহাতে আপনার মুখদেখোনে

৮/০ পাখী জমি শ্রীচরণে উৎসর্গ করিলাম। আপনি পুরুষানুক্রমে আমল ভোগ করিতে রহুন। ইতি সন ১১১৪ সাল তারিখ ২৩শে মাঘ।

(৪৩) ডেঁকণিয়ার বিশ্বনাথ টিকাদারের প্রাপ্ত সনন্দের দ্বারা রাণীদিগের বসন্তে মৃত্যুর কথা প্রমাণিত হয়। সনন্দ এই ঃ—

শ্রীবিশ্বনাথ টিকাদার সুচরিতেষু

আড়ংবাড়ার বসন্ত মৃত্যুর পর তোমার চিকিৎসায় অনেক ভাল হওয়ায় তোমার শীতলামার সেবার জন্য পরগণে নলদীর জাগলা গ্রামে তোমাকে ৷৷০ পাখী জমি দেবোত্তর দিলাম। তুমি পুরুষানুক্রমে শীতলামার সেবা করিয়া মার স্থানে আমার কুশল প্রার্থনায় ভোগ দখল কর। ইতি সন ১১১৮ সাল তারিখ ১ই আষাঢ়।

(৪৪) বাবু হারাণচন্দ্র রক্ষিতের রাণী ভবানীতে লিখিত আছে ঃ—

"তাহার এই অনিন্দ্যসুন্দর রূপেরও শত্রু হইল। সে শত্রু সামান্য শত্রু নয়,—সে শত্রু বড় প্রবল। ভাবী বঙ্গবিহার উড়িষ্যার নবাব—কলঙ্কময় জীবন—পাপিষ্ঠ সিরাজ-উদ্দৌলা—তাহার রূপের শত্রু হইল।"

(৪৫) Vide Robert Southey's Life of Nelson. * * * * * "And the ague, which at that time was one of the most common disease in England had greatly reduced his strength."

(৪৬) দশভুজার মন্দিরে এক প্রাচীরে একখানি শিবিকার মধ্যে সীতারামের একটা মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। ফটগ্রাফার অভাবে সে মূর্ত্তি আমি এবার উঠাইতে পারিলাম না। সেই মূর্ত্তি ও নিশানাথ ঠাকুরের

ধ্যান দৃষ্টে আমরা জানিয়াছি, সীতারাম অসিতবর্ণ, বৃহৎমস্তক, বৃহৎচক্ষু মধ্যম আকার বলিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন।

৪৭। সীতারামের নসরত সাহী পরগণা যে নিষ্কর দেওয়া ছিল ও তাঁহার সময়ে যে হাতে মাপ হইত তাহার বিবরণ নিম্ন লিখিত সনদ ও পাত্র জ্ঞাত হওয়া যাইবে।

শ্রী রাজিবলোচন চক্রবর্ত্তী—

সনদ পত্রমিদং আগে পরগণে নসরত সাহির কিসমতি বাগহুলি গ্রামে তোমার তালুক খাস করিয়া আমি সেচ্ছা পূর্ব্বক ৮ খাদা জমি ও ৮ আট খানি বাড়ী ব্রহ্মত্তর দিলাম জমি বাড়ী দখল করিয়া পুত্র পৌত্রাদি-ক্রমে আশীর্ব্বাদ করিয়া পরম সুখে ভোগ করহ এই ব্রহ্মত্তর জমি যে খাস করিবে হিন্দু গো-গোস্ত খাবে। মুসলমান শুয়ার খাবে তার মার পিটে তালাক চলিবে ইতি সন ১১১১ এগারশত এগার সাল তারিখ ১ কার্ত্তিক এই সনদের মস্তকে সিন্দূর ও শ্বেত চন্দনের ফোঁটার চিহ্ন দেওয়া বোধ হয়। ইহার মস্তকের ডাইন ধারে সীতারামের মোহর।

শ্রীগঙ্গাধর তোলাপত্রে সুচরিতেষু:—আগে পরগণে সাঁতৈরের ভূষনার রাজীবলোচন চক্রবর্ত্তীকে পরগণে নসরত সাহীর ফিঃ বাগহুলি গ্রামে ৮ আট খাদা জমি ও ৮ আট খানি বাড়ী ব্রহ্মত্তর দেওয়া গিয়াছে, তাহার পুত্র শ্রীযুক্ত রামভদ্র তর্কবাগীশ বিশুদ্ধ পণ্ডিত কাবাতা শক্তি বড় একারণ খুসি হইয়া আমার পাগড়ি বেড়া ৫২ বয়ান্ন বট হাতের নির্দ্দিষ্ট যাইতেছে ভূমি উপরের লিখিত দিষ্টি ঐ দুই হাতের ১৪ চৌদ্দ হাতের নলে জরিপ করিয়া দিবা তগীদ জানিবা ইতি সন ১১১২ এগার শত বার সাল। এই পত্রের ডাইন ধারে সীতারামের গোল মোহর।

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট।

(ক) মৎস্য দেশ কোথায়? এ প্রশ্নের অদ্যাপি সুন্দররূপ মীমাংসা হয় নাই। মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত ও মনুসংহিতার শ্লোক লইয়া কেহ মৎস্য দেশ গুজরাটে, কেহ মালবের নিকটে ও কেহ রাজপুতনার মধ্যে বা নিকটে বলিতে চাহেন। মহাভারতের শ্লোক ঠিক দিক্‌নির্ণায়ক নহে। শ্রীমদ্ভাগবত ও মনুসংহিতার মতে মৎস্যদেশ কুরুক্ষেত্রের দক্ষিণপশ্চিম বলিয়া অনুমান হয়। পুরাতত্ত্বের এই সকল কঠিন প্রশ্নের ভ্রমশূন্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সহজ ব্যাপার নহে। রঙ্গপুরের গাইবান্ধা ও মেদিনীপুরে বিরাটের বাড়ী ও গোগৃহাদির চিহ্ন বলিয়া যে সকল স্থান প্রদর্শিত হয় তাহারই বা কারণ কি বুঝিতে পারা যায় না। অনুমান, কালসহকারে যেরূপ পঞ্চগৌড় রাজ্যের নিদর্শন পাওয়া যায়, সেইরূপ প্রাচীনকালে একাধিক মৎস্যদেশ থাকিতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে হস্তিনা ও ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে যে দিকে মৎস্যদেশ হয়, সে দেশ প্রাচীন আর্য্যগণের অপরিজ্ঞাত ছিল না। ঐ দেশ বীরত্বের রঙ্গভূমি ছিল। সভ্রাতৃক ও সকলত্র যুধিষ্ঠির অজ্ঞাত-বাসের জন্য মৎস্যদেশে গিয়াছিলেন। বিরাট ও বিরাটের পুত্রের বিশেষ বীরত্বের কথা অগ্রে কিছু শুনা যায় না। এই কারণে প্রমাণ হয় একাধিক মৎস্যদেশ ছিল ও অপরিজ্ঞাত পূর্ব্বদেশীয় মৎস্যদেশেই ধর্ম্মরাজ আসিয়াছিলেন।

(খ) অনেকে বলেন, দিনাজপুরের মধ্যে নিতপুরই বাণের রাজধানী শনিতপুর। আসামী ভাষায় তেজ অর্থ শনিত। তেজপুরই শনিতপুর তেজপুরে উষার বাড়ী, বাণের পুকুর প্রভৃতি স্থান আছে। তেজ-পুরে অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ অনেক বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর আছে। দিনাজ পুরের নিতপুরেও বিরূপাক্ষ নামে শিব ও তেজপুরেও এক শিবমন্দির আছে। উষার বিবাহের ধরণটাও কিছু আসাম দেশীয় ইহাতে অনুমান হয়, আসামের তেজপুর হইতে দিনাজপুরের শণিতপুর পর্য্যন্ত বাণের রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

(গ) অনেকের মত, ধর্ম্মমতের বিভিন্নতা বঙ্গের অধঃপতনের কারণ। শাক্তগণের ভৈরবী চক্র হইতে অনেক ধর্ম্মহীন লোকের পানদোষ ও চরিত্র গঠন হইয়াছে। বৈষ্ণবদিগের পরমার্থ ও লীলা অভিনয় হইতে ঐরূপ চরিত্র নাশের কথা শ্রুত হয়।

(ঘ) পরগণা বর্ত্তমান সময়ে মহকুমার সমান। সরকার জেলা ও দৃশ ও চাকলা বিভাগ তুল্য। নবাবি আমলে এক এক চাকলা অর্থাৎ বিভাগে বহু সরকার ও পরগণা ছিল।

(ঙ) অনেকে বলেন, মঘনুরা মাগুরা অর্থাৎ যে গ্রামের মধ্য দিয়া মঘ ঘুরিয়া বাহির হইয়াছে তাহার নাম মাগুরা। মঘী, মঘ আছে, অর্থে ঈ অর্থাৎ যে গ্রাম মঘময় ছিল, তাহার নাম মঘা।

(চ) তাণ্ডা ঃ—সোলেমান কররানি নবাবকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভাগীরথী-তীরস্থিত নগরীর নাম তাণ্ডা ছিল। এই নগরী আধুনিক রাজমহালের পূর্ব্বে অবস্থিত ছিল। এক্ষণে গঙ্গাগর্ভে লীন হইয়াছে।

(ছ) যশোহর ঃ—অনেকে বলেন, যে নগরের গমন করিলে লোকের

যশঃ অপহৃত হয়, তাহার নাম যশোহর। কোন সময়ে যশোহরের লোক এত কলুষিত হইয়াছিল যে, লোকে তথায় গমন করিলেই চরিত্র হীন হইত।

(জ) কর ৷ ঘর ৷ ঘর অর্থ কোন একঘর লোকের সিকি বাঙ্গালায় ছিল, আর বারআনা রকম লোক স্থানান্তরে ছিল এরূপ অর্থ নহে। ইহার অর্থ বংশমর্য্যাদা অন্য অন্য ঘরের সিকি রকম অর্থাৎ অন্য ঘরে নিমন্ত্রণে ৪৲ টাকা বিদায় পাইলে কর ১৲ টাকা পান।

(ঝ) বাস্তরিক দ্বাদশ ঘর জমিদার দ্বাদশ দস্যু নহেন। কেহ কেহ বলেন, জমিদারের উৎপীড়ন হইতে এই কথার উৎপত্তি হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এ সময়ে কোন কোন জমিদার বিশেষ অত্যাচারীও ছিলেন।

(ঞ) সুবিদ্ধি (সুবুদ্ধি) ভূমিক নামক একব্যক্তি সীতারামের জমা সেরেস্তার কার্য্য করিতেন। সীতারামের পতনের পর ও সীতারামের জমিদারী মহারাজ রামজীবনের সহিত বন্দোবস্ত হইবার পূর্ব্বে সকল কর্ম্মচারিগণই কেবল তহবিল তছরূপ করিতেন। সুবিদ্ধিকে ন্যায়বান্ কর্ম্মচারী দেখিয়া নবাব তাঁহাকে খাঁ উপাধি দিয়া সীতারামের জমিদারীর রাজস্বসংক্রান্ত প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন। রামজীবন সীতারামের জমিদারী বন্দোবস্ত করিয়া লইবার পর তিনি সুবিদ্ধিকে রায় উপাধি দিয়া তাঁহার জমানবিস নিযুক্ত করেন। সুবিদ্ধির বংশে রামনাথ ভূমিকা, আতপ খাঁ প্রভৃতি নাটোর কর্ম্মচারিগণের নাম পাওয়া যায়। সুবিদ্ধির বংশে রাজচন্দ্র নড়ালের আদিপুরুষ কালীশঙ্কর রায়ের সময়ে নাটোরের জমানবিশ ছিলেন। সীতারাম হইতে প্রাপ্ত নাটোরের জমিদারী ক্রয় করিবার পর, কালীশঙ্কর রাজচন্দ্রকে নড়ালে আনিয়া জম-

নবিশ পদে নিযুক্ত করেন। শুনা যায়, কালীশঙ্কর আপন রায়বাহাদুর উপাধি এবং স্বীয় কর্ম্মচারীরও রায় উপাধি ভাল দেখায় না বিবেচনা করিয়া রাজচন্দ্রের ভূমিক খাঁ ও রায় উপাধি রহিত করিয়া দেন এবং তাঁহাকে সরকার উপাধি দানপূর্ব্বক তাঁহার জমিদারীর প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন। নবাবী আমলে সরকার অর্থে এক সরকারের কর্ত্তা অর্থাৎ এক জেলার কর্ত্তা বা কালেক্টর বুঝাইত। রাজচন্দ্রের পুত্র রামকুমার, রামকুমারের পুত্র মৃত্যুঞ্জয় ও মৃত্যুঞ্জয়ের পুত্র দ্বারকানাথ নড়াল জমিদার সরকারে প্রধান প্রধান পদে নিযুক্ত হইয়া আসিতেছেন। নিম্নের পত্র ও তায়দাদ এই সকল কথা প্রমাণ করিবে।

১২০৯ সালের ১লা ভাদ্র তারিখের ৪১৯৯ নং মহাত্রাণ নিষ্কর জমির তায়দাদ।

দাতা	গৃহীতা	দখিলকার	যে গ্রামে জমি	বিঘা
মহারাজ রাম সুবিদ্ধি জীবন রায় রায়	ব্রজরাম সরকার দীগর সাং করুণ্ডি		রামচন্দ্রপুর গ্রাম	১৬।০
মহারাজ রাম আতপ খাঁ ও কান্ত রায় রামনাথ ভূমিক	ঐ		পায় বাকী	২৬।০
				মং ৪৩/০

পত্র নম্বর ১

শিরোনামা

যশোপরিষ্ঠ-

শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় সরকার
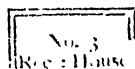
চলিত জেলা যশোহর নড়াইলের বাসায় পৌঁছিলে মোক্তারেরা নড়াইল পাঠাইবেন

ক্রোড়পত্র।

(স্বাক্ষর শ্রীরামরতন রায়)

সরিকি মোকদ্দমার কাগজ পত্র দেখার জন্য ২৩ সেন ওখানে গিয়াছে।

কাগজ পত্র যাকল দেখিতেছে সেই মতের নকল কেবল ভোমরদিয়ার রামপ্রসাদ রায়ের নামিয়ো করজা মোকদ্দমার ফয়ছালাতে নিজ তহবিল সংক্রান্ত অর্থাৎ নিজ তহবিল সন্দ ... ... ২৩ সেনকে-ফর্দ্দ করিয়া দেওয়া ভাল হইয়াছে ... ... ইং ১১৮৫ সাল লাং ১২০৬ সালের ৮ মহাশয়ের নিজ তহবিলে যে দিতে হইবেক ... ... যে মহল যে সন উৎপত্তি হইয়াছে সেই সন হইতে লাং ১২৫৪ সাল ঐ সকল বিষয়ের তহসিলদারগণের দস্তখত জমাখরচ ... ... ইং ১২০৭ সাল লাং ১২৫৪ সালের জমাখরচ যে দাখিল হইয়াছে তাহাতে সাহেব লোকের করজ দেনা পাওনার প্রসঙ্গ নাই ... ...৩১ সাহেবের ৬৫ ... ... বড় মনুষ্যদিগকে সাক্ষি মান্য করিতে হইবে ঢাকা প্রদেশের বড় মনুষ্যাদিগের নামের ফর্দ্দ একটা গত সন ৮ পূজার পূর্ব্বে

আনিয়াছেন ... ... দফাওয়ারি ইসান মবিসি যে করিয়াছ তাহা পাঠাইবা দেখিয়া পাঠাইব ইতি—

উপরের পত্রখানি রামরতন ও গুরুদাস বাবুর মধ্যে যে বড় মকদ্দমা হয় তদুপলক্ষে লিখিত। ইহাতে মকদ্দমা সংক্রান্ত যাবতীয় পরামর্শের কথা আছে। সকল কথা প্রকাশযোগ্য নহে। তৎকালে নড়ালের জমিদার বাবুগণ সাঙ্কেতিক বা যে ভাষা ব্যবহার করিতেন, তাহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। ২১ হইতে ২৫ পর্য্যন্ত ক বর্গের বর্ণ। ৩১ হইতে ৩৫ পর্য্যন্ত চ বর্গের বর্ণ। ৪১ হইতে ৪৫ পর্য্যন্ত ট বর্গের বর্ণ। উক্ত পত্রের ২৩ সেন গিরিধর সেন। ৩৩ সাহেব জজ সাহেব। ৬৫ অর্থ মোহর।

পত্র নম্বর ২

শিরনামা পাওয়া যায় নাই।

বিজ্ঞাপঞ্চ বিশেষ নড়ালে আসিয়া সকল কাজ কর্ম্ম করিয়াছ ভাল আমার সকল বিশয়ের ভার তোমার প্রতি তুমি আমায় সন্তান মত স্নেহ তোমার পর করি তুমি আমার প্রতি তাহার মত শ্রদ্ধা করিতেছ কাজ-কর্ম্মের ভার তোমার উপর ... ... রসুলপুর পেসকার ও উমাচরণ বসুর মৌরশী হইয়াছে ... ... শ্রীমান্‌কে লইয়া খরচ পত্রের একটা বন্দেজ করিবা যাহাতে সংসার চলে বে-বন্দোবি খরচ পত্র হইলে কোন মতে কিছু থাকে না যেমত আয় সেই মত ব্যয় হইলে ভাল হয়। ১৪ই চৈত্র।

☞ উক্ত পত্রের শ্রীমান্, বাবু চন্দ্রকুমার রায়। দুইখানা পত্রে ঠিক যেরূপ বর্ণাশুদ্ধি ও ভাষা আছে সেইরূপ দেওয়া হইল।